পৌরনীতি ও নাগরিকতা

নবম-দশম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

**জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
নবম-দশম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত**

পৌরনীতি ও নাগরিকতা

নবম-দশম শ্রেণি

রচনা

ড. সেলিনা আক্তার

ড. সাব্বীর আহমেদ

মোঃ রফিকুল ইসলাম

সম্পাদনা

প্রফেসর ড. হারুন-অর-রশিদ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর, ২০১২
পরিমার্জিত সংস্করণ : সেপ্টেম্বর, ২০১৪
পুনর্মুদ্রণ : , ২০১৮

ডিজাইন
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ-কথা

ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়ার জন্য শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করার মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষায় যোগ্য করে তোলা মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। শিক্ষার্থীকে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত পটভূমির প্রেক্ষিতে দক্ষ ও যোগ্য নাগরিক করে তোলাও মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম বিবেচ্য বিষয়।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত হয়েছে মাধ্যমিক স্তরের সকল পাঠ্যপুস্তক। পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ থেকে শুরু করে ইতিহাস ও ঐতিহ্য চেতনা, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিবোধ, দেশপ্রেমবোধ, প্রকৃতি-চেতনা এবং ধর্ম-বর্ণ-গোত্র ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার প্রতি সমমর্যাদাবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

রূপকল্প ২০২১ বর্তমান সরকারের অন্যতম অঙ্গীকার। এই অঙ্গীকারকে সামনে রেখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশকে নিরক্ষরতামুক্ত করার প্রত্যয় ঘোষণা করে ২০০৯ সালে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর হাতে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক তুলে দেওয়ার নির্দেশনা প্রদান করেন। তাঁরই নির্দেশনা মোতাবেক ২০১০ সাল থেকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ শুরু করেছে।

পৌরনীতি ও নাগরিকতা বিষয়টি পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে নাগরিকের ভূমিকা কী তা জানানোর সাথে সাথে শিক্ষার্থীদের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধ, সততা, চরিত্র গঠন, সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা এবং দেশপ্রেম সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করে। পৌরনীতি ও নাগরিকতা পাঠের মাধ্যমে আমাদের অসাম্প্রদায়িক সংস্কৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্য মহান মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করে শিক্ষার্থীরা আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে উঠবে এবং আত্মকর্মসংস্থানে প্রবৃত্ত হয়ে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে।

বানানের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত বানানরীতি। পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, চিত্রাঙ্কন, নমুনা প্রশ্নাদি প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজে যাঁরা আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

অধ্যায়	অধ্যায়ের শিরোনাম	পৃষ্ঠা
প্রথম	পৌরনীতি ও নাগরিকতা	১-১১
দ্বিতীয়	নাগরিক ও নাগরিকতা	১২-২১
তৃতীয়	আইন, স্বাধীনতা ও সাম্য	২২-২৯
চতুর্থ	রাষ্ট্র ও সরকারব্যবস্থা	৩০-৪৫
পঞ্চম	সংবিধান	৪৬-৫৫
ষষ্ঠ	বাংলাদেশের সরকারব্যবস্থা	৫৬-৭০
সপ্তম	গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দল ও নির্বাচন	৭১-৭৮
অষ্টম	বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারব্যবস্থা	৭৯-৯৬
নবম	নাগরিক সমস্যা ও আমাদের করণীয়	৯৭-১১৪
দশম	স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে নাগরিক চেতনা	১১৫-১৩৩
একাদশ	বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক সংগঠন	১৩৪-১৫১

প্রথম অধ্যায়
পৌরনীতি ও নাগরিকতা

পৌরনীতি ও নাগরিকতাকে বলা হয় নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান। কারণ নাগরিকতার সাথে জড়িত সকল বিষয় পৌরনীতিতে আলোচনা করা হয়। রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে আমাদের প্রত্যেকের 'পৌরনীতি' সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। এ অধ্যায়ে পৌরনীতি ও নাগরিকতার সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন দিক যেমন- পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের উৎপত্তি, সরকার ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা স্থান পেয়েছে।

এ অধ্যায় পড়া শেষে আমরা-

- পৌরনীতি ও নাগরিকতা বিষয়ে ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পৌরনীতি পাঠের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও সরকারের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব।
- পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও সরকারের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে পারব।

পৌরনীতি ও নাগরিকতা

পৌরনীতির ইংরেজি শব্দ সিভিক্স (Civics)। সিভিক্স শব্দটি দুটি ল্যাটিন শব্দ সিভিস (Civis) এবং সিভিটাস (Civitas) থেকে এসেছে। সিভিস শব্দের অর্থ নাগরিক (Citizen) আর সিভিটাস শব্দের অর্থ নগর-রাষ্ট্র (City State)। প্রাচীন গ্রিসে নাগরিক ও নগর-রাষ্ট্র ছিল অবিচ্ছেদ্য। ঐ সময় গ্রিসে ছোট ছোট অঞ্চল নিয়ে গড়ে উঠে নগর-রাষ্ট্র। যারা নগর রাষ্ট্রীয় কাজে সরাসরি অংশগ্রহণ করত, তাদের নাগরিক বলা হতো। শুধু পুরুষশ্রেণি রাষ্ট্রীয় কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ পেত বিধায় তাদের নাগরিক বলা হতো। দাস, মহিলা ও বিদেশিদের এ সুযোগ ছিল না। নাগরিকের আচরণ ও কার্যাবলি নিয়ে আলোচনাই ছিল পৌরনীতির বিষয়বস্তু।

বর্তমানে একদিকে নাগরিকের ধারণার পরিবর্তন ঘটেছে, অন্যদিকে নগর-রাষ্ট্রের স্থলে বৃহৎ আকারের জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যেমন- বাংলাদেশের ক্ষেত্রফল ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটার এবং লোকসংখ্যা প্রায় ১৫ কোটি। আমরা সবাই বাংলাদেশের নাগরিক। নাগরিক অধিকার ভোগের পাশাপাশি আমরা রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে থাকি। তবে আমাদের মধ্যে যারা অপ্রাপ্তবয়স্ক অর্থাৎ যাদের বয়স ১৮ বছরের নিচে, তারা ভোটদান কিংবা নির্বাচিত হওয়ার মতো রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করতে পারে না। তাছাড়া বিদেশিদের কোনো রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করার সুযোগ নেই। যেমন- নির্বাচনে ভোটদান বা নির্বাচিত হওয়ার অধিকার নেই। মূলত রাষ্ট্র প্রদত্ত নাগরিকের মর্যাদাকে নাগরিকতা বলা হয়। নাগরিকতা ও রাষ্ট্রের সাথে জড়িত সবই 'পৌরনীতি ও নাগরিকতা'র বিষয়বস্তু। ব্রিটিশ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ই. এম. হোয়াইট যথার্থই বলেছেন, পৌরনীতি হলো জ্ঞানের সেই মূল্যবান শাখা, যা নাগরিকতার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এবং স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মানবতার সাথে জড়িত সকল বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে।

বিষয়বস্তুর দৃষ্টিতে পৌরনীতিকে দু'টি অর্থে আলোচনা করা যায়। ব্যাপক অর্থে, পৌরনীতি নাগরিকতার সাথে জড়িত সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। যেমন- অধিকার ও কর্তব্য, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, নাগরিকতার স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়, নাগরিকতার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। সংকীর্ণ অর্থে, অধিকার ও কর্তব্য পৌরনীতির বিষয়বস্তু।

সুতরাং বলা যায়, নাগরিক, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের আচরণ ও কার্যাবলি নিয়ে ধারাবাহিক আলোচনার মাধ্যমে যে বিষয়টি আদর্শ নাগরিক জীবন সম্বন্ধে জ্ঞান দান করে, তাকে 'পৌরনীতি ও নাগরিকতা' বলা হয়।

একক কাজ : পৌরনীতি ও নাগরিকতার প্রাচীন ও আধুনিক ধারণার পার্থক্য নির্ণয় কর।

পৌরনীতি ও নাগরিকতা বিষয়ের পরিসর বা বিষয়বস্তু

পৌরনীতি ও নাগরিকতা বিষয়ের পরিসর ব্যাপক ও বিস্তৃত। নিম্নে আমরা এর পরিসর বা বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করব-

১. **নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য :** রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে আমরা যেমন রাষ্ট্রপ্রদত্ত সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও মৌলিক অধিকার ভোগ করি, তেমনি আমাদেরকেও রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হয়। যেমন- রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ, আইন মান্য করা, সঠিক সময়ে কর প্রদান করা, সন্তানদের শিক্ষিত করা, রাষ্ট্রের সেবা করা, সততার সাথে ভোটদান ইত্যাদি। নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য 'পৌরনীতি ও নাগরিকতা'র বিষয়বস্তু। তাছাড়া সুনাগরিকতার বৈশিষ্ট্য, সুনাগরিকতা অর্জনের প্রতিবন্ধকতা এবং তা দূর করার উপায় 'পৌরনীতি ও নাগরিকতা' বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

২. **সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান :** নাগরিক জীবনকে উন্নত ও সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। যেমন- পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, নির্বাচন, রাজনৈতিক দল ইত্যাদি। এদের উৎপত্তি, প্রকৃতি ও কার্যাবলি পৌরনীতি ও নাগরিকতা বিষয়ে আলোচনা করা হয়। তা ছাড়া সামাজিক মূল্যবোধ, আইন, স্বাধীনতা ও সাম্য, সংবিধান, জনমত প্রভৃতি পৌরনীতি ও নাগরিকতার আলোচ্য বিষয়।

৩. **নাগরিকতার স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয় :** আমরা যেখানে বাস করি, সেখানে আমাদেরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে স্থানীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। যেমন- ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন ইত্যাদি। ঠিক তেমনি নাগরিককে কেন্দ্র করে জাতীয় পর্যায়ে আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ, বিচার বিভাগ এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কমনওয়েলথ, জাতিসংঘ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। এসব স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের গঠন, কার্যাবলি, অবদান এবং নাগরিকের সাথে এসব প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক নিয়ে পৌরনীতি ও নাগরিকতা বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

৪. **নাগরিকতার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ :** পৌরনীতি ও নাগরিকতা বিষয়টি নাগরিকদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করে। যেমন- অতীতে নাগরিকতা কীভাবে নির্ণয় করা হতো, নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য কেমন ছিল, বর্তমানের নাগরিকের মর্যাদা কিরূপ– এসবের উপর ভিত্তি করে 'পৌরনীতি ও নাগরিকতা' বিষয়টি ভবিষ্যৎ নাগরিক জীবনের দিকনির্দেশনা প্রদান করে।

দলীয় কাজ : 'পৌরনীতি ও নাগরিকতার' বিষয়টি তোমরা কেন পাঠ করবে দলে আলোচনা করে শ্রেণিতে উপস্থাপন কর ।

পরিবার

সমাজ স্বীকৃত বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে স্বামী-স্ত্রীর একত্রে বসবাস করাকে পরিবার বলে। অর্থাৎ বৈবাহিক সম্পর্কের ভিত্তিতে এক বা একাধিক পুরুষ ও মহিলা, তাদের সন্তানাদি, পিতামাতা এবং অন্যান্য পরিজন নিয়ে যে সংগঠন গড়ে উঠে- তাকে পরিবার বলে। ম্যাকাইভারের মতে, সন্তান জন্মদান ও লালন-পালনের জন্য সংগঠিত ক্ষুদ্র বর্গকে পরিবার বলে। আমাদের দেশে সাধারণত মা-বাবা, ভাই-বোন, চাচা-চাচি ও দাদা-দাদির সমন্বয়ে পরিবার গড়ে উঠে। তবে শুধু একজন মহিলা বা একজন পুরুষকে পরিবার বলা হয় না। মূলত পরিবার হলো স্নেহ, মায়া, মমতা, ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গঠিত ক্ষুদ্র সামাজিক প্রতিষ্ঠান।

পরিবারের শ্রেণিবিভাগ

আমরা সবাই পরিবারে বাস করি। কিন্তু সব পরিবারের প্রকৃতি ও গঠনকাঠামো এক রকম নয়। কতগুলো নীতির ভিত্তিতে পরিবারের শ্রেণিবিভাগ করা যায়। যেমন- (ক) বংশ গণনা ও নেতৃত্ব (খ) পারিবারিক কাঠামো ও (গ) বৈবাহিক সূত্র।

ক. **বংশ গণনা ও নেতৃত্ব :** এ নীতির ভিত্তিতে পরিবারকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- পিতৃতান্ত্রিক ও মাতৃতান্ত্রিক পরিবার। পিতৃতান্ত্রিক পরিবারে সন্তানরা পিতার বংশপরিচয়ে পরিচিত হয় এবং পিতা পরিবারে নেতৃত্ব দেন। আমাদের দেশের অধিকাংশ পরিবার এ ধরনের। অন্যদিকে, মাতৃতান্ত্রিক পরিবারে মায়ের বংশপরিচয়ে সন্তানরা পরিচিত হয় এবং মা পরিবারে নেতৃত্ব দেন । যেমন- আমাদের দেশে গারোদের মধ্যে এ ধরনের পরিবার দেখা যায়।

খ. **পারিবারিক কাঠামো :** পারিবারিক গঠন ও কাঠামোর ভিত্তিতে পরিবারকে দুই শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা- একক ও যৌথ পরিবার। একক পরিবার মা-বাবা ও ভাই-বোন নিয়ে গঠিত হয়। এ ধরনের পরিবার ছোট হয়ে থাকে। যৌথ পরিবারে মা-বাবা, ভাই-বোন, দাদা-দাদি, চাচা-চাচি ও অন্যান্য পরিজন একত্রে বাস করে। যৌথ পরিবার বড় পরিবার। বাংলাদেশে উভয় ধরনের পরিবার রয়েছে। তবে বর্তমানে একক পরিবারের সংখ্যা বাড়ছে। মূলত যৌথ পরিবার কয়েকটি একক পরিবারের সমষ্টি।

গ. **বৈবাহিক সূত্র :** বৈবাহিক সূত্রের ভিত্তিতে তিন ধরনের পরিবার লক্ষ করা যায়। যথা- একপত্নীক, বহুপত্নীক ও বহুপতি পরিবার। একপত্নীক পরিবারে একজন স্বামীর একজন স্ত্রী থাকে। আর বহুপত্নীক পরিবারে একজন স্বামীর একাধিক স্ত্রী থাকে। আমাদের সমাজের অধিকাংশ পরিবার একপত্নীক, তবে বহুপত্নীক পরিবারও কদাচিৎ দেখা যায়। বহুপতি পরিবারে একজন স্ত্রীর একাধিক স্বামী থাকে। বাংলাদেশে এ ধরনের পরিবার দেখা যায় না।

একক কাজ : শ্রেণিকক্ষে নিচের ছকটি পূরণ কর ।	
নীতি/ ভিত্তি	**পরিবারের নাম**
১। বংশ গণনা ও নেতৃত্বের ভিত্তিতে	১। ২।
২। আকার বা কাঠামোর ভিত্তিতে	১। ২।
৩। বৈবাহিক সূত্রে	১। ২। ৩।

পরিবারের কার্যাবলি

পরিবারের সদস্যদের সুন্দর ও নিরাপদ জীবন গড়ে তোলার জন্য পরিবার বহুবিধ কাজ করে। পরিবার সাধারণত যেসব কার্য সম্পাদন করে, সেগুলো নিম্নরূপ-

১. জৈবিক কাজ : আমাদের মা-বাবা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ফলেই আমরা জন্মগ্রহণ করেছি এবং তাদের দ্বারা লালিত-পালিত হচ্ছি। অতএব, সন্তান জন্মদান ও লালন-পালন করা পরিবারের অন্যতম কাজ। পরিবারের এ ধরনের কাজকে জৈবিক কাজ বলা হয়।

২. শিক্ষামূলক কাজ : আমাদের মধ্যে অনেকে বিদ্যালয়ে যাওয়ার পূর্বেই পরিবারে বর্ণমালার সাথে পরিচিত হই। তাছাড়া মা-বাবা, ভাই-বোন ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের পারস্পরিক সহায়তায় সততা, শিষ্টাচার, উদারতা, নিয়মানুবর্তিতা ইত্যাদি মানবিক গুণাবলি শিক্ষা লাভের প্রথম সুযোগ পরিবারেই সৃষ্টি হয়। এগুলো পরিবারের শিক্ষামূলক কাজ। আর পরিবারে শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় বলে পরিবারকে শাশ্বত বিদ্যালয় বা জীবনের প্রথম পাঠশালা বলা হয়।

৩. অর্থনৈতিক কাজ : পরিবারের সদস্যদের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা প্রভৃতি চাহিদা পূরণের দায়িত্ব পরিবারের। পরিবারের সদস্যরা বিভিন্নভাবে অর্থ উপার্জনের মাধ্যমে এসব চাহিদা মিটিয়ে থাকে। পরিবারকে কেন্দ্র করে কুটির শিল্প, মৎস্য চাষ, কৃষিকাজ, পশু পালন ইত্যাদি অর্থনৈতিক কাজ সম্পাদিত হয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভূতপূর্ব উন্নতির ফলে পরিবারের সাথে সংশ্লিষ্ট কাজের জায়গাগুলো অনেক ক্ষেত্রে পরিবর্তিত হয়েছে এবং নতুন নতুন কাজের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে হ্রাস পেয়েছে। তবে আজও পরিবার আমাদের সকল প্রকার অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণ করছে।

৪. রাজনৈতিক কাজ : পরিবারে সাধারণত মা-বাবা কিংবা বড় ভাই-বোন অভিভাবকের ভূমিকা পালন করে। আমরা ছোটরা তাঁদের আদেশ-নির্দেশ মেনে চলি। তারাও আমাদের অধিকার রক্ষায় কাজ করেন। বুদ্ধি, বিবেক ও আত্মসংযমের শিক্ষা দেন, যা আমাদের সুনাগরিক হতে সাহায্য করে। এভাবে পারিবারিক শিক্ষা ও নিয়ম মেনে চলার মাধ্যমে পরিবারেই শিশুর রাজনৈতিক শিক্ষা শুরু হয়। এ শিক্ষা পরবর্তীকালে রাষ্ট্রীয় জীবনে কাজে লাগে। এছাড়া বড়দের রাজনৈতিক আলোচনা শুনে ও সে আলোচনায় অংশগ্রহণ করে আমরা দেশের রাজনীতি সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠি।

৫. মনস্তাত্ত্বিক কাজ : পরিবার মায়ামমতা, স্নেহ-ভালোবাসা দিয়ে পরিবারের সদস্যদের মানসিক চাহিদা পূরণ করে। নিজের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা পরিবারের অন্যান্য সদস্যের সাথে ভাগাভাগি করে প্রশান্তি লাভ করা যায়। যেমন- কোনো বিষয়ে মন খারাপ হলে মা-বাবা, ভাই-বোনদের সাথে আলাপ-আলোচনা করে তার সমাধান করা যায়। এ ধরনের আলোচনা মানসিক শ্রান্তি-ক্লান্তি মুছে দিতে সাহায্য করে। তাছাড়া পরিবার থেকে শিশু উদারতা, সহনশীলতা, সহমর্মিতা প্রভৃতি গুণগুলো শিক্ষা লাভ করে, যা তাদের মানসিক দিককে সমৃদ্ধ করে।

৬. বিনোদনমূলক কাজ : পরিবারের সদস্যদের সাথে গল্প-গুজব, হাসি-ঠাট্টা, গান-বাজনা, টিভি দেখা, বিভিন্ন জায়গায় বেড়াতে যাওয়া ইত্যাদির মাধ্যমে আমরা বিনোদন লাভ করি। বর্তমানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে পরিবারের উল্লিখিত কাজগুলো কিছুটা হ্রাস পেলেও সদস্যদের সর্বাধিক কল্যাণ সাধনে পরিবারের এসব কাজের গুরুত্ব অপরিসীম।

জোড়ায়/ দলগত কাজ : ছকের মাধ্যমে পরিবারের বিভিন্ন ধরনের কাজের তালিকা তৈরি কর।

পরিবারের কাজের ক্ষেত্র	পরিবারের কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ/ উদাহরণ
১। জৈবিক কাজ	
২। শিক্ষামূলক কাজ	
৩। অর্থনৈতিক কাজ	
৪। রাজনৈতিক কাজ	
৫। মনস্তাত্ত্বিক কাজ	
৬। বিনোদনমূলক কাজ	

সমাজ

সমাজ বলতে সেই সংঘবদ্ধ জনগোষ্ঠীকে বোঝায়, যারা কোনো সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একত্রিত হয়। অর্থাৎ একদল লোক যখন সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংঘবদ্ধ হয়ে বসবাস করে, তখনই সমাজ গঠিত হয়। সমাজের এ ধারণাটি বিশ্লেষণ করলে এর প্রধান দু'টি বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়।

২০১৬

যথা- ক) বহুলোকের সংঘবদ্ধভাবে বসবাস এবং খ) ঐ সংঘবদ্ধতার পেছনে থাকে সাধারণ উদ্দেশ্য। তাছাড়া সমাজের সদস্যদের মধ্যে আরও কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়- ঐক্য ও পারস্পরিক সহযোগিতা, নির্ভরশীলতা, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য ইত্যাদি।

সমাজের সাথে মানুষের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। মানুষকে নিয়ে সমাজ গড়ে উঠে। আর সমাজ মানুষের বহুমুখী প্রয়োজন মিটিয়ে উন্নত ও নিরাপদ সামাজিক জীবন দান করে। সমাজের মধ্যেই মানুষের মানবীয় গুণাবলি ও সামাজিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটে। সমাজকে সভ্য জীবনযাপনের আদর্শ স্থান মনে করে বলে মানুষ তার নিজের প্রয়োজনেই সমাজ গড়ে তোলে। গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটল যথার্থই বলেছেন, মানুষ স্বভাবগত সামাজিক জীব, যে সমাজে বাস করে না, সে হয় পশু, না হয় দেবতা। বস্তুত মানুষ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সমাজে বসবাস করে এবং সামাজিক পরিবেশেই সে নিজেকে বিকশিত করে।

কাজ : দলে বিভক্ত হয়ে পরিবার ও সমাজের সম্পর্ক নির্ণয় কর। (দলগত কাজের ক্ষেত্রে সহায়ক পয়েন্ট : অবিচ্ছেদ্য/ পরস্পরের প্রভাব/নিরাপত্তা দান/ ব্যক্তিত্বের বিকাশে সহায়তা)।

রাষ্ট্র

রাষ্ট্র একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। বিশ্বের মানুষ কোনো না কোনো রাষ্ট্রে বসবাস করে। আমাদের এই পৃথিবীতে ছোট বড় মিলিয়ে প্রায় ২০০ টি রাষ্ট্র আছে। প্রতিটি রাষ্ট্রেরই আছে নির্দিষ্ট ভূখণ্ড এবং জনসংখ্যা। এ ছাড়া রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য আরও আছে সরকার এবং সার্বভৌমত্ব। মূলত এগুলো ছাড়া কোনো রাষ্ট্র গঠিত হতে পারে না। অধ্যাপক গার্নার বলেন, 'সুনির্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী, সুসংগঠিত সরকারের প্রতি স্বভাবজাতভাবে আনুগত্যশীল, বহিঃশত্রুর নিয়ন্ত্রণ হতে মুক্ত স্বাধীন জনসমষ্টিকে রাষ্ট্র বলে।' এ সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে রাষ্ট্রের চারটি উপাদান পাওয়া যায়। যথা- ১। জনসমষ্টি, ২। নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, ৩। সরকার ও ৪। সার্বভৌমত্ব।

১. **জনসমষ্টি :** রাষ্ট্র গঠনের অপরিহার্য উপাদান জনসমষ্টি। কোনো ভূখণ্ডে একটি জনগোষ্ঠী স্থায়ীভাবে বসবাস করলেই রাষ্ট্র গঠিত হতে পারে। তবে একটি রাষ্ট্র গঠনের জন্য কী পরিমাণ জনসমষ্টি প্রয়োজন, এর কোনো সুনির্দিষ্ট নিয়ম নেই। যেমন- বাংলাদেশের জনসংখ্যা প্রায় ১৫ কোটি, ভারতের জনসংখ্যা প্রায় ১২১ কোটি (২০১১), ব্রুনাইয়ে প্রায় দুই লক্ষ। তবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে, একটি রাষ্ট্রের সম্পদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ জনসংখ্যা থাকা বাঞ্ছনীয়।

২. **নির্দিষ্ট ভূখণ্ড :** রাষ্ট্র গঠনের জন্য নির্দিষ্ট ভূখণ্ড আবশ্যক। ভূখণ্ড বলতে একটি রাষ্ট্রের স্থলভাগ, জলভাগ ও আকাশসীমাকে বোঝায়। রাষ্ট্রের ভূখণ্ড ছোট বা বড় হতে পারে। যেমন- বাংলাদেশের ক্ষেত্রফল ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটার। তবে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে স্বাক্ষরিত স্থল সীমানা চুক্তি অনুযায়ী ২০১৫ সালের ৩১ জুলাই দু'দেশের মধ্যে পারস্পরিক ছিটমহল বিনিময়ের ফলে বাংলাদেশের মোট ভূখন্ডে ১০,০৪১.২৫ একর জমি যোগ হয়েছে। এছাড়া বঙ্গোপসাগরে মিয়ানমার ও ভারতের সাথে আন্তর্জাতিক আদালতে সমুদ্রসীমা মামলার রায় বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমার

আয়তন বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে সমুদ্রে ১,১১,৮১৩ বর্গ কি.মি. সমুদ্র অঞ্চলে বাংলাদেশের সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গণচীন, ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা প্রভৃতি রাষ্ট্রের ক্ষেত্রফল বাংলাদেশের চেয়ে অনেক বড়।

৩. **সরকার :** রাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সরকার। সরকার ছাড়া রাষ্ট্র গঠিত হতে পারে না। রাষ্ট্রের যাবতীয় কার্যাবলি সরকারের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। সরকার গঠিত হয় তিনটি বিভাগ নিয়ে। যথা- আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ। সকল রাষ্ট্রের সরকারের গঠন একই রকম হলেও রাষ্ট্রভেদে সরকারের রূপ ভিন্ন ভিন্ন। যেমন- বাংলাদেশে সংসদীয় সরকার, আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার। রাষ্ট্রের যাবতীয় শাসনকাজ সরকারই পরিচালনা করে থাকে।

৪. **সার্বভৌমত্ব :** সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্র গঠনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। এটি রাষ্ট্রের চরম, পরম ও সর্বোচ্চ ক্ষমতা। এর দু'টি দিক রয়েছে, যথা- অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সার্বভৌমত্ব। অভ্যন্তরীণ সার্বভৌমত্বের সাহায্যে রাষ্ট্র দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন আদেশ-নির্দেশ জারির মাধ্যমে ব্যক্তি ও সংস্থার উপর কর্তৃত্ব করে। অন্যদিকে, বাহ্যিক সার্বভৌমত্বের মাধ্যমে রাষ্ট্র বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণ থেকে দেশকে মুক্ত রাখে।

একক কাজ : পশ্চিমবঙ্গ, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম রাষ্ট্র কি না যুক্তিসহ আলোচনা কর।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি

রাষ্ট্র কখন ও কীভাবে উৎপত্তি লাভ করেছে তা নিশ্চিত করে বলা কঠিন। তবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা অতীত ইতিহাস ও রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে কতগুলো মতবাদ প্রদান করেছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- ১। ঐশী মতবাদ, ২। বল বা শক্তি প্রয়োগ মতবাদ, ৩। সামাজিক চুক্তি মতবাদ ও ৪। ঐতিহাসিক বা বিবর্তনমূলক মতবাদ।

১. ঐশী মতবাদ

এটি রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে সবচেয়ে পুরাতন মতবাদ। এ মতবাদে বলা হয়- বিধাতা বা স্রষ্টা স্বয়ং রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছেন এবং রাষ্ট্রকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য তিনি শাসক প্রেরণ করেছেন। শাসক তাঁর প্রতিনিধি এবং তিনি তার কাজের জন্য একমাত্র স্রষ্টা বা বিধাতার নিকট দায়ী, জনগণের নিকট নয়। শাসক যেহেতু স্রষ্টার নির্দেশে কাজ করে, সেহেতু শাসকের আদেশ অমান্য করার অর্থ বিধাতার নির্দেশ অমান্য করা। এ মতবাদ অনুসারে শাসক একাধারে যেমন রাষ্ট্রপ্রধান এবং অন্যদিকে তিনিই আবার ধর্মীয় প্রধান। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা এ মতবাদকে বিপদজনক, অগণতান্ত্রিক ও অযৌক্তিক বলে সমালোচনা করেন। তাদের মতে, যেখানে জনগণের নিকট শাসক দায়ী থাকে না, সেখানে স্বৈরশাসন সৃষ্টি হয়। এ মতবাদকে বিধাতার সৃষ্টিমূলক মতবাদও বলা হয়।

২. বল বা শক্তি প্রয়োগ মতবাদ

এ মতবাদের মূল বক্তব্য হলো- বল বা শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে এবং শক্তির জোরে রাষ্ট্র টিকে আছে। এ মতবাদে বলা হয়, সমাজের বলশালী ব্যক্তিরা যুদ্ধ-বিগ্রহ বা বল প্রয়োগের মাধ্যমে দুর্বলের উপর নিজেদের আধিপত্য স্থাপনের মাধ্যমে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে এবং

শাসনকার্য পরিচালনা করে। এ মতবাদে আরও বলা হয়, সৃষ্টির শুরু থেকে আজ পর্যন্ত এভাবেই যুদ্ধ-বিগ্রহের মাধ্যমে রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে। সমালোচকরা এ মতবাদকে অযৌক্তিক, ভ্রান্ত ও ক্ষতিকর বলে আখ্যায়িত করেছেন। তারা বলেন, শক্তির মাধ্যমেই যদি রাষ্ট্র টিকে থাকত তাহলে শক্তিশালী রাষ্ট্রের পাশাপাশি সামরিক দিক থেকে দুর্বল রাষ্ট্র টিকে থাকতে পারত না। আসলে শক্তির জোরে নয় বরং সম্মতির ভিত্তিতে রাষ্ট্র গড়ে উঠে এবং টিকে থাকে।

৩. সামাজিক চুক্তি মতবাদ

এ মতবাদের মূলকথা হলো- সমাজে বসবাসকারী জনগণের পারস্পরিক চুক্তির ফলে রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে। ব্রিটিশ রাষ্ট্র দার্শনিক টমাস হবস্ ও জন লক এবং ফরাসি দার্শনিক জ্যাঁ জ্যাক রুশো সামাজিক চুক্তি মতবাদের প্রবর্তক ছিলেন।

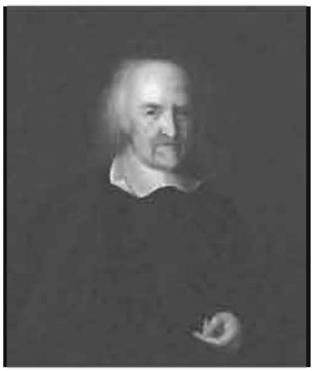

টমাস হবস্

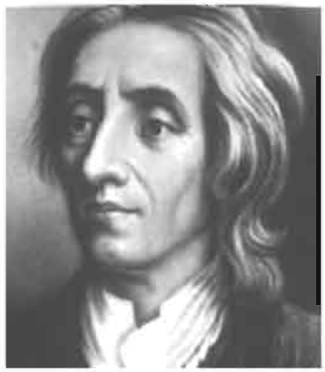

জন লক

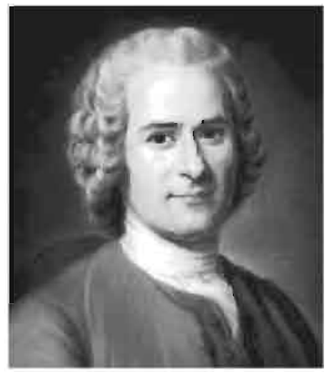

জ্যাঁ জ্যাক রুশো

এ মতবাদ অনুযায়ী, রাষ্ট্র সৃষ্টির পূর্বে মানুষ প্রকৃতির রাজ্যে বসবাস করত। তারা প্রকৃতির নিয়ম মেনে চলত এবং প্রাকৃতিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত। কিন্তু প্রকৃতির রাজ্যে আইন অমান্য করলে শাস্তি দেয়ার কোনো কর্তৃপক্ষ ছিল না। ফলে সামাজিক জীবনে অরাজকতা ও বিশৃংখলা সৃষ্টি হয়। মানুষ হয়ে উঠে স্বার্থপর ও আত্মকেন্দ্রিক। দুর্বলের উপর চলে সবলের অত্যাচার। এ কারণে মানুষের জীবন কষ্টকর ও দুর্বিষহ হয়ে উঠে। এ ছাড়া প্রকৃতির রাজ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় ব্যক্তিগত সম্পত্তির আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। প্রকৃতির রাজ্যের এ অরাজকতাপূর্ণ অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য মানুষ নিজেদের মধ্যে চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্র সৃষ্টি করে এবং নিরাপত্তার বিনিময়ে নিজেদের উপর শাসন করার জন্য স্থায়ীভাবে শাসকের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করে।

৪. ঐতিহাসিক বা বিবর্তনমূলক মতবাদ

এ মতবাদের মূল বক্তব্য হলো- রাষ্ট্র কোনো একটি বিশেষ কারণে হঠাৎ করে সৃষ্টি হয়নি। দীর্ঘদিনের বিবর্তনের মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন শক্তি ও উপাদান ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হতে হতে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে। যেসব উপাদানের কার্যকারিতার ফলে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে, সেগুলো হলো- সংস্কৃতির বন্ধন, রক্তের বন্ধন, ধর্মের বন্ধন, যুদ্ধবিগ্রহ, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চেতনা ও কার্যকলাপ। ঐতিহাসিক বা বিবর্তনমূলক মতবাদ সম্পর্কে ড. গার্নার বলেন, 'রাষ্ট্র বিধাতার সৃষ্টি নয়, বল

প্রয়োগের মাধ্যমেও সৃষ্টি হয়নি বরং ঐতিহাসিক ক্রমবিবর্তনের ফলে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে।' রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কিত বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে ঐতিহাসিক বা বিবর্তনমূলক মতবাদ সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত ও গ্রহণযোগ্য মতবাদ। এ মতবাদে রাষ্ট্রের উৎপত্তির সঠিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। আসলে বর্তমানের রাষ্ট্র বহুযুগের বিবর্তনের ফল।

একক কাজ : ঐতিহাসিক বা বিবর্তনমূলক মতবাদ সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও বিজ্ঞানসম্মত– পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন কর।

সরকারের ধারণা

সরকার রাষ্ট্র গঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সরকার ছাড়া রাষ্ট্র গঠিত হয় না। সরকারের মাধ্যমেই রাষ্ট্র পরিচালিত হয়। রাষ্ট্র পরিচালনা করতে গিয়ে সরকার তিন ধরনের কাজ সম্পাদন করে। যথা- আইন প্রণয়ন, শাসন পরিচালনা ও বিচার-সংক্রান্ত। এ তিন ধরনের কাজ সম্পাদনের জন্য সরকারের তিনটি বিভাগ রয়েছে। যেমন- আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ। আইন বিভাগ দেশের প্রয়োজনীয় আইন তৈরি করে, সেই আইন প্রয়োগ করে শাসন বিভাগ সুষ্ঠুভাবে শাসন কার্য পরিচালনা করে এবং বিচার বিভাগ অপরাধীকে শাস্তি দেয় এবং নিরপরাধীকে মুক্তি দিয়ে সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে। অতএব সরকার বলতে সেই জনগোষ্ঠীকে বোঝায়, যারা রাষ্ট্রের আইন প্রণয়ন, শাসন পরিচালনা ও বিচার প্রতিষ্ঠার সাথে জড়িত। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণ নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠন করে। সরকার জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে।

রাষ্ট্র ও সরকারের সম্পর্ক

প্রাচীনকালে রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হতো না। ফ্রান্সের চতুর্দশ লুই বলতেন, আমিই রাষ্ট্র। আধুনিককালে রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে, নিম্নে সেগুলো বর্ণিত হলো-

১. **গঠনগত :** জনসমষ্টি, ভূখণ্ড, সরকার ও সার্বভৌমত্ব–এ চারটি উপাদান নিয়ে রাষ্ট্র গঠিত হয়। সরকার উক্ত চারটি উপাদানের মধ্যে একটি অন্যতম উপাদান, যার মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালিত হয়।

২. **জনসমষ্টি :** রাষ্ট্র গঠিত হয় দেশের সব জনগণ নিয়ে। আর সরকার গঠিত হয় আইন, শাসন ও বিচার বিভাগে নিয়োজিত ব্যক্তিদের নিয়ে।

৩. **স্থায়িত্ব :** রাষ্ট্র স্থায়ী প্রতিষ্ঠান, কিন্তু সরকার অস্থায়ী এবং পরিবর্তনশীল। জনগণের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে এবং রাষ্ট্রের শাসনকার্য পরিচালনার সুবিধার্থে সরকার পরিবর্তিত হয়। কিন্তু রাষ্ট্রের পরিবর্তন হয় না। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশ সরকারের পরিবর্তন হয়েছে বহুবার কিন্তু রাষ্ট্রের স্থায়িত্বের কোনো পরিবর্তন হয়নি।

৪. **প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য :** বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য অভিন্ন। কিন্তু সরকারের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য রাষ্ট্রভেদে ভিন্ন ভিন্ন। যেমন- বাংলাদেশে রয়েছে সংসদীয় সরকার, আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রয়েছে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার।

৫. **সার্বভৌমত্ব :** রাষ্ট্র সার্বভৌম বা সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। সরকার সার্বভৌম ক্ষমতার বাস্তবায়নকারী মাত্র।

৬. **ধারণা :** রাষ্ট্র একটি বিমূর্ত ধারণা। রাষ্ট্রকে দেখা যায় না, কল্পনা বা অনুধাবন করা যায়। কিন্তু সরকার মূর্ত। কারণ, যাদের নিয়ে সরকার গঠিত হয়, তাদের দেখা যায়।

সুতরাং রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে উল্লেখিত পার্থক্য থাকলেও আমরা বলতে পারি, উভয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। একটিকে ছাড়া অন্যটির কথা কল্পনা করা যায় না। রাষ্ট্রকে পরিচালনার জন্যই সরকার গঠিত হয়।

দলীয় কাজ : রাষ্ট্র ও সরকারের সম্পর্ক নির্ণয় কর।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। নাগরিকতার স্থানীয় বিষয় কোনটি?

ক) পৌরসভা খ) আইন সভা
গ) কমন ওয়েলথ ঘ) জাতিসংঘ

২। রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য অপরিহার্য উপাদান কোনটি?

ক) জনসমষ্টি খ) ভূখণ্ড
গ) সরকার ঘ) সার্বভৌমত্ব

৩। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের নিকট ঐশী মতবাদ বিপজ্জনক মনে হওয়ার কারণ, এখানে শাসক–

i. তার কাজের জন্য একমাত্র বিধাতার নিকট দায়ী থাকেন।
ii. নিজেই একাধারে রাষ্ট্রপ্রধান অপরদিকে ধর্মীয় প্রধান।
iii. নিজেকে স্রষ্টার প্রতিনিধি মনে করেন।

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক) i ও ii খ) ii ও iii
গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

নুরজাহান বেগম অবসর সময়ে বাঁশের ঝুড়ি তৈরি করে বাজারে বিক্রি করেন। এ কাজে তার ভালো লাভ হয়। জামিলা তার কাছে ঝুড়ি তৈরি করা শিখে নিজের পরিবারের ব্যবহারের জন্য ঝুড়ি তৈরি করেন।

৪। নুরজাহান বেগমের কাজটি পরিবারের কোন ধরনের কাজ?

ক) শিক্ষামূলক খ) বিনোদনমূলক
গ) অর্থনৈতিক ঘ) মনস্তাত্ত্বিক

৫। নুরজাহান বেগমের কাজটির ক্ষেত্রে নিচের কোনটি সর্বাধিক প্রযোজ্য–

ক) শুধু নিজের সচ্ছলতা বৃদ্ধি করে খ) তার গ্রামের মানুষদের কর্মক্ষম করে তোলে

গ) বাঁশের উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধি করে ঘ) আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করে

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। ক ও খ রাষ্ট্রের অবস্থান পাশাপাশি। 'ক' রাষ্ট্র তার পার্শ্ববর্তী দুর্বল রাষ্ট্র 'গ' কে যুদ্ধে পরাজিত করে দখল করে নেয়। 'খ' রাষ্ট্র তার পার্শ্ববর্তী অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল রাষ্ট্রগুলোকে পারস্পরিক সহযোগিতা দানের মাধ্যমে কালক্রমে সকলে মিলে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

ক. দার্শনিক জ্যাঁ জ্যাক রুশো রাষ্ট্র সৃষ্টির কোন মতবাদের প্রবর্তক ছিলেন?

খ. রাষ্ট্রের চরম ক্ষমতা কোনটি? ব্যাখ্যা কর।

গ. 'ক' রাষ্ট্র কর্তৃক 'গ' রাষ্ট্রকে দখল করে নেওয়া রাষ্ট্র সৃষ্টির যে মতবাদকে সমর্থন করে তার ব্যাখ্যা দাও।

ঘ. 'খ' রাষ্ট্রের শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার পেছনে যে মতবাদের ধারণা রয়েছে সেটিই অধিক গ্রহণযোগ্য মতবাদ–বিশ্লেষণ কর।

২। পারভেজ দম্পতি দুজনেই কর্মজীবী হওয়ায় তাদের একমাত্র পুত্র রিপনকে ছোটবেলা থেকেই হোস্টেলে রেখে পড়াশুনা করান। ছুটিতে বাড়ি আসলেও ব্যস্ততার কারণে মা-বাবা রিপনকে বেশি সময় দিতে পারেন নাই। বেশিরভাগ সময় একা থাকাতে সে তার নিজের সুখ-দুঃখ, আনন্দ–বেদনা কারও সাথে ভাগাভাগি করতে পারে না এবং অন্যের সুখ-দুঃখেও আনন্দ কিংবা কষ্ট পায় না। একদিন তিনি রমিজ সাহেবের বাসায় বেড়াতে গেলে তাঁর ছেলে রবিন দরজা খুলেই সালাম দেয়। তাকে সম্মানের সাথে বসিয়ে বাবাকে ডেকে দেয় এবং নিজেই চা, নাস্তা নিয়ে আসে। পারভেজ তাকে দেখে মুগ্ধ হন এবং নিজের ছেলেকে এভাবে গড়ে তুলতে পারেন নাই ভেবে মনে মনে কষ্ট পান।

ক. পারিবারিক কাঠামো অনুযায়ী পরিবার কত প্রকার?

খ. আত্মসংযমের শিক্ষা পরিবারের কোন ধরনের কাজ? ব্যাখ্যা কর।

গ. রিপনের মানসিক বিকাশ সমৃদ্ধ না হওয়ায় পরিবারের যে কাজটি ব্যাহত হয়েছে তার ব্যাখ্যা দাও।

ঘ. ছেলেমেয়েদের সঠিকভাবে গড়ে তোলার জন্য জনাব রমিজের পরিবারের যে কাজটির ভূমিকা রয়েছে তার গুরুত্ব মূল্যায়ন কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়
নাগরিক ও নাগরিকতা

আমরা সবাই বাংলাদেশের নাগরিক। নাগরিক হিসেবে আমরা প্রত্যেকে কতিপয় অধিকার ভোগ এবং কর্তব্য পালন করি। আবার কতগুলো গুণের অধিকারী হয়ে আমরা সুনাগরিকে পরিণত হতে পারি। সুনাগরিক রাষ্ট্রের সম্পদ। আমাদের প্রত্যেকের সুনাগরিকতার শিক্ষা লাভ করা অত্যাবশ্যক। এ অধ্যায়ে নাগরিক ও নাগরিকতার ধারণা, নাগরিকতা অর্জনের উপায়, দ্বৈত নাগরিকতা, সুনাগরিকের ধারণা ও বৈশিষ্ট্য, নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

এ অধ্যায় পড়া শেষে আমরা-

- নাগরিক ও নাগরিকতার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- নাগরিকতা অর্জনের উপায় বর্ণনা করতে পারব।
- দ্বৈত নাগরিকতা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- সুনাগরিকতার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্যের ধারণা বর্ণনা করতে পারব।
- নাগরিক অধিকার ও কর্তব্যের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারব।
- নাগরিক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে আগ্রহী হব।

নাগরিক ও নাগরিকতা

আজ থেকে প্রায় ২৫০০ বছর পূর্বে প্রাচীন গ্রিসে নাগরিক ও নাগরিকতার ধারণার উদ্ভব হয়। প্রাচীন গ্রিসে তখন নগরকেন্দ্রিক ছোট ছোট রাষ্ট্র ছিল, সেগুলোকে নগর-রাষ্ট্র বলা হতো। এসব নগর-রাষ্ট্রে যারা প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করত তারা নাগরিক হিসেবে পরিচিত ছিল। তাদের ভোটাধিকার ছিল। তবে নগর-রাষ্ট্রে নারী, বিদেশি ও গৃহভৃত্য–এরা নাগরিক ছিল না। সময়ের পরিক্রমায় নাগরিকত্বের ধারণায় অনেকটা পরিবর্তন হয়েছে। বর্তমানে নাগরিক হওয়ার ক্ষেত্রে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে কোনো পার্থক্য করা হয় না।

আমরা বাংলাদেশের নাগরিক। কারণ, আমরা এদেশে জন্মগ্রহণ করে স্থায়ীভাবে বসবাস করছি, রাষ্ট্রপ্রদত্ত সকল প্রকার অধিকার (সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক) ভোগ করছি এবং রাষ্ট্রের প্রতি বিভিন্ন দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করছি। সুতরাং আমরা বলতে পারি, যে ব্যক্তি কোনো রাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাস করে, রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে, রাষ্ট্রপ্রদত্ত অধিকার ভোগ করে এবং রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য পালন করে, তাকে ঐ রাষ্ট্রের নাগরিক বলে।

নাগরিক ও নাগরিকতাকে কেউ কেউ একই অর্থে ব্যবহার করেন। আসলে এদের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ রয়েছে। নাগরিক হলো ব্যক্তির পরিচয়। যেমন- আমাদের পরিচয় আমরা বাংলাদেশের নাগরিক। আর রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে ব্যক্তি যে মর্যাদা ও সম্মান পেয়ে থাকে তাকে নাগরিকতা বলে।

দলীয় কাজ : নাগরিকের বৈশিষ্ট্যগুলোর তালিকা তৈরি কর।

নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতি

নাগরিকতা অর্জনের দুটি পদ্ধতি রয়েছে। যেমন- ক) জন্মসূত্র ও খ) অনুমোদন সূত্র।

ক. জন্মসূত্রে নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতি : জন্মসূত্রে নাগরিকতা অর্জনের ক্ষেত্রে দুটি নীতি অনুসরণ করা হয়।
যথা- ১। জন্মনীতি ও ২। জন্মস্থান নীতি।

১. জন্মনীতি : এ নীতি অনুযায়ী পিতা-মাতার নাগরিকতা দ্বারা সন্তানের নাগরিকতা নির্ধারিত হয়। এ ক্ষেত্রে শিশু যে দেশে বা যেখানেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন, পিতা-মাতার নাগরিকতা দ্বারা সন্তানের নাগরিকতা নির্ধারিত হয়। যেমন- বাংলাদেশের এক দম্পতি যুক্তরাজ্যে গিয়ে একটি সন্তান জন্ম দিল। এ নীতি অনুসারে ঐ সন্তান বাংলাদেশের নাগরিকতা লাভ করবে। কারণ তার পিতা-মাতা বাংলাদেশের নাগরিক।

২. জন্মস্থান নীতি : এ নীতি অনুযায়ী পিতা-মাতা যে দেশেরই নাগরিক হোক না কেন, সন্তান যে রাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করবে সে ঐ রাষ্ট্রের নাগরিকতা লাভ করবে। যেমন- বাংলাদেশি পিতা-মাতার সন্তান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করলে, সেই সন্তান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকতা লাভ করবে। এ ক্ষেত্রে নাগরিকতা নির্ধারণে রাষ্ট্রকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। এ নীতি অনুযায়ী কোনো মা-বাবার সন্তান অন্য দেশের জাহাজ বা দূতাবাসে জন্মগ্রহণ করলেও জাহাজ বা দূতাবাস যে দেশের সে ঐ দেশের নাগরিক হবে। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, জন্মসূত্রে নাগরিকতা প্রদানের ক্ষেত্রে বিশ্বের অধিকাংশ দেশ জন্মনীতি অনুসরণ করে। বাংলাদেশ তার মধ্যে একটি। অন্যদিকে, আমেরিকা, কানাডাসহ অল্প কয়েকটি দেশ জন্মস্থান নীতির মাধ্যমে নাগরিকতা নির্ধারণ করে।

খ. অনুমোদন সূত্রে নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতি : কতগুলো শর্ত পালনের মাধ্যমে এক রাষ্ট্রের নাগরিক অন্য রাষ্ট্রের নাগরিকতা অর্জন করলে তাকে অনুমোদন সূত্রে নাগরিক বলা হয়। সাধারণত অনুমোদন সূত্রে নাগরিকতা অর্জনের ক্ষেত্রে যেসব শর্ত পালন করতে হয় সেগুলো হলো- ১) সেই রাষ্ট্রের নাগরিককে বিয়ে করা, ২) সরকারি চাকরি করা, ৩) সততার পরিচয় দেওয়া, ৪) সে দেশের ভাষা জানা, ৫) সম্পত্তি ক্রয় করা, ৬) দীর্ঘদিন বসবাস করা, ৭) সেনাবাহিনীতে যোগদান করা। রাষ্ট্রভেদে এসব শর্ত ভিন্ন হতে পারে।

কোনো ব্যক্তি যদি এসব শর্তের এক বা একাধিক শর্ত পূরণ করে, তবে তাকে নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করতে হয়। আবেদন ঐ রাষ্ট্রের সরকার কর্তৃক গৃহীত হলে সে অনুমোদন সূত্রে নাগরিকে পরিণত হয়। বাংলাদেশসহ বিশ্বের অনেক রাষ্ট্রের নাগরিকরা যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্রে অনুমোদন সূত্রে নাগরিকত্ব লাভের মাধ্যমে বসবাস করছে। তাছাড়া মানবিক কারণেও নাগরিকতা দেওয়া হয়। যেমন- কোনো ব্যক্তি যদি কোনো রাষ্ট্রে আশ্রয় নেয়, তবে সেই রাষ্ট্র তার আবেদনের ভিত্তিতে তাকে নাগরিকত্ব দিতে পারে।

দলীয় কাজ : নাগরিকতা অর্জনের উপায় সংক্ষেপে বর্ণনা কর ।

দ্বৈত নাগরিকতা

একজন ব্যক্তির একই সঙ্গে দুটি রাষ্ট্রের নাগরিকতা অর্জনকে দ্বৈত নাগরিকতা বলে। সাধারণত একজন ব্যক্তি একটিমাত্র রাষ্ট্রের নাগরিকতা অর্জনের সুযোগ পায় । তবে জন্মসূত্রে নাগরিকতা অর্জনের দুটি নীতি থাকায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে দ্বৈত নাগরিকতা সৃষ্টি হতে পারে । যেমন- বাংলাদেশ নাগরিকতা নির্ধারণে জন্মনীতি অনুসরণ করে, অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জন্মনীতি ও জন্মস্থান উভয় নীতি অনুসরণ করে। কাজেই বাংলাদেশের পিতা-মাতার সন্তান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করলে সেই সন্তান জন্মস্থান নীতি অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকতা লাভ করবে । আবার জন্মনীতি অনুযায়ী সে বাংলাদেশের নাগরিকতা অর্জন করবে । এক্ষেত্রে দ্বৈত নাগরিকতার সৃষ্টি হবে । তবে পূর্ণবয়স্ক হলে তাকে যেকোনো একটি রাষ্ট্রের অর্থাৎ বাংলাদেশ কিংবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হতে হবে ।

সুনাগরিক

রাষ্ট্রের সব নাগরিক সুনাগরিক নয় । আমাদের মধ্যে যে বুদ্ধিমান, যে সকল সমস্যা অতি সহজে সমাধান করে, যার বিবেক আছে সে ন্যায়-অন্যায়, সৎ-অসৎ বুঝতে পারে এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকে, আর যে আত্মসংযমী সে বৃহত্তর স্বার্থে নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করতে পারে । এসব গুণসম্পন্ন নাগরিকদের বলা হয় সুনাগরিক । উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, সুনাগরিকের প্রধানত তিনটি গুণ রয়েছে । যথা- ১ । বুদ্ধি, ২ । বিবেক ও ৩ । আত্মসংযম ।

১. **বুদ্ধি :** বুদ্ধি সুনাগরিকের অন্যতম গুণ । বুদ্ধিমান নাগরিক পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের বহুমুখী সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে । সুনাগরিকের বুদ্ধির উপর নির্ভর করে আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সফলতা । তাই বুদ্ধিমান নাগরিক রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ সম্পদ । প্রতিটি রাষ্ট্রের উচিত নাগরিকদের যথাযথ শিক্ষাদানের মাধ্যমে বুদ্ধিমান নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা ।

২. **বিবেক :** রাষ্ট্রের নাগরিকদের হতে হবে বিবেকবোধসম্পন্ন । এ গুণের মাধ্যমে নাগরিক ন্যায়-অন্যায়, সৎ-অসৎ, ভালো-মন্দ অনুধাবন করতে পারে । বিবেকবান নাগরিক একদিকে যেমন রাষ্ট্রপ্রদত্ত অধিকার ভোগ করে, ঠিক তেমনি রাষ্ট্রের প্রতি যথাযথভাবে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে এবং ন্যায়ের পক্ষে থাকে । যেমন- বিবেকসম্পন্ন নাগরিক রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত থাকে, আইন মান্য করে, যথাসময়ে কর প্রদান করে, নির্বাচনে যোগ্য ও সৎ ব্যক্তিকে ভোট দেয় ।

৩. **আত্মসংযম :** সুনাগরিকের আত্মসংযম থাকা উচিত । এর অর্থ নিজেকে সকল প্রকার লোভ-লালসার ঊর্ধ্বে রেখে সততা ও নিষ্ঠার সাথে নিজের দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করা । অর্থাৎ সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করার নাম আত্মসংযম । আমাদের মধ্যে যিনি এ গুণের অধিকারী তিনি যেমন স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করতে পারেন, তেমনি অন্যের মতামত প্রকাশেও নিজেকে সংযত রাখেন । এ ছাড়া, প্রত্যেক নাগরিককে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও পক্ষপাতিত্বের ঊর্ধ্বে থাকতে হবে । এর মাধ্যমে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ জাগ্রত হয় ।

দলীয় কাজ : নাগরিক ও সুনাগরিকের পার্থক্য নির্ণয় কর ।

নাগরিক অধিকার

নিচের চিত্রগুলো থেকে আমরা নাগরিকের কয়েকটি অধিকার সম্পর্কে ধারণা পাই । এ ছাড়া নাগরিক হিসেবে আমাদের আরও অনেক অধিকার আছে ।

শিক্ষার অধিকার

পরিবার গঠনের অধিকার

ভোটাধিকার

অধিকার হলো সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত কতগুলো সুযোগ-সুবিধা, যা ভোগের মাধ্যমে নাগরিকের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে । অধিকার ব্যতীত মানুষ তার ব্যক্তিত্বকে উপলব্ধি করতে পারে না । অধিকারের মূল লক্ষ্য ব্যক্তির সর্বজনীন কল্যাণ সাধন । রাষ্ট্রের নাগরিকদের মানসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য অধিকার অপরিহার্য ।

আমরা অনেক সময় অধিকার বলতে ইচ্ছানুযায়ী যেকোনো কিছু করার ক্ষমতাকে বুঝি । কিন্তু যেমন খুশি তেমন কাজ করা অধিকার হতে পারে না । অধিকার সকল নাগরিকের মঙ্গল ও উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদান করা হয় । অধিকারের নামে আমাদের এমন কোনো কাজ করা উচিত নয়, যার ফলে অন্যের ক্ষতি হতে পারে ।

একক কাজ : অধিকারের দুটি বৈশিষ্ট্য লিখ ।

অধিকারের শ্রেণিবিভাগ

অধিকার প্রধানত দুই প্রকার । যথা- ১ । নৈতিক অধিকার ও ২ । আইনগত অধিকার ।

১. **নৈতিক অধিকার :** নৈতিক অধিকার মানুষের বিবেক এবং সামাজিক নৈতিকতা বা ন্যায়বোধ থেকে আসে । যেমন- দুর্বলের সাহায্য লাভের অধিকার নৈতিক অধিকার । এটি রাষ্ট্র কর্তৃক প্রণয়ন করা হয় না যার ফলে এর কোনো আইনগত ভিত্তি নেই । তাছাড়া এ অধিকার ভঙ্গকারীকে কোনো শাস্তি দেওয়া হয় না । নৈতিক অধিকার বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন রকম হতে পারে ।

২. **আইনগত অধিকার :** যেসব অধিকার রাষ্ট্রের আইন কর্তৃক স্বীকৃত ও অনুমোদিত, সেগুলোকে আইনগত অধিকার বলে । আইনগত অধিকারকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায় । যেমন- ক. সামাজিক খ. রাজনৈতিক ও গ. অর্থনৈতিক অধিকার ।

২০১৬

ক. সামাজিক অধিকার : সমাজে সুখ-শান্তিতে বসবাস করার জন্য আমরা সামাজিক অধিকার ভোগ করি। যেমন- জীবন রক্ষার, স্বাধীনভাবে চলাফেরার ও মত প্রকাশের, পরিবার গঠনের, শিক্ষার, আইনের দৃষ্টিতে সমান সুযোগ লাভের, সম্পত্তি লাভের ও ধর্মচর্চার অধিকার ইত্যাদি।

খ. রাজনৈতিক অধিকার : নির্বাচনে ভোটাধিকার, নির্বাচিত হওয়া এবং সকল প্রকার অভাব-অভিযোগ আবেদনের মাধ্যমে প্রতিকার পাওয়াকে রাজনৈতিক অধিকার বলে। এসব অধিকার ভোগের বিনিময়ে নাগরিকরা রাষ্ট্র পরিচালনায় পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ পায়।

গ. অর্থনৈতিক অধিকার : জীবনধারণ করা এবং জীবনকে উন্নত ও এগিয়ে নেওয়ার জন্য রাষ্ট্রপ্রদত্ত অধিকারকে অর্থনৈতিক অধিকার বলে। যেমন- যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ করার অধিকার, ন্যায্য মজুরি লাভের অধিকার, অবকাশ লাভের অধিকার, শ্রমিকসংঘ গঠনের অধিকার।

দলীয় কাজ : অধিকারের শ্রেণিবিভাগের একটি চার্ট প্রস্তুত কর।

জোড়ায় কাজ : সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকারের পার্থক্য বর্ণনা কর।

তথ্য অধিকার আইন

জনগণের মৌলিক অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইন একটি যুগান্তকারী আইন। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ কর্তৃক গৃহীত তথ্য অধিকার আইনটি ৫ এপ্রিল, ২০০৯ (২২ চৈত্র, ১৪১৫) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করে এবং এ আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হয়। এ আইনটি চালু হওয়ার পূর্বে যেসব তথ্য গোপন ছিল, এখন জনগণ তা জেনে নিজেদের অধিকার যেমন ভোগ করতে পারবে, তেমনি সেই সব প্রতিষ্ঠানের কাজের উপর নজরদারি স্থাপন করে তাদের কাজকে আরও নিয়মতান্ত্রিক ও সত্যনিষ্ঠ করে তুলতে পারবে। জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠায় তথ্য অধিকার আইন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই এই আইনটি সকল নাগরিকের জানা একান্ত প্রয়োজন।

'তথ্য' হচ্ছে কোনো কর্তৃপক্ষের গঠন, কাঠামো ও দাপ্তরিক কর্মকাণ্ড-সংক্রান্ত যেকোনো স্মারক, বই, নকশা, মানচিত্র, চুক্তি, তথ্য-উপাত্ত, লগ বহি, আদেশ, বিজ্ঞপ্তি, দলিল, নমুনা, পত্র, প্রতিবেদন, হিসাব বিবরণী, প্রকল্প প্রস্তাব, আলোকচিত্র, অডিও, ভিডিও, অঙ্কিত চিত্র, ফিল্ম, ইলেকট্রনিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুতকৃত যেকোনো ইনস্ট্রুমেন্ট, যান্ত্রিকভাবে পাঠযোগ্য দলিলাদি এবং ভৌতিক গঠন ও বৈশিষ্ট্য নির্বিশেষে অন্য যেকোনো তথ্যবহুল বস্তু বা এর প্রতিলিপি। তবে শর্ত থাকে যে দাপ্তরিক নোট শিট বা নোট শিটের প্রতিলিপি এর অন্তর্ভুক্ত হবে না।

'তথ্য অধিকার' অর্থ কোনো কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে তথ্য প্রাপ্তির অধিকার। আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে কর্তৃপক্ষের নিকট হতে প্রত্যেক নাগরিকের তথ্য লাভের অধিকার থাকবে এবং কোনো নাগরিকের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তথ্য সরবরাহ করতে বাধ্য থাকবে। তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ যাবতীয় তথ্যের তালিকা এবং সূচি প্রস্তুত করে যাথাযথভাবে সংরক্ষণ করে রাখবে।

যে-সব তথ্য প্রকাশ বা প্রদান বাধ্যতামূলক নয়

তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী বাংলাদেশের নাগরিকদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে তথ্য জানার অধিকার থাকলেও কিছু কিছু তথ্য প্রকাশ বা প্রদান বাধ্যতামূলক নয়। যেমন- ১। বাংলাদেশের নিরাপত্তা, অখণ্ডতাও সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি হতে পারে, ২। পররাষ্ট্রনীতির কোনো বিষয়, যার দ্বারা বিদেশি রাষ্ট্রের অথবা আন্তর্জাতিক কোনো সংস্থা বা আঞ্চলিক কোনো জোট বা সংগঠনের সাথে বিদ্যমান সম্পর্ক উন্নয়ন হতে পারে, ৩। কোনো বিদেশি সরকারের নিকট হতে প্রাপ্ত কোনো গোপনীয় তথ্য, ৪। কোনো তৃতীয় পক্ষের বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের অধিকার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, ৫। কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা সংস্থাকে লাভবান বা ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে, ৬। প্রচলিত আইনের প্রয়োগ বাধাগ্রস্ত হতে পারে বা অপরাধ বৃদ্ধি পেতে পারে, ৭। জনগণের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে বা বিচারাধীন মামলার সুষ্ঠু বিচারকার্য ব্যাহত হতে পারে, ৮। কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা ক্ষুণ্ন হতে পারে, ৯। কোনো ব্যক্তির জীবন বা শারীরিক নিরাপত্তা বিপদাপন্ন হতে পারে, ১০। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহায়তার জন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক গোপনে প্রদত্ত কোনো তথ্য, ১১। আদালতে বিচারাধীন কোনো বিষয় এবং যা প্রকাশে আদালত বা ট্রাইব্যুনালের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে অথবা যা প্রকাশ আদালত অবমাননার শামিল, ১২। তদন্তাধীন কোনো বিষয় যা প্রকাশে তদন্তকাজের বিঘ্ন ঘটতে পারে, ১৩। কোনো অপরাধের তদন্তপ্রক্রিয়া এবং যা অপরাধীর গ্রেফতার ও শাস্তিকে প্রভাবিত করতে পারে, ১৪। আইন অনুসারে কেবল একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা রয়েছে, ১৫। কৌশলগত ও বাণিজ্যিক কারণে গোপন রাখা বাঞ্ছনীয় এরূপ কারিগরি বা বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ ফলাফল, ১৬। কোনো ক্রয় কার্যক্রম সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বে বা উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ক্রয় বা এর কার্যক্রম সংক্রান্ত, ১৭। জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিকারহানির কারণ হতে পারে, ১৮। কোনো ব্যক্তির আইন দ্বারা সংরক্ষিত গোপনীয় তথ্য, ১৯। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বা পরীক্ষায় প্রদত্ত নম্বর সম্পর্কিত আগাম তথ্য ইত্যাদি।

তথ্য প্রাপ্তির প্রক্রিয়া

কোনো ব্যক্তি এই আইনের অধীন তথ্য প্রাপ্তির জন্য সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট লিখিতভাবে বা ই-মেইলে অনুরোধ করতে পারবেন। উল্লিখিত অনুরোধে যেসব বিষয় উল্লেখ থাকতে হবে, সেগুলো হলো- ১। অনুরোধকারীর নাম, ঠিকানা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ফ্যাক্স নম্বর এবং ই-মেইল ঠিকানা, ২। যে তথ্যের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে তার নির্ভুল এবং স্পষ্ট বর্ণনা, ৩। অনুরোধকৃত তথ্যের অবস্থান নির্ণয়ের সুবিধার্থে অন্যান্য প্রয়োজনীয় প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলি, ৪। কোন পদ্ধতিতে তথ্য পেতে আগ্রহী তার বর্ণনা অর্থাৎ পরিদর্শন করা, অনুলিপি নেওয়া, নোট নেওয়া বা অন্য কোনো অনুমোদিত পদ্ধতি।

তথ্য প্রদান পদ্ধতি

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অনুরোধ প্রাপ্তির তারিখ থেকে অনধিক ২০ (বিশ) কার্যদিবসের মধ্যে অনুরোধকৃত তথ্য সরবরাহ করবেন। অনুরোধকৃত তথ্যের সাথে একাধিক তথ্য প্রদান ইউনিট বা কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্টতা থাকলে অনধিক ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে উক্ত অনুরোধকৃত তথ্য সরবরাহ করতে হবে। দায়িত্বপ্রাপ্ত

কর্মকর্তা কোনো কারণে তথ্য প্রদানে অপারগ হলে অপারগতার কারণ উল্লেখ করে আবেদন প্রাপ্তির ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে তিনি অনুরোধকারীকে অবহিত করবেন।

দলীয় কাজ : তথ্য অধিকার আইনের গুরুত্ব বর্ণনা কর।

নাগরিকের কর্তব্য

রাষ্ট্রের নিকট নাগরিকের যেমন অধিকার রয়েছে, অনুরূপ রাষ্ট্রের প্রতিও নাগরিকের কর্তব্য রয়েছে। কর্তব্য পালন ব্যতীত শুধু অধিকার ভোগ করা প্রত্যাশিত নয়। বিভিন্ন অধিকার প্রদানের মাধ্যমে রাষ্ট্র নাগরিকদের নিজের প্রতি অনুগত ও দায়িত্বশীল করে তোলে। রাষ্ট্র প্রদত্ত অধিকারের মাধ্যমে নাগরিক জীবন বিকশিত হয়। এর বিনিময়ে রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত থাকা, সততার সাথে ভোটাধিকার প্রয়োগ করা, নিয়মিত কর প্রদান করা, আইন মান্য করা এবং রাষ্ট্রপ্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন নাগরিকদের কর্তব্য।

কর্তব্যের শ্রেণিবিভাগ

অধিকার ভোগ করতে গিয়ে নাগরিকরা যেসব দায়িত্ব পালন করে, তাকে কর্তব্য বলে। নাগরিকের কর্তব্যকে দুভাগে ভাগ করা যায়। যথা- ক। নৈতিক কর্তব্য ও খ। আইনগত কর্তব্য।

ক. **নৈতিক কর্তব্য :** নৈতিক কর্তব্য মানুষের বিবেক এবং সামাজিক নৈতিকতা বা ন্যায়বোধ থেকে আসে। যেমন- নিজে শিক্ষিত হওয়া এবং সন্তানদের শিক্ষিত করা, সততার সাথে ভোট দান, রাষ্ট্রের সেবা করা এবং বিশ্বমানবতার সাহায্যে এগিয়ে আসা। এসব কর্তব্য নাগরিকদের বিবেক এবং সামাজিক নৈতিকতা বা ন্যায়বোধ থেকে সৃষ্টি হওয়ায় এগুলোকে নৈতিক কর্তব্য বলে।

খ. **আইনগত কর্তব্য :** রাষ্ট্রের আইন দ্বারা আরোপিত কর্তব্যকে আইনগত কর্তব্য বলে। রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য, আইন মান্য ও কর প্রদান করা নাগরিকের আইনগত কর্তব্য। এসব কর্তব্য রাষ্ট্রের আইন দ্বারা স্বীকৃত। নাগরিকদের আইনগত কর্তব্য অবশ্যই পালন করতে হয়। এ কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হলে শাস্তি পেতে হয়। আইনগত কর্তব্য রাষ্ট্র ও নাগরিকের কল্যাণের জন্য অপরিহার্য। নিম্নে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

১. **রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য :** দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা, সংবিধান, রাষ্ট্রীয় মূলনীতির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ প্রদর্শন ইত্যাদির মাধ্যমে রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ পায়। অন্যভাবে বলা যায়, রাষ্ট্রের অস্তিত্ব, সংহতি ও সমৃদ্ধি লাভের জন্য প্রয়োজনবোধে নিজের জীবন উৎসর্গ করার অর্থ হচ্ছে রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন।

২. **আইন মান্য করা :** আমাদের জীবন, সম্পত্তি ও স্বাধীনতার রক্ষাকবচ হচ্ছে আইন। আইন সবার জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। আইনের অবর্তমানে সমাজ ও জীবন হয়ে উঠে অরাজকতাপূর্ণ। আইনবিহীন সমাজ, রাষ্ট্র ও নাগরিক জীবন কিছুই কল্পনা করা যায় না। নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন করে। সুতরাং নাগরিকদের আইন মান্য করা কর্তব্য।

৩. **কর প্রদান করা :** রাষ্ট্র পরিচালনা করতে সরকারের প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। এ জন্য সরকার নাগরিকদের উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর আরোপ করে। কাজেই নিয়মিত ও যথাযথভাবে কর প্রদান করা প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য।

> **কাজ :** আইনগত ও নৈতিক কর্তব্যের পার্থক্য নির্ণয় কর।

অধিকার ও কর্তব্যের সম্পর্ক

অধিকার ও কর্তব্য শব্দ দুটি ভিন্ন হলেও এদের পারস্পরিক সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। নিম্নে অধিকার ও কর্তব্যের সম্পর্ক বর্ণিত হলো-

প্রথমত, অধিকার ভোগ করলে কর্তব্য পালন করতে হয়। যেমন- ভোটদান নাগরিকের অধিকার, ভোটাধিকার প্রয়োগ নাগরিকের কর্তব্য। একটি ভোগ করলে অন্যটি পালন করতে হয়। সুতরাং বলা যায়, অধিকার ভোগের মধ্যে কর্তব্য নিহিত থাকে।

দ্বিতীয়ত, একজনের অধিকার বলতে অন্যজনের কর্তব্য নির্দেশ করে। যেমন- আমার পথ চলার অধিকার আছে- এর অর্থ আমি পথ চলব এবং অন্যজনকেও পথ চলতে দেব। আবার, আমি যখন পথ চলব অন্যজনও আমার পথ চলার সুযোগ করে দিবে। কাজেই অধিকার ও কর্তব্যের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়।

তৃতীয়ত, আমরা রাষ্ট্রপ্রদত্ত সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার ভোগ করি। তার বিনিময়ে আমাদের কর্তব্য পালন করতে হয়। যেমন- রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত থাকা, আইন মান্য করা, কর প্রদান করা ইত্যাদি কর্তব্য পালনের মাধ্যমেই আমরা রাষ্ট্রপ্রদত্ত অধিকার ভোগ করি।

চতুর্থত, সমাজের সদস্য হিসেবে আমরা শিক্ষালাভের অধিকার ভোগ করি এবং সমাজের কল্যাণে আমাদের অর্জিত শিক্ষাকে প্রয়োগ করে সমাজের উন্নয়ন করি। শিক্ষালাভ আমাদের অধিকার, অর্জিত শিক্ষা প্রয়োগ করা কর্তব্য। সুতরাং বলা যায়, অধিকার ও কর্তব্য সমাজবোধ থেকে উৎপত্তি লাভ করে।

মূলত অধিকার ও কর্তব্যের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। একটিকে বাদ দিয়ে অপরটি ভোগ করা সম্ভব নয়। তাই বলা যায়, অধিকার কর্তব্যের মধ্যেই নিহিত।

> **কাজঃ** কর্তব্য পালন ব্যতীত অধিকার ভোগ করা যায় না– এ বিষয়ে শ্রেণিকক্ষে বিতর্কের আয়োজন কর।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। কোন অধিকারটি নাগরিকের সামাজিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত?

ক) সম্পত্তি ভোগের | খ) ভোটাধিকারের
গ) মজুরি লাভের | ঘ) নির্বাচিত হওয়ার

২। সমাজভেদে কোন অধিকারটির ভিন্নতা দেখা যায়?

ক) সামাজিক | খ) রাজনৈতিক
গ) অর্থনৈতিক | ঘ) নৈতিক

৩। অধিকার ভোগ করতে হলে প্রয়োজন-

i. সঠিকভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ
ii. সরকারি কাজে সহযোগিতা করা
iii. অন্যকে পথ চলতে সাহায্য করা

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক) i ও ii | খ) ii ও iii
গ) i ও iii | ঘ) i, ii ও iii

অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

জনাব হাফিজের মানিকগঞ্জে একটি দিয়াশলাই কারখানা আছে। তিনি তাঁর কারখানার আয়ের উপর প্রতি বছর সরকার নির্ধারিত কর পরিশোধ করেন।

৪। জনাব হাফিজের দায়িত্বটিকে কী বলা যায়?

ক) নৈতিক অধিকার | খ) আইনগত অধিকার
গ) নৈতিক কর্তব্য | ঘ) আইনগত কর্তব্য

৫। জনাব হাফিজের উক্ত দায়িত্বটির সাথে নিচের কোনটি অধিক সম্পর্কযুক্ত?

ক) রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি | খ) রাষ্ট্রের স্বাধীনতা রক্ষা
গ) নাগরিকের সামাজিক অধিকার রক্ষা | ঘ) নাগরিকের রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। 'ক' ইউনিয়নে প্রায় ৮০% লোক শিক্ষিত। উক্ত ইউনিয়নের নির্বাচনে নাগরিকগণ 'X' ও 'Y' ব্যক্তির মধ্যে 'X' ব্যক্তিকে সৎ ও যোগ্য বলে চেয়ারম্যান নির্বাচিত করে। চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার পর 'X' ব্যক্তির এলাকার একটি বিদ্যালয়ে একজন শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে তাঁর ভাইয়ের ছেলে প্রার্থী হলেও যোগ্য প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দিয়ে তিনি নিয়োগ প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করেন।

ক. প্রায় কত বছর পূর্বে প্রাচীন গ্রিসে নাগরিক ধারণার উদ্ভব হয়?

খ. দ্বৈত নাগরিকতা কী ব্যাখ্যা কর।

গ. 'ক' ইউনিয়নের নাগরিকদের মধ্যে কোন ধরনের কর্তব্যপরায়ণতা লক্ষ করা যায়-ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'X' ব্যক্তি সুনাগরিক–সত্যতা যাচাই কর।

২। পিযুশ চক্রবর্তী কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে কানাডা চলে যান। তিনি কানাডার ভাষা শিখে সরকারি চাকরিতে যোগদান করে সততার পরিচয় দেন। তার আবেদনের প্রেক্ষিতে কানাডার সরকার তাকে নাগরিকত্ব প্রদান করে। বাংলাদেশ থেকে কানাডায় বিমানে যাওয়ার পথে কানাডার আকাশ সীমার মধ্যে তাঁর স্ত্রীর রাহুল নামে একটি পুত্র সন্তানের জন্ম হয়।

ক. বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ কর্তৃক গৃহীত তথ্য অধিকার আইনটি কত তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করে?

খ. নাগরিকের অধিকার বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর।

গ. রাহুল কোন দেশের নাগরিক হবে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. পিযুশ চক্রবর্তী কী শুধু কানাডারই নাগরিক? উত্তরের পক্ষে যুক্তি দেখাও।

তৃতীয় অধ্যায়
আইন, স্বাধীনতা ও সাম্য

রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিক যাতে সুখে-শান্তিতে স্বাধীনভাবে বসবাস করতে পারে, রাষ্ট্র সে জন্য আইন প্রণয়ন করে। আইন ছাড়া সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব। আইনের শাসনের মূলকথা হচ্ছে, আইনের দৃষ্টিতে সকলে সমান। রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে আমাদের সকলের আইনের বৈশিষ্ট্য, প্রকারভেদ ও উৎস, স্বাধীনতার স্বরূপ, প্রকারভেদ, সংরক্ষণের উপায়, সাম্যের ধারণা, আইন, স্বাধীনতা ও সাম্যের সম্পর্ক এবং নাগরিক জীবনে আইনের শাসনের গুরুত্ব ইত্যাদি জানা একান্ত আবশ্যক।

এ অধ্যায় পড়া শেষে আমরা-

- আইন, স্বাধীনতা ও সাম্যের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- আইনের উৎস বর্ণনা করতে পারব।
- আইন, স্বাধীনতা ও সাম্যের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে পারব।
- আইনের শাসনের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারব।
- আইনের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করব এবং আইন মেনে চলব।

আইন

আইন বলতে সমাজ স্বীকৃত এবং রাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদিত নিয়ম-কানুনকে বোঝায়, যা মানুষের বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। আইন মানুষের মঙ্গলের জন্য প্রণয়ন করা হয়। আইনের দ্বারা ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির, ব্যক্তির সাথে রাষ্ট্রের এবং রাষ্ট্রের সাথে রাষ্ট্রের সম্পর্ক নির্ধারণ করা হয়। রাষ্ট্র বা সার্বভৌম কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করা হয়। আইন ভঙ্গ করলে শাস্তির বিধান আছে। আইনের কতগুলো মৌলিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। নিচে তা আলোচনা করা হলো।

১. **বিধিবদ্ধ নিয়মাবলি :** আইন কতগুলো প্রথা, রীতি-নীতি এবং নিয়মকানুনের সমষ্টি।

২. **বাহ্যিক আচরণের সাথে যুক্ত :** আইন মানুষের বাহ্যিক আচরণ ও কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করে। যেমন- আইনবিরোধী কোনো কাজের জন্য শাস্তি পেতে হয়। শাস্তির ভয়ে মানুষ অপরাধ থেকে বিরত থাকে।

৩. **রাষ্ট্রীয় অনুমোদন ও স্বীকৃতি :** সমাজের যেসব নিয়ম রাষ্ট্র অনুমোদন করে, সেগুলো আইনে পরিণত হয়। অন্য কথায়, আইনের পিছনে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব থাকে। রাষ্ট্রীয় অনুমোদন ও স্বীকৃতি ব্যতিরেকে কোনো বিধিবিধান আইনে পরিণত হয় না।

৪. **ব্যক্তিস্বাধীনতার রক্ষক :** আইন ব্যক্তিস্বাধীনতার রক্ষক হিসেবে কাজ করে। এজন্য আইনকে ব্যক্তিস্বাধীনতার ভিত্তি বলা হয়।

৫. **সর্বজনীন :** আইন সর্বজনীন। সমাজের সকল ব্যক্তি আইনের দৃষ্টিতে সমান। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, নারী-পুরুষ, ধনী, দরিদ্র সবার জন্য আইন সমানভাবে প্রযোজ্য।

দলীয় কাজ : জনগণের কেন আইন মেনে চলা উচিত ব্যাখ্যা কর।

আইনের প্রকারভেদ

সাধারণত আইনকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন- ১। সরকারি আইন, ২। বেসরকারি আইন ও ৩। আন্তর্জাতিক আইন।

১. **সরকারি আইন :** ব্যক্তির সাথে রাষ্ট্রের সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য যেসব আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করা হয়, তাকে সরকারি আইন বলে। সরকারি আইনকে আবার কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-

ক. **ফৌজদারি আইন ও দণ্ডবিধি :** রাষ্ট্রের বিচার বিভাগের কাজ পরিচালনার জন্য এ ধরনের আইন প্রণয়ন করা হয়। কোনো কারণে ব্যক্তির অধিকার ভঙ্গ হলে এ আইনের সাহায্যে তার অধিকার রক্ষার ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

খ. **প্রশাসনিক আইন :** রাষ্ট্রের শাসন বিভাগ এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণের জন্য এ ধরনের আইন প্রণয়ন করা হয়। এ আইনের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রশাসনিক কাজ পরিচালিত হয়।

গ. **সাংবিধানিক আইন :** এ ধরনের আইন রাষ্ট্রের সংবিধানে উল্লেখ করা থাকে। সাংবিধানিক আইনের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালিত হয়।

২. **বেসরকারি আইন :** ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির সম্পর্ক রক্ষার জন্য যে আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করা হয়, তাকে বেসরকারি আইন বলে। যেমন- চুক্তি ও দলিল-সংক্রান্ত আইন। এ ধরনের আইন সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

৩. **আন্তর্জাতিক আইন :** এক রাষ্ট্রের সাথে অন্য রাষ্ট্রের সম্পর্ক রক্ষার জন্য যে আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করা হয়, তাকে আন্তর্জাতিক আইন বলে। বিভিন্ন রাষ্ট্র পরস্পরের সাথে কেমন আচরণ করবে, এক রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের নাগরিকদের সাথে কেমন ব্যবহার করবে, কীভাবে আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধান করা হবে তা আন্তর্জাতিক আইনের মাধ্যমে নির্ধারণ করা হয়।

আইনের উৎস

আইনের উৎপত্তি বিভিন্ন উৎস থেকে হতে পারে। আইনের উৎসগুলো নিম্নে বর্ণিত হলো।

১. **প্রথা :** দীর্ঘকাল যাবৎ কোনো নিয়ম সমাজে চলতে থাকলে তাকে প্রথা বলে। রাষ্ট্র সৃষ্টির পূর্বে প্রথার মাধ্যমে মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রণ হতো। রাষ্ট্র সৃষ্টির পর যেসব প্রথা রাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদন লাভ করে, সেগুলো আইনে পরিণত হয়। যুক্তরাজ্যের অনেক আইন প্রথার উপর ভিত্তি করে সৃষ্টি হয়েছে।

২. ধর্ম : ধর্মীয় অনুশাসন ও ধর্মগ্রন্থ আইনের অন্যতম উৎস। সকল ধর্মের কিছু অনুশাসন রয়েছে, যা ঐ ধর্মের অনুসারীরা মেনে চলে। এসব অনুশাসন সমাজ জীবনকে সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত করতে সহায়তা করে। ফলে এসব ধর্মীয় অনুশাসনের অনেক কিছুই পরবর্তীকালে রাষ্ট্রের স্বীকৃতি লাভের মাধ্যমে আইনে পরিণত হয়। যেমন- মুসলিম আইন, হিন্দু আইন প্রভৃতি। আমাদের দেশে পারিবারিক ও সম্পত্তি আইনের অনেকগুলো উপরে উল্লেখিত দুটি ধর্ম থেকে এসেছে।

৩. **আইনবিদদের গ্রন্থ :** আমরা যখন গল্প, উপন্যাস কিংবা খবরের কাগজ পড়ি, কোনো শব্দের অর্থ বুঝতে সমস্যা হলে অভিধান ও বিশ্বকোষের সাহায্য নিই। ঠিক তেমনি, বিচারকগণ কোনো মামলার বিচারকার্য সম্পাদন করতে গিয়ে আইন সংক্রান্ত কোনো সমস্যায় পড়লে তা সমাধানের জন্য আইন-বিশারদদের বিজ্ঞানসম্মত গ্রন্থের সাহায্য নিয়ে এসব আইন ব্যাখ্যা করেন, যা পরবর্তীকালে আইনে পরিণত হয়। যেমন- অধ্যাপক ডাইসির 'ল অব দ্যা কনস্টিটিউশন' এবং ব্লাকস্টোনের 'কমেনটরিজ অন দ্যা লজ অব ইংল্যান্ড'।

৪. **বিচারকের রায় :** আদালতে উত্থাপিত মামলার বিচার করার জন্য প্রচলিত আইন অস্পষ্ট হলে বিচারকগণ তাদের প্রজ্ঞা ও বিচারবুদ্ধির উপর ভিত্তি করে ঐ আইনের ব্যাখ্যা দেন এবং উক্ত মামলার রায় দেন। পরবর্তীকালে বিচারকগণ সেসব রায় অনুসরণ করে বিচার করেন। এভাবে বিচারকের রায় পরবর্তীকালে আইনে পরিণত হয়। সুতরাং বলা যায়, বিচারকের রায় আইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস।

৫. **ন্যায়বোধ :** আদালতে এমন অনেক মামলা উত্থাপিত হয়, যা সমাধানের জন্য অনেক সময় কোনো আইন বিদ্যমান থাকে না। সে অবস্থায় বিচারকগণ তাদের ন্যায়বোধ বা বিবেক দ্বারা উক্ত মামলার বিচারকাজ সম্পাদন করেন এবং পরবর্তী সময়ে তা আইনে পরিণত হয়।

৬. **আইনসভা :** আধুনিককালে আইনের প্রধান উৎস আইনসভা। জনমতের সাথে সঙ্গতি রেখে বিভিন্ন দেশের আইনসভা নতুন আইন প্রণয়ন করে এবং পুরাতন আইন সংশোধন করে যুগোপযোগী করে তোলে।

একক কাজ : আইনের উৎসের চার্ট তৈরি কর।

নাগরিক জীবনে আইনের শাসন

আইনের শাসনের অর্থ হচ্ছে - কেউ আইনের ঊর্ধ্বে নয়, সবাই আইনের অধীন। অন্যকথায় আইনের চোখে সবাই সমান। আইনের দৃষ্টিতে সকল নাগরিকের সমান অধিকার প্রাপ্তির সুযোগকে আইনের শাসন বলে। সবার উপরে আইন- এর অর্থ আইনের প্রাধান্য। আইনের দৃষ্টিতে সকলে সমান-এর অর্থ, জাতি-ধর্ম-বর্ণ -লিঙ্গ-পেশা নির্বিশেষে আইনের সমান আশ্রয় লাভ করা। এর ফলে ধনী-দরিদ্র, সবল-দুর্বল সকলে সমান অধিকার লাভ করে। আইনের শাসনের প্রাধান্য থাকলে সরকার ক্ষমতার অপব্যবহার থেকে বিরত থাকবে এবং জনগণ আইনের বিধান মেনে চলবে।

আইনের শাসনের গুরুত্ব অপরিসীম। আইন না থাকলে সমাজে অনাচার অরাজকতা সৃষ্টি হয়। আইনের শাসন অনুপস্থিত থাকলে নাগরিক স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, সামাজিক মূল্যবোধ, সাম্য কিছুই থাকে না। সাম্য, স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আইনের শাসন অত্যাবশ্যক।

আইনের শাসনের দ্বারা শাসক ও শাসিতের সুসম্পর্ক সৃষ্টি হয়। সরকার স্থায়িত্ব লাভ করে এবং রাষ্ট্রে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। এর অভাবে অবিশ্বাস, আন্দোলন ও বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠে। আর বিশৃঙ্খলা, অশান্তি ও হানাহানি সমাজের শক্ত ভিতকে দুর্বল করে তুলে। সমাজে ধনী-দরিদ্র, সবল-দুর্বলের ভেদাভেদ প্রকট আকার ধারণ করে।

সুতরাং সামাজিক সাম্য, নাগরিক অধিকার, গণতান্ত্রিক সমাজ ও স্থিতিশীল রাষ্ট্রব্যবস্থার জন্য আইনের শাসন অপরিহার্য। আইনের শাসন একটি সভ্য সমাজের মানদণ্ড।

দলীয় কাজ : নাগরিক জীবনে আইনের শাসন না থাকলে যেসব সমস্যা হয়, তার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সমস্যা তুলে ধর।

স্বাধীনতা

সাধারণ অর্থে স্বাধীনতা বলতে নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী যেকোনো কাজ করাকে বোঝায়। কিন্তু প্রকৃত অর্থে স্বাধীনতা বলতে এ ধরনের অবাধ স্বাধীনতাকে বোঝায় না। কারণ, সীমাহীন স্বাধীনতা সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। উদাহরণস্বরূপ, কাউকে ইচ্ছামত সবকিছু করার স্বাধীনতা দিলে সমাজে অন্যদের ক্ষতি হতে পারে, যা এক অশান্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করবে। তাই পৌরনীতিতে স্বাধীনতা ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। অন্যের কাজে হস্তক্ষেপ বা বাধা সৃষ্টি না করে নিজের ইচ্ছানুযায়ী নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে কাজ করাই হলো স্বাধীনতা। অর্থাৎ স্বাধীনতা হলো এমন সুযোগ-সুবিধা ও পরিবেশ, যেখানে কেউ কারও ক্ষতি না করে সকলেই নিজের অধিকার ভোগ করে। স্বাধীনতা ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়তা করে এবং অধিকার ভোগের ক্ষেত্রে বাধা অপসারণ করে।

স্বাধীনতার বিভিন্ন রূপ

স্বাধীনতা বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যেমন- ১। ব্যক্তি স্বাধীনতা, ২। সামাজিক স্বাধীনতা, ৩। রাজনৈতিক স্বাধীনতা, ৪। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও ৫। জাতীয় স্বাধীনতা।

১. **ব্যক্তি স্বাধীনতা :** ব্যক্তি স্বাধীনতা বলতে এমন স্বাধীনতাকে বোঝায়, যে স্বাধীনতা ভোগ করলে অন্যের কোনো ক্ষতি হয় না। যেমন- ধর্মচর্চা করা ও পারিবারিক গোপনীয়তা রক্ষা করা। এ ধরনের স্বাধীনতা ব্যক্তির একান্ত নিজস্ব বিষয়।

২. **সামাজিক স্বাধীনতা :** জীবন রক্ষা, সম্পত্তি ভোগ ও বৈধ পেশা গ্রহণ করা সামাজিক স্বাধীনতার অন্তর্ভুক্ত। এ ধরনের স্বাধীনতা ভোগের মাধ্যমে নাগরিক জীবন বিকশিত হয়। সমাজে বসবাসকারী মানুষের অধিকার রক্ষার জন্যই সামাজিক স্বাধীনতা প্রয়োজন। এই স্বাধীনতা এমনভাবে ভোগ করতে হয়, যেন অন্যের অনুরূপ স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন না হয়।

৩. **রাজনৈতিক স্বাধীনতা :** ভোটদান, নির্বাচিত হওয়া, বিদেশে অবস্থানকালীন নিরাপত্তা লাভ ইত্যাদি নাগরিকের রাজনৈতিক স্বাধীনতা। এসব স্বাধীনতার মাধ্যমে ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় শাসনকাজে অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক স্বাধীনতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৪. **অর্থনৈতিক স্বাধীনতা :** যোগ্যতা অনুযায়ী পেশা গ্রহণ এবং উপযুক্ত পারিশ্রমিক লাভ করাকে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বলা হয়। মূলত আর্থিক সুবিধা প্রাপ্তির জন্য নাগরিকরা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করে। এই স্বাধীনতা না থাকলে অন্যান্য স্বাধীনতা ভোগ করা যায় না। সমাজের অন্য শ্রেণির শোষণ থেকে মুক্ত থাকার জন্য অর্থনৈতিক স্বাধীনতা প্রয়োজন।

৫. **জাতীয় স্বাধীনতা :** বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র এবং অন্য রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত। বাংলাদেশের এই অবস্থানকে জাতীয় স্বাধীনতা বা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা বলে। এই স্বাধীনতার ফলে একটি রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের কর্তৃত্বমুক্ত থাকে। প্রত্যেক স্বাধীন রাষ্ট্র জাতীয় স্বাধীনতা ভোগ করে।

দলীয় কাজ : স্বাধীনতা রক্ষার উপায় ব্যাখ্যা কর।

আইন ও স্বাধীনতা

আইন ও স্বাধীনতার সম্পর্ক নিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। তাঁদের অনেকেই বলেন, আইন ও স্বাধীনতার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। আবার তাদের কেউ কেউ বলেন, আইন ও স্বাধীনতা পরস্পরবিরোধী। প্রকৃতপক্ষে আইন ও স্বাধীনতার সম্পর্ক বিরোধী নয় বরং ঘনিষ্ঠ। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

১. **আইন স্বাধীনতার রক্ষক :** আইন স্বাধীনতার রক্ষক হিসেবে কাজ করে। যেমন- আমাদের বাঁচার স্বাধীনতা রয়েছে। আইন আছে বলেই আমরা সকলে বাঁচার স্বাধীনতা ভোগ করছি। জন লক যথার্থই বলেছেন, যেখানে আইন থাকে না, সেখানে স্বাধীনতা থাকতে পারে না।

২. **আইন স্বাধীনতার অভিভাবক :** আইন স্বাধীনতার অভিভাবক হিসেবে কাজ করে। পিতা-মাতা যেমন অভিভাবক হিসেবে সন্তানদের সকল বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করে নিরাপদে রাখেন, ঠিক তেমনি আইন সর্ব প্রকার বিরোধী শক্তিকে প্রতিহত করে স্বাধীনতাকে রক্ষা করে।

৩. **আইন স্বাধীনতার শর্ত :** এক একটি আইন একেকটি স্বাধীনতা। আইনের নিয়ন্ত্রণ আছে বলে সবাই স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে। উইলোবির মতে, আইনের নিয়ন্ত্রণ আছে বিধায় স্বাধীনতা রক্ষা পায়।

৪. **আইন স্বাধীনতাকে সম্প্রসারিত করে :** আইন নাগরিকের স্বাধীনতা সম্প্রসারিত করে। সুন্দর, শান্তিময়, সুষ্ঠু জীবন যাপনের জন্য যা প্রয়োজন তা আইনের দ্বারা সৃষ্টি হয়। এসব কাজ করতে গিয়ে যদিও আইন স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রণ করে, কিন্তু বাস্তবে স্বাধীনতা তাতে সম্প্রসারিত হয়।

সুতরাং বলা যায়, আইন ও স্বাধীনতার সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। তবে সকল আইন স্বাধীনতাকে সংরক্ষণ করে না। যেমন- জার্মানির হিটলারের আইনের কথা উল্লেখ করা যায়। কারণ, তার আইন মানবতাবিরোধী ছিল। তবে যে আইন জনগণের সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত, সে আইন স্বাধীনতার রক্ষক, অভিভাবক, শর্ত ও ভিত্তি।

সাম্য

সাম্যের অর্থ সমান। অতএব শব্দগত অর্থে সাম্য বলতে সমাজে সবার সমান মর্যাদাকে বোঝায়। কিন্তু সমাজে সবাই সমান নয় এবং সবাই সমান যোগ্যতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে না। প্রকৃত অর্থে সাম্য বলতে এমন এক সামাজিক পরিবেশকে বোঝায়, যেখানে জাতি-ধর্ম-বর্ণ ইত্যাদি নির্বিশেষে যোগ্যতা অনুযায়ী সবাই সমান সুযোগ-সুবিধা লাভ করে, যেখানে কারো জন্য কোনো বিশেষ সুযোগ সুবিধা নাই এবং সে সুযোগ-সুবিধা ব্যবহার করে সকলে নিজ নিজ দক্ষতার বিকাশ ঘটাতে পারে। মূলত, সাম্য বলতে বোঝায়, প্রথমত: কোনো ব্যক্তি বা শ্রেণির জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধার অবসান, দ্বিতীয়ত: সকলের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা, তৃতীয়ত: যোগ্যতা অনুযায়ী সমান সুযোগ-সুবিধা ভোগ করা।

সাম্যের বিভিন্ন রূপ

মানুষের বিভিন্নমুখী বিকাশ সাধনের জন্য বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধা প্রয়োজন। নাগরিক জীবনে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা ভোগের জন্য সাম্যকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন- ১। সামাজিক সাম্য, ২। রাজনৈতিক সাম্য, ৩। অর্থনৈতিক সাম্য, ৪। আইনগত সাম্য, ৫। স্বাভাবিক সাম্য ও ৬। ব্যক্তিগত সাম্য।

১. **সামাজিক সাম্য :** জাতি-ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ-পেশা নির্বিশেষে সমাজের সকল সদস্যের সমানভাবে সামাজিক সুযোগ- সুবিধা ভোগ করাকে সামাজিক সাম্য বলে। এ ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি বা শ্রেণিকে কোনো বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দেওয়া যাবে না।

২. **রাজনৈতিক সাম্য :** রাষ্ট্রীয় কাজে সকলের অংশগ্রহণের সুযোগ-সুবিধা থাকাকে রাজনৈতিক সাম্য বলে। নাগরিকরা রাজনৈতিক সাম্যের কারণে মতামত প্রকাশ, নির্বাচিত হওয়া এবং ভোট দেওয়ার অধিকার ভোগ করে।

৩. **অর্থনৈতিক সাম্য :** যোগ্যতা অনুযায়ী প্রত্যেকের কাজ করার ও ন্যায্য মজুরি পাওয়ার সুযোগকে অর্থনৈতিক সাম্য বলে। বেকারত্ব থেকে মুক্তি, বৈধ পেশা গ্রহণ ইত্যাদি অর্থনৈতিক সাম্যের অন্তর্ভুক্ত।

৪. **আইনগত সাম্য :** জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের আইনের দৃষ্টিতে সমান থাকা এবং বিনা অপরাধে গ্রেফতার ও বিনা বিচারে আটক না করার ব্যবস্থাকে আইনগত সাম্য বলে।

৫. **স্বাভাবিক সাম্য :** এর অর্থ জন্মগতভাবে প্রত্যেক মানুষ স্বাধীন এবং সমান। কিন্তু বাস্তবে জন্মগতভাবে প্রত্যেক মানুষ শারীরিক ও মানসিকভাবে সমান হতে পারে না। এ জন্য বর্তমানে স্বাভাবিক সাম্যের ধারণা প্রায় অচল।

৬. **ব্যক্তিগত সাম্য :** জাতি, ধর্ম, বর্ণ, বংশ ও মর্যাদা ইত্যাদি নির্বিশেষে মানুষে মানুষে কোনো ব্যবধান না করাকে ব্যক্তিগত সাম্য বলে।

একক কাজ : শিক্ষার্থীরা কী কী সাম্য ভোগ করে, তার একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

সাম্য ও স্বাধীনতার সম্পর্ক

সাম্য ও স্বাধীনতার পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে দু'টি ধারণা রয়েছে। যথা- ১। সাম্য ও স্বাধীনতা পরস্পর সম্পূরক এবং ২। সাম্য ও স্বাধীনতা পরস্পর বিরোধী। এ ধারণা দু'টি ব্যাখ্যা করলে উভয়ের সত্যিকার সম্পর্ক সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।

১. **পরস্পর নির্ভরশীল :** সাম্য ও স্বাধীনতা পরস্পর নির্ভরশীল। সাম্য ছাড়া স্বাধীনতার কথা যেমন কল্পনা করা যায় না, ঠিক তেমনি স্বাধীনতা ছাড়া সাম্যের কথা ভাবা যায় না। সুতরাং বলা যায়, একটি রাষ্ট্র যত সাম্যভিত্তিক হবে সেখানে স্বাধীনতা তত নিশ্চিত হবে।

২. **গণতন্ত্রের ভিত্তি :** সাম্য ও স্বাধীনতা গণতন্ত্রের ভিত্তি রূপে কাজ করে। জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে যেমন সাম্যের দরকার হয়, তেমনি স্বাধীনতার প্রয়োজন হয়। সাম্য ও স্বাধীনতা একই সঙ্গে বিরাজ না করলে গণতান্ত্রিক অধিকার ভোগ করা সম্ভব হতো না। সাম্য উঁচু-নিচুর ভেদাভেদ দূর করে আর স্বাধীনতা সকলের সুযোগ-সুবিধাগুলো ভোগ করার অধিকার দান করে।

পরিশেষে বলা যায়, সাম্য ও স্বাধীনতা পরস্পর পরিপূরক ও সম্পূরক। রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া রাষ্ট্রীয় কাজে অংশগ্রহণ, চলাফেরা ও জীবনধারণের জন্য সাম্যভিত্তিক সমাজ গঠন করা সম্ভব হবে না। সমাজের সুবিধাগুলো সকলে মিলে সমানভাবে ভোগ করতে হলে স্বাধীনতার প্রয়োজন। তাই বলা হয় যে সাম্য মানেই স্বাধীনতা এবং স্বাধীনতা মানেই সাম্য।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। আইন সাধারণত কত প্রকার?

ক) ২ খ) ৩

গ) ৫ ঘ) ৬

২। আইনের মূল কথা কোনটি?

ক) আইনের চোখে সবাই সমান খ) বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে

গ) ব্যক্তি স্বাধীনতার রক্ষক ঘ) রীতিনীতির সাথে সম্পর্কযুক্ত।

৩। সরকারি আইন প্রণয়ন করার উদ্দেশ্য –

i. ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির সম্পর্ক রক্ষা করা

ii. ব্যক্তির সাথে রাষ্ট্রের সম্পর্ক রক্ষা করা

iii. বিচার বিভাগের কাজ পরিচালনা করা।

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক) i ও ii খ) ii ও iii

গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

সম্প্রতি বাংলাদেশ ‘ক’ নামক একটি আদালতের মাধ্যমে বন্ধুত্বপূর্ণ অবস্থানের ভিত্তিতে মায়ানমারের সাথে সমুদ্রসীমানা সংক্রান্ত সমস্যার মীমাংসা করে।

৪। বাংলাদেশ কোন আইনের মাধ্যমে উক্ত সমস্যার মীমাংসা করে?

ক) সরকারি খ) বেসরকারি

গ) সাংবিধানিক ঘ) আন্তর্জাতিক

৫। উক্ত আইনের সঠিক প্রয়োগের ফলে–

ক) এক রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের সাথে ভালো আচরণ করে।

খ) রাষ্ট্রের সাথে ব্যক্তির সম্পর্ক বজায় থাকে।

গ) বিভিন্ন রাষ্ট্র সঠিকভাবে প্রশাসন পরিচালনা করে।

ঘ) বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সুরক্ষিত হয়।

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। জনাব শ্যামল মিত্র একজন সংসদ সদস্য। তিনি তার এলাকার ইভটিজিং সমস্যা সমাধানের জন্য সংসদে একটি বিল উত্থাপন করলে বিলটি কণ্ঠভোটে পাশ হয়। জনাব অর্ক বড়ুয়া ঐ দেশের উচ্চ আদালতের প্রধান। তিনি একটি মামলায় অপরাধীর সাজা নির্ধারণের সময় প্রচলিত আইনের সাথে মিল না পেয়ে তার প্রজ্ঞা ও বিচার বুদ্ধির উপর ভিত্তি করে সাজা নির্ধারণ করেন।

ক. 'কমেনটরিজ অন দ্যা লজ অব ইংল্যান্ড' গ্রন্থটি কার?

খ. আন্তর্জাতিক আইন কী? ব্যাখ্যা কর।

গ. জনাব শ্যামল মিত্র যেখানে বিল উত্থাপন করে তা আইনের কোন ধরনের উৎস? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. জনাব অর্ক বড়ুয়ার বিচারিক সিদ্ধান্ত প্রদান পদ্ধতিটি আইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস–বিশ্লেষণ কর।

চতুর্থ অধ্যায়
রাষ্ট্র ও সরকারব্যবস্থা

রাষ্ট্র একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। আর সরকার রাষ্ট্র গঠনের অন্যতম প্রধান উপাদান। সরকার মূলত রাষ্ট্রের মুখপাত্র হিসেবে দেশ পরিচালনা করে। রাষ্ট্র ও সরকার বিভিন্ন রকম হতে পারে। রাষ্ট্রের সামাজিক ও রাজনৈতিক চাহিদার বিভিন্নতার কারণে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভিন্ন ধরনের সরকারব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। এ অধ্যায়ে আমরা বিভিন্ন ধরনের রাষ্ট্র ও সরকারপদ্ধতি সম্পর্কে জানব।

এ অধ্যায় পড়া শেষে আমরা -

- বিভিন্ন ধরনের রাষ্ট্র ও সরকারব্যবস্থা বর্ণনা করতে পারব।
- বিভিন্ন সরকার ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় নাগরিকের অবস্থান ও সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারব।
- গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রের পার্থক্য নির্ণয় করতে পারব।
- গণতান্ত্রিক আচরণ শিখব ও তা প্রয়োগ করতে উদ্বুদ্ধ হব।

রাষ্ট্র ও সরকার

'রাষ্ট্র' ও 'সরকার' এ দুটি অনেক সময় সমার্থক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু এ দুটির মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আছে। রাষ্ট্র একটি পূর্ণাঙ্গ ও স্থায়ী প্রতিষ্ঠান। এটি সার্বভৌম বা সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। আর সরকার রাষ্ট্র গঠনের চারটি উপাদানের (জনসংখ্যা, ভূখণ্ড, সরকার ও সার্বভৌমত্ব) মধ্যে একটি উপাদান মাত্র। পৃথিবীর সব রাষ্ট্র একই উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত হলেও সব রাষ্ট্র ও সরকারব্যবস্থা এক ধরনের নয়। আবার সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে যেকোনো দেশে রাষ্ট্র ও সরকারের স্বরূপ পরিবর্তিত হতে পারে।

রাষ্ট্রের ধরন

বিশ্বে বিভিন্ন ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থা লক্ষ করা যায়। নিচের ছকে রাষ্ট্রের বিভিন্ন রূপ লক্ষ করি।

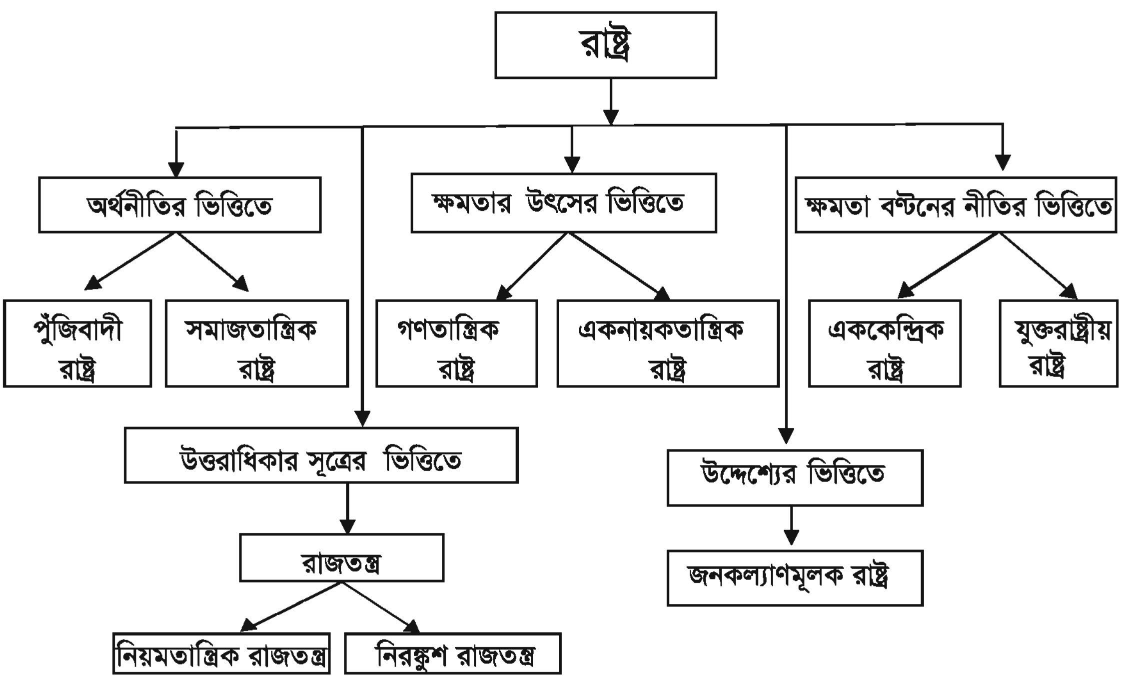

অর্থনীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্র

সম্পত্তি বা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর নিয়ন্ত্রণ থাকা না–থাকার ভিত্তিতে রাষ্ট্র দুই ধরনের হয়, যেমন- পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ।

পুঁজিবাদী রাষ্ট্র

পুঁজিবাদী রাষ্ট্র বলতে সেই রাষ্ট্রকে বোঝায়, যেখানে সম্পত্তির উপর নাগরিকদের ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকার করা হয় । এ সরকারব্যবস্থায় উৎপাদনের উপাদানসমূহ (ভূমি, শ্রম, মূলধন ও ব্যবস্থাপনা) ব্যক্তিগত মালিকানায় থাকে । এর উপর সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না। অবাধ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থা পরিচালিত হয় । এ ধরনের রাষ্ট্রে নাগরিকগণ সম্পদের মালিকানা ও ভোগের ক্ষেত্রে স্বাধীন । বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্রই পুঁজিবাদী ।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলতে সেই ধরনের রাষ্ট্রকে বোঝায়, যা ব্যক্তিমালিকানা স্বীকার করে না । এতে উৎপাদনের উপকরণগুলো রাষ্ট্রীয় মালিকানায় থাকে । রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে উৎপাদন ও বণ্টনের ব্যবস্থা পরিচালিত হয় । এটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের বিপরীত । সমাজতন্ত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে স্বীকার করা হয় না । এ ধরনের রাষ্ট্রে একটিমাত্র দল থাকে । গণমাধ্যম রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে থাকে । বিরোধী মত প্রচারের সুযোগ থাকে না । যেমন- চীন এবং কিউবা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ।

জোড়ায় কাজ : পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পার্থক্যের তুলনামূলক ছক তৈরি কর ।

ক্ষমতার উৎসের ভিত্তিতে রাষ্ট্র

ক্ষমতার মালিক কে? জনগণ, না একক কোনো ব্যক্তি না কোনো গোষ্ঠী? ক্ষমতার উৎসের ভিত্তিতে রাষ্ট্রকে আবার দুভাগে ভাগ করা যায় । যথা – গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্র ।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র

যে শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রের শাসনক্ষমতা রাষ্ট্রের সকল সদস্য তথা জনগণের হাতে ন্যস্ত থাকে, তাকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে । এটি এমন একটি শাসনব্যবস্থা যেখানে শাসনকার্যে জনগণের সকলে অংশগ্রহণ করতে পারে এবং সকলে মিলে সরকার গঠন করে । এটি জনগণের অংশগ্রহণে, জনগণের দ্বারা এবং জনগণের কল্যাণার্থে পরিচালিত একটি শাসনব্যবস্থা । গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণের মতপ্রকাশ ও সরকারের সমালোচনা করার সুযোগ থাকে । এতে নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় অর্থাৎ নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তিত হয় । একাধিক রাজনৈতিক দল থাকে, সকলের স্বার্থরক্ষার সুযোগ থাকে এবং নাগরিকের অধিকার ও আইনের শাসনের স্বীকৃতি দেওয়া হয়। বাংলাদেশ, ভারত, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ইত্যাদিসহ পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা রয়েছে ।

জোড়ায় কাজ : গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যগুলোর চার্ট/তালিকা তৈরি করে শ্রেণিকক্ষে টানিয়ে দাও ।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার গুণ

গণতন্ত্রের অনেক ভালো দিক রয়েছে। নিচে গণতন্ত্রের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গুণ আলোচনা করা হলো।

১. **ব্যক্তিস্বাধীনতার রক্ষাকবচ :** গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণ স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করতে পারে। সরকারের সমালোচনা করতে পারে। প্রতিনিধি নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে পারে। ফলে ব্যক্তিস্বাধীনতার বিকাশ ঘটে। নাগরিকের অধিকার রক্ষা হয়।

২. **দায়িত্বশীল শাসন :** এ ব্যবস্থায় শাসকগণ জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে জনগণের নিকট দায়ী থাকে। তারা পরবর্তী নির্বাচনে জয়ী হওয়ার জন্য জনস্বার্থমূলক কাজ করার চেষ্টা করে। ফলে দেশে দায়িত্বশীল শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

৩. **সরকারের দক্ষতা বৃদ্ধি :** গণতন্ত্রে জনগণের আস্থার উপর সরকারের স্থায়িত্ব নির্ভর করে। ফলে জনগণের আস্থা লাভের জন্য সরকার সততার সাথে দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করে। এর ফলে সরকারের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

৪. **সাম্য ও সমঅধিকারের প্রতীক :** গণতন্ত্রে সবাই সমান। এতে জাতি, ধর্ম, বর্ণ ইত্যাদি নির্বিশেষে সবাই সমান সুযোগ বা অধিকার ভোগ করে এবং সবাই সমানভাবে রাষ্ট্রের কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে।

৫. **নাগরিকের মর্যাদা বৃদ্ধি :** গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই রাষ্ট্র পরিচালনা করে। নির্বাচনের মাধ্যমে সব নাগরিকের রাষ্ট্রের কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ থাকায় তারা নিজেদের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারে। এতে তাদের মধ্যে দেশাত্মবোধ সৃষ্টি হয় এবং ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

৬. **যুক্তি ও সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত :** গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা জনগণের সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত। কাজেই গণতন্ত্রে শক্তি প্রয়োগ বা জোর করে কিছু করার সুযোগ নেই বরং জনগণের ইচ্ছা এবং যুক্তি প্রাধান্য পায়।

৭. **রাজনৈতিক শিক্ষা লাভ :** গণতন্ত্রে রাষ্ট্রের শাসনকার্যে অংশগ্রহণের সুযোগ থাকায় নাগরিকগণ জটিল রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে চিন্তা করার সুযোগ পায়। নির্বাচনে অংশগ্রহণ ও রাজনৈতিক দলগুলোর বক্তব্য শুনে তাদের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পায়।

৮. **বিপ্লবের সম্ভাবনা কম :** গণতন্ত্র নমনীয় শাসনব্যবস্থা। জনগণ ইচ্ছে করলে শান্তিপূর্ণ উপায়ে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সরকার পরিবর্তন করতে পারে। ফলে এখানে বিপ্লবের প্রয়োজন হয় না।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ত্রুটি

অনেক গুণ থাকা সত্ত্বেও গণতন্ত্রের কিছু ত্রুটি আছে। নিচে এগুলো আলোচনা করা হলো।

১. **গুণ বা যোগ্যতার চেয়ে সংখ্যার উপর গুরুত্ব প্রদান :** গণতন্ত্রে নির্বাচনের মাধ্যমে জয়-পরাজয় নির্ধারণ করা হয় বলে এখানে গুণ বা যোগ্যতার চেয়ে সংখ্যার ওপর গুরুত্ব বেশি দেওয়া হয়। অর্থাৎ এতে মাথা গণনা করা হয়, মেধার বিচার করা হয় না।

২. **দলীয় শাসনব্যবস্থা :** এ ব্যবস্থায় নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনকারী দল সরকার গঠন করে। নির্বাচিত দল সব সময় নিজের দলের স্বার্থের দিকে লক্ষ রেখে শাসনকার্য পরিচালনা করে। ফলে রাষ্ট্রে গণঅসন্তোষ দেখা যায়।

৩. **ব্যয়বহুল ও অর্থের অপচয় হয় :** গণতন্ত্রে নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠন হয়। নির্বাচন পরিচালনায় প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। এছাড়া নির্বাচনের সময় প্রার্থীরা নির্বাচনি প্রচারের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। নির্বাচনে জনগণের সমর্থন আদায়ের জন্য প্রতিটি দল লিফলেট, পোস্টার, জনসভা ইত্যাদি করে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। এতে সময়, সম্পদ ও অর্থের অপচয় হয়।

৪. **ঘন ঘন নীতির পরিবর্তন :** গণতন্ত্রে ঘন ঘন সরকার পরিবর্তন হয়। গণতন্ত্রে নির্বাচিত দল নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সরকার গঠন করে এবং প্রতিটি দল তাদের নীতির ভিত্তিতে কর্মসূচি প্রণয়ন করে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সরকারের কর্মসূচি পুরোপুরি বাস্তবায়িত হওয়ার আগেই তাদের মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে সরকারের নীতিও পরিবর্তন হয়। ফলে কখনো কখনো রাষ্ট্রের উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়।

গণতন্ত্র সফল করার উপায় ও গণতান্ত্রিক আচরণ

গণতন্ত্র বর্তমান যুগে প্রচলিত শাসন ব্যবস্থাগুলোর মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট এবং সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য শাসনব্যবস্থা। কিন্তু এর চর্চা বা বাস্তবায়নের পথে অনেক প্রতিবন্ধকতা আছে। এসব প্রতিবন্ধকতা দূর করে গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য প্রয়োজন শিক্ষিত ও সচেতন জনগোষ্ঠী, অর্থনৈতিক সাম্য ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজব্যবস্থা, দক্ষ প্রশাসন এবং উপযুক্ত নেতৃত্ব। এ ছাড়া আরও প্রয়োজন পরমতসহিষ্ণুতা, আইনের শাসন, মুক্ত ও স্বাধীন প্রচারযন্ত্র, একাধিক রাজনৈতিক দল ও রাজনৈতিক সহনশীলতা। তবে সবচেয়ে বেশি যেটি প্রয়োজন তা হলো, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিকদের গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন হওয়া। তাদেরকে ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক আচরণ করতে হবে। এজন্য যা করা প্রয়োজন তা হলো-

- নাগরিকদের পরমতসহিষ্ণু হতে হবে। সবাইকে মত প্রকাশের সুযোগ দিতে হবে। অন্যের মতকে শ্রদ্ধা করতে হবে এবং অধিকাংশের মতামতকে সবার মতামত হিসেবে মেনে নেওয়ার মানসিকতা থাকতে হবে। নিজের বা নিজ দলীয় মতামত জোর করে অন্যদের উপর চাপিয়ে দেওয়া যাবে না।
- ব্যক্তিগত ও দলীয় স্বার্থপরতা পরিহার করতে হবে। এটি সকল নাগরিক ও রাজনৈতিক দলের জন্য প্রযোজ্য। কেবল বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা করলে হবে না। দেশের মঙ্গলকে প্রাধান্য দিয়ে কাজ করতে হবে।
- নিজের অধিকার আদায়ের পাশাপাশি অন্যের অধিকারকে সম্মান করতে হবে। নিজের অধিকার আদায় যেন অন্যের অধিকার ভঙ্গের কারণ না হয়, সে বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে।
- বিভিন্ন সম্প্রদায় এবং দলের মধ্যে সম্প্রীতি, সহযোগিতা ও সহনশীলতা বজায় রাখতে হবে।
- ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে শ্রদ্ধা করতে হবে। সেই সাথে নাগরিকদের সুনাগরিকের গুণাবলি অর্জন করতে হবে। নাগরিকদের হতে হবে বুদ্ধিমান, আত্মসংযমী ও বিবেকবান।

- গণতন্ত্রের বাহন হচ্ছে নির্বাচন। নির্বাচন যেন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয়, সেজন্য নাগরিকদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দিতে হবে। অযোগ্য লোক যেন নির্বাচিত হতে না পারে, সেজন্য নাগরিকদের সচেতনভাবে ভোট দিয়ে উপযুক্ত লোককে নির্বাচন করতে হবে। এতে গণতন্ত্র শক্তিশালী হবে।
- আইনের শাসন হলো গণতন্ত্রের প্রাণ। এজন্য সবাইকে আইন মানতে হবে। আইনের চোখে সবাই সমান। অতএব, সকলের প্রতি সমান আচরণ করতে হবে। অর্থাৎ সমান অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে।

এসব গণতান্ত্রিক আচরণ শেখা ও তা প্রয়োগের মাধ্যমে গণতন্ত্রকে সফল করার জন্য প্রতিটি নাগরিককে যত্নবান হতে হবে।

দলীয় কাজ : গণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠার জন্য শিক্ষার্থীরা কী ধরনের আচরণ করবে তার তালিকা তৈরি কর।

একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা

একনায়কতন্ত্র এক ধরনের স্বেচ্ছাচারী শাসনব্যবস্থা। এতে রাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতা জনগণের হাতে ন্যস্ত না থেকে একজন স্বেচ্ছাচারী শাসক বা দল বা শ্রেণির হাতে ন্যস্ত থাকে। এতে নেতাই দলের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তাকে বলা হয় একনায়ক বা ডিকটেটর। একনায়কতান্ত্রিক শাসককে সহায়তা করার জন্য মন্ত্রী বা উপদেষ্টা পরিষদ থাকে। কিন্তু তারা শাসকের আদেশ ও নির্দেশ মেনে চলে। একনায়কের আদেশই আইন। এ ব্যবস্থায় শাসকের কারও কাছে জবাবদিহিতা থাকে না। এতে একটিমাত্র রাজনৈতিক দল থাকে। এই দলের নেতাই সরকারপ্রধান। তার ইচ্ছা অনুযায়ী দল পরিচালিত হয় এবং তার অন্ধ অনুসারীদের নিয়ে দল গঠিত হয়।

একনায়কতন্ত্রে গণমাধ্যমগুলো (রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্র ইত্যাদি) নেতা ও তার দলের নিয়ন্ত্রণে থাকে। এগুলো নিরপেক্ষভাবে ব্যবহারের সুযোগ দেওয়া হয় না। বরং সরকারি দলের গুণকীর্তনে ব্যবহৃত হয়। এ সরকারব্যবস্থায় আইন ও বিচার বিভাগ স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে না। একনায়কের ইচ্ছা অনুযায়ী আইন প্রণয়ন ও বিচারকাজ সম্পন্ন করা হয়। এক জাতি, এক দেশ, এক নেতা একনায়কতন্ত্রের আদর্শ। এতে মনে করা হয়, সবকিছু রাষ্ট্রের জন্য, এর বাইরে বা বিরুদ্ধে কিছু নয়।

জোড়ায় কাজ : একনায়কতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলোর চার্ট/ছক/ ধারণা মানচিত্র তৈরি কর।

একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্রের দোষ

একনায়কতন্ত্র চরম স্বেচ্ছাচারী ব্যবস্থা। এর দোষগুলো নিম্নরূপ।

১. **গণতন্ত্রবিরোধী :** একনায়কতন্ত্র গণতন্ত্র বিরোধী। এটি ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে স্বীকার করে না, যা গণতন্ত্রের মূল কথা। এটি নাগরিকের মৌলিক অধিকার খর্ব করে। ফলে ব্যক্তিত্বের বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়।

২. **স্বৈরাচারী শাসন :** একনায়কতন্ত্র স্বৈরাচারী শাসন প্রতিষ্ঠা করে। কারণ একনায়ককে কারও নিকট জবাবদিহি করতে হয় না। তার কথাই আইন। এতে ব্যক্তির স্বাধীন চিন্তা ও মুক্ত বুদ্ধি চর্চার সুযোগ নেই। একনায়কতন্ত্র বস্তুত একটি স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা।

৩. **নেতৃত্ব ও রাজনৈতিক চেতনা সৃষ্টির অন্তরায় :** এ শাসনব্যবস্থা একক নেতার নেতৃত্বে চলে বলে বিকল্প নেতৃত্ব গড়ে উঠার সুযোগ থাকে না। আবার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ না থাকায় রাজনৈতিক সচেতনতাও তৈরি হয় না।

৪. **বিপ্লবের সম্ভাবনা :** এ শাসনব্যবস্থায় জনগণের অংশগ্রহণ নেই বলে সর্বদা বিপ্লবের ভয় থাকে। অভ্যন্তরীণ বিরোধিতা ও গণ-অসন্তোষের কারণে একনায়কতন্ত্র বেশি দিন টিকতে পারে না।

৫. **বিশ্বশান্তির বিরোধী :** একনায়কতন্ত্রে উগ্র জাতীয়তাবোধ ধারণ ও লালন করা হয়। ক্ষমতার লোভ একনায়কের মধ্যে যুদ্ধংদেহী মনোভাব সৃষ্টি করে। হিটলার এ ধরনের মনোভাব পোষণ করে সারা পৃথিবীতে ধ্বংস ডেকে এনেছিলেন। এ ধরনের মনোভাব আন্তর্জাতিক শান্তির পরিপন্থী।

একনায়কতান্ত্রিক ব্যবস্থা ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের বেদীমূলে উৎসর্গ করে। এখানে ব্যক্তি রাষ্ট্রের জন্য, রাষ্ট্র ব্যক্তির জন্য নয়। তাই বর্তমান বিশ্বে কোনো রাষ্ট্র একনায়ককে সমর্থন করে না।

দলীয় কাজ : গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ কর।

ক্ষমতা বণ্টনের নীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্র

রাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টনের নীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্র দুই ধরনের হয়। যথা- এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র ও যুক্তরাষ্ট্র।

এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র

এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে সংবিধানের মাধ্যমে রাষ্ট্রের সকল শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত করা হয়। ফলে কেন্দ্র থেকে দেশ পরিচালনা করা হয়। শাসনকার্যের সুবিধার জন্য দেশকে বিভিন্ন প্রদেশে বা অঞ্চলে ভাগ করে কিছু ক্ষমতা তাদের হাতে অর্পণ করা হয়। তবে প্রয়োজনবোধে কেন্দ্রীয় সরকার সে ক্ষমতা ফিরিয়ে নিতে পারে। এ ধরনের সরকারব্যবস্থায় প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক সরকারগুলো কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণে থেকে কেন্দ্রের এজেন্ট হিসেবে কাজ করে। বাংলাদেশ, যুক্তরাজ্য প্রভৃতি এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের উদাহরণ।

যুক্তরাষ্ট্র

যে রাষ্ট্রব্যবস্থায় একাধিক অঞ্চল বা প্রদেশ মিলিত হয়ে একটি রাষ্ট্র গঠন করে, তাকে যুক্তরাষ্ট্র বলে। এ ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনকার্যের সুবিধার জন্য সংবিধানের মাধ্যমে কেন্দ্র ও প্রদেশ বা অঞ্চলের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রে পাশাপাশি অবস্থিত কতগুলো ক্ষুদ্র অঞ্চল বা প্রদেশ একত্রিত হয়ে একটি বড় রাষ্ট্র গঠন করে বলে রাষ্ট্রটি শক্তিশালী হয়। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার রাষ্ট্রের বিভিন্ন এলাকার সম্পদ আহরণ করে একটি বৃহৎ অর্থনীতি গঠনপূর্বক রাষ্ট্রকে উন্নতির দিকে নিয়ে যেতে পারে। তাই বিশ্বের সকল যুক্তরাষ্ট্রই কম-বেশি উন্নত। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত একটি যুক্তরাষ্ট্র।

উত্তরাধিকার সূত্রের ভিত্তিতে রাষ্ট্র

বিশ্বের কোনো কোনো রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপ্রধানগণ উত্তরাধিকার সূত্রে রাষ্ট্রের শাসনক্ষমতা লাভ করে। এ ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থাকে বলা হয় রাজতন্ত্র। রাজতন্ত্রে রাজার ছেলে বা মেয়ে উত্তরাধিকার সূত্রে রাষ্ট্রের রাজা বা রানী হয়ে থাকে। রাজতন্ত্র দুই ধরনের, যথা- নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র ও নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র।

নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র : এ ধরনের রাষ্ট্রে রাজা বা রানী রাষ্ট্রের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। এতে শাসনব্যবস্থায় জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ নেই। বর্তমান বিশ্বে এ ধরনের রাষ্ট্রের সংখ্যা নগণ্য। সৌদি আরবে নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র বিদ্যমান রয়েছে।

নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র : এ ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থায় রাষ্ট্রের রাজা বা রানী উত্তরাধিকার সূত্রে বা নিয়মতান্ত্রিকভাবে রাষ্ট্রপ্রধান হন। কিন্তু তিনি সীমিত ক্ষমতা ভোগ করেন। রাষ্ট্রের প্রকৃত শাসন ক্ষমতা থাকে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে। যুক্তরাজ্যে (গ্রেট ব্রিটেন) নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রচলিত রয়েছে।

জোড়ায় কাজ : নিরঙ্কুশ ও নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ কর।

উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে রাষ্ট্র

কল্যাণমূলক রাষ্ট্র

যে রাষ্ট্র জনগণের দৈনন্দিন ন্যূনতম চাহিদা পূরণের জন্য কল্যাণমূলক কাজ করে, তাকে বলা হয় কল্যাণমূলক রাষ্ট্র। এ ধরনের রাষ্ট্র জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য কর্মের সুযোগ সৃষ্টি করে, বেকার ভাতা প্রদান করে, বিনা খরচে শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। কানাডা, যুক্তরাজ্য, সুইডেন, নরওয়ে ইত্যাদি কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের উদাহরণ। এ ধরনের রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য হলো-

- রাষ্ট্র সমাজের মঙ্গলের জন্য সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা জোরদার করে। খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করে। রাস্তাঘাট, এতিমখানা, সরাইখানা, খাদ্য ভর্তুকি প্রদান ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে। বেকার ভাতা, অবসরকালীন ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা ইত্যাদি প্রদান করে।
- সচ্ছলদের উপর উচ্চহারে কর ধার্য করে ও কম সচ্ছলদের উপর কম কর ধার্য করে দরিদ্র ও দুস্থদের সাহায্য ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে।
- কৃষক, শ্রমিক ও মজুরদের স্বার্থরক্ষার জন্য ন্যূনতম মজুরির ব্যবস্থা করে তাদের জীবনযাত্রার মান নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করে।
- সমবায় সমিতি গঠন ও শ্রমিক কল্যাণ সমিতি গঠন করে কৃষক, শ্রমিক ও মজুরদের স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে।

জোড়ায় কাজ : বাংলাদেশকে কল্যাণমূলক রাষ্ট্র বলা যায় কি না যুক্তিসহ ব্যাখ্যা কর।

সরকারের শ্রেণিবিভাগ

সরকারের ধারণার উৎপত্তির সময়কাল থেকে বিভিন্ন দার্শনিক সরকারকে বিভিন্নভাবে ভাগ করেছেন। আধুনিককালে সরকারের ধরন নিম্নরূপ :

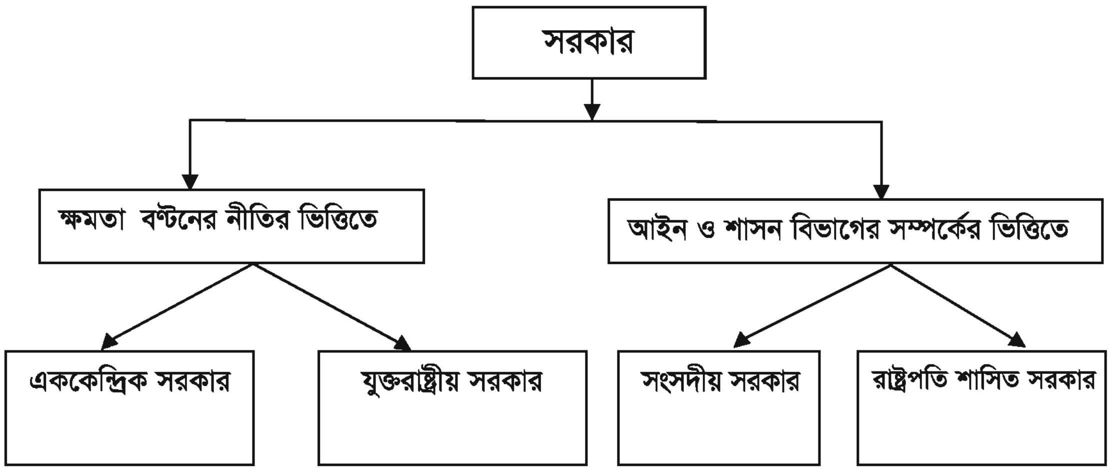

ক্ষমতা বণ্টনের নীতির ভিত্তিতে সরকারের শ্রেণিবিভাগ

কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টনের নীতির ভিত্তিতে সরকার দুই ধরনের হতে পারে। যথা - এককেন্দ্রিক সরকার ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার।

এককেন্দ্রিক সরকার

যে শাসনব্যবস্থায় সরকারের সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত থাকে এবং কেন্দ্র থেকে দেশের শাসন পরিচালিত হয়, তাকে এককেন্দ্রিক সরকার বলে। এতে কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন করা হয় না। এ সরকার ব্যবস্থায় আঞ্চলিক সরকারের কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। রাষ্ট্রে বিভিন্ন প্রদেশ বা প্রশাসনিক অঞ্চল থাকতে পারে। তবে তারা কেন্দ্রের প্রতিনিধি বা সহায়ক হিসেবে কাজ করে। বাংলাদেশ, জাপান, যুক্তরাজ্য প্রভৃতি দেশে এককেন্দ্রিক সরকার প্রচলিত আছে।

জোড়ায় কাজ : এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যগুলো দিয়ে একটি ধারণা মানচিত্র/চার্ট তৈরি কর।

এককেন্দ্রিক সরকারের গুণ

এককেন্দ্রিক সরকারের বিশেষ কতগুলো গুণ আছে। যেমন-

১. **সহজ সাংগঠনিক ব্যবস্থা :** এককেন্দ্রিক সরকারের সংগঠন সরল প্রকৃতির। এতে কেন্দ্রের হাতে সব ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে। কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টনের কোনো ঝামেলা নেই। কেন্দ্রে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলে সহজেই তা সমগ্র দেশে বাস্তবায়ন করা যায়। এ ছাড়া সারা দেশে অভিন্ন আইন, নীতি ও পরিকল্পনা বলবৎ করা হয়। ফলে সাংগঠনিক সামঞ্জস্য থাকে।

২. **জাতীয় ঐক্যের প্রতীক :** এই সরকারব্যবস্থায় রাষ্ট্রের ভিতরে বিভিন্ন প্রদেশ বা অঞ্চল থাকলেও তাদের কোনো স্বায়ত্তশাসন নেই। ফলে সারা দেশের জন্য একই প্রশাসনিক নীতি ও আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হয়,যা জাতীয় সংহতি ও অখণ্ডতা বজায় রাখতে সহায়তা করে।

৩. **মিতব্যয়িতা :** এককেন্দ্রিক সরকারে প্রশাসনিক ব্যয় কম। কারণ এতে কেবল কেন্দ্রে সরকার গঠন করা হয়। এখানে কেন্দ্রীয় সরকার সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং তা ধাপে ধাপে বাস্তবায়ন হয়। স্তরে স্তরে উর্ধ্বতন কর্মকর্তার প্রয়োজন হয় না বলে এতে খরচ কমে।

৪. **দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ :** কোনো আঞ্চলিক সরকারের সাথে পরামর্শ বা আঞ্চলিক স্বার্থ বিবেচনার দরকার হয় না বলে এককেন্দ্রিক সরকারের পক্ষে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়। সিদ্ধান্ত গ্রহণে কোনো জটিলতা তৈরি হয় না।

৫. **ছোট রাষ্ট্রের উপযোগী :** এককেন্দ্রিক সরকার ভৌগোলিক দিক দিয়ে অপেক্ষাকৃত ছোট ও অভিন্ন কৃষ্টিসম্পন্ন রাষ্ট্রের জন্য বেশি উপযোগী। যেমন- বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কা।

এককেন্দ্রিক সরকারের ত্রুটি

এককেন্দ্রিক সরকারে সুবিধা যেমন রয়েছে, তেমনি কতগুলো ত্রুটিও রয়েছে। যেমন-

১. **কাজের চাপ :** এককেন্দ্রিক সরকারে কেন্দ্রের হাতে সকল ক্ষমতা ন্যস্ত থাকায় কেন্দ্রীয় সরকারের উপর কাজের বেশি চাপ থাকে। সরকারের সব কাজ কেন্দ্রীয় সরকারকে করতে হয় বলে প্রশাসকগণ রুটিন কাজের চাপে জনহিতকর কাজের প্রতি প্রয়োজনীয় সময় দিতে পারে না।

২. **স্থানীয় নেতৃত্ব বিকাশের অনুকূল নয় :** এ ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয়ভাবে ক্ষমতার চর্চা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক পর্যায়ে জনগণের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগ থাকে না। ফলে স্থানীয় নেতৃত্ব গড়ে উঠার সুযাগ থাকে না।

৩. **স্থানীয় উন্নয়ন ও সমস্যার প্রতি অবহেলা :** এককেন্দ্রিক সরকারে সারা দেশের জন্য অভিন্ন পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কিন্তু বিভিন্ন এলাকায় ভিন্ন ভিন্ন সমস্যা থাকতে পারে, যার প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে নজর দেওয়া সম্ভব হয় না। আবার অঞ্চলগুলো দূরে থাকার কারণে কেন্দ্রীয় সরকার স্থানীয় সমস্যাগুলো ঠিকভাবে বুঝতে ও সমাধান করতে পারে না।

৪. **বড় রাষ্ট্রের জন্য অনুপযোগী :** বড় রাষ্ট্রের জন্য এককেন্দ্রিক সরকার সুবিধাজনক নয়। বড় রাষ্ট্রে এক অঞ্চলের সঙ্গে আরেক অঞ্চলের ভাষা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি ইত্যাদি ক্ষেত্রে কম-বেশি পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এই পার্থক্যগুলো একত্রিত করে সবকিছু কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে একা সামাল দেওয়া সম্ভব নয়। ফলে রাষ্ট্র পরিচালনায় সরকারকে নানামুখী সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। সরকারের প্রতি সন্দেহ ও অবিশ্বাস বাড়ে। এ কারণে অঞ্চলগুলোর বিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রবণতা দেখা দিতে পারে।

৫. **কেন্দ্রের স্বেচ্ছাচারিতা :** এককেন্দ্রিক সরকার ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়ার ফলে কেন্দ্রের স্বেচ্ছাচারিতার সম্ভাবনা থাকে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার

যুক্তরাষ্ট্র বলতে সেই ধরনের সরকারকে বোঝায়, যেখানে একাধিক অঞ্চল বা প্রদেশ মিলে একটি সরকার গঠন করে। এ ধরনের সরকার ক্ষমতা বণ্টনের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এতে সাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার কিছু অংশ প্রদেশ বা আঞ্চলিক সরকারের এবং জাতীয় বিষয়গুলো কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকে। ফলে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় উভয় সরকারই মৌলিক ক্ষমতার অধিকারী হয় এবং স্ব স্ব ক্ষেত্রে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র থেকে দেশ পরিচালনা করে। অর্থাৎ এতে দ্বৈত সরকারব্যবস্থা থাকে। ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা প্রভৃতি দেশে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার পদ্ধতি রয়েছে।

জোড়ায় কাজ : যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের বৈশিষ্ট্যের তালিকা তৈরি কর।

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের গুণ

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের বেশ কিছু গুণ আছে। যথা :

১. **জাতীয় ঐক্য ও আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যের সমন্বয় ঘটায় :** এ ধরনের সরকার আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য ও ভিন্নতা বজায় রেখে জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলে। এতে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য ও ভিন্নতাকে স্বীকৃতি দিয়ে সেগুলোকে লালন করা হয়। ফলে এ ব্যবস্থায় বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য গড়ে উঠে।

২. **কেন্দ্রীয় সরকারের কাজের চাপ কমায় :** এ সরকারব্যবস্থায় সংবিধানের মাধ্যমে কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতা ভাগ করে দেওয়া হয়। ফলে কেন্দ্রের কাজের চাপ কমে যায় এবং কেন্দ্রের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন সহজ হয়।

৩. **আঞ্চলিক সমস্যা সমাধানের উপযোগী :** যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় আঞ্চলিক সরকার সহজেই অঞ্চলের সমস্যাগুলো বুঝতে এবং তা চিহ্নিত করে সমাধান করতে পারে।

৪. **রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি ও স্থানীয় নেতৃত্বের বিকাশে সহায়ক :** যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় জনগণ দুটি সরকারের প্রতি আনুগত্য দেখায় এবং দুই প্রকার আইন ও আদেশ মেনে চলে। ফলে জনগণ রাজনৈতিকভাবে অধিকতর সচেতন হয়ে উঠে। এ ধরনের ব্যবস্থা স্থানীয় নেতৃত্ব বিকাশে খুবই সহায়ক।

৫. **কেন্দ্রের স্বেচ্ছাচারিতা লোপ পায় :** কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টনের ফলে কেন্দ্র নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে না। ফলে কেন্দ্রের স্বেচ্ছাচারী হওয়ার আশঙ্কা থাকে না।

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের ত্রুটি

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারে নিম্নোক্ত ত্রুটি দেখা দিতে পারে :

১. **জটিল প্রকৃতির শাসন :** যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের গঠনপ্রণালি জটিল প্রকৃতির। এ যেন সরকারের ভিতর সরকার। ফলে কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণ, ক্ষমতা বণ্টন, আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ প্রভৃতি বিষয়ে জটিলতা দেখা দেয়।

২. **ক্ষমতার দ্বন্দ্ব :** এতে ক্ষমতার এখতিয়ার নিয়ে কেন্দ্র, প্রদেশ এমনকি বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত সৃষ্টি হতে দেখা যায়।

৩. **দুর্বল সরকার :** ক্ষমতা বণ্টনের ফলে জাতীয় ও আঞ্চলিক সরকার উভয়েই দুর্বল অবস্থায় থাকে। জরুরি অবস্থায় অনেক সময় দ্রুত ও বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না। আঞ্চলিক সরকারের মতামতের প্রয়োজন হলে সিদ্ধান্ত গ্রহণে দেরি হয়।

৪. **বিচ্ছিন্ন হওয়ার আশঙ্কা :** যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের প্রদেশগুলো স্বতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসিত। এ কারণে সুযোগ বুঝে প্রয়োজনে কোনো অঞ্চল বা প্রদেশ বিচ্ছিন্ন হওয়ার চেষ্টা করতে পারে।

৫. **ব্যয়বহুল :** এতে দ্বৈত সরকার কাঠামো থাকায় প্রশাসনের ব্যয় বৃদ্ধি পায়।

দলীয় কাজ : এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের পার্থক্য নির্ণয় কর।

আইন ও শাসন বিভাগের সম্পর্কের ভিত্তিতে সরকারের শ্রেণিবিভাগ

আইন ও শাসন বিভাগ সরকারের দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। এ দুটি বিভাগের মধ্যে সম্পর্ক বা জবাবদিহিতা নীতির ভিত্তিতে সরকারের দুটি রূপ রয়েছে। যথা- সংসদীয় সরকার ও রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার।

সংসদীয় সরকার

যে সরকারব্যবস্থায় শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং শাসন বিভাগের স্থায়িত্ব ও কার্যকারিতা আইন বিভাগের উপর নির্ভরশীল তাকে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার বা সংসদীয় পদ্ধতির সরকার বলে। এতে মন্ত্রিসভার হাতে দেশের শাসন ক্ষমতা থাকে। সাধারণ নির্বাচনে সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী দল মন্ত্রিসভা গঠন করেন। দলের আস্থাভাজন ব্যক্তি হন প্রধানমন্ত্রী। তিনি দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্যদের মধ্য থেকে অন্যান্য মন্ত্রী নিয়োগ করেন ও তাঁদের মধ্যে দপ্তর বণ্টন করেন। মন্ত্রীগণ সাধারণত আইন পরিষদ বা সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকে মনোনীত হন। তাই এ সরকারকে বলা হয় সংসদীয় বা পার্লামেন্টারি পদ্ধতির সরকার। বাংলাদেশ, ভারত, যুক্তরাজ্য, কানাডা, সুইডেন, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার রয়েছে।

এ ধরনের সরকারে একজন নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধান থাকেন। তবে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা হয় প্রকৃত শাসন ক্ষমতার অধিকারী। এ ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ছাড়া কার্যত কিছু করেন না।

সংসদীয় সরকারে আইনসভা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। প্রধানমন্ত্রীসহ মন্ত্রিসভা তাদের কাজের জন্য আইন পরিষদের নিকট দায়ী থাকে। আইনসভার আস্থা হারালে মন্ত্রিসভার পতন ঘটে। এছাড়া মন্ত্রিসভার কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে সংসদ অনাস্থা আনলে তাকে পদত্যাগ করতে হয়। এ ব্যবস্থায় সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকে মন্ত্রী নিযুক্ত করায় একই ব্যক্তির হাতে আইন ও শাসন ক্ষমতা থাকে।

জোড়ায় কাজ : সংসদীয় সরকার পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যগুলো ছক/চার্টের সাহায্যে উপস্থাপন কর।

সংসদীয় সরকারের গুণ

সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারের যেসব গুণ রয়েছে তা নিম্নরূপ-

১. **দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা :** সংসদীয় সরকার দায়িত্বশীল সরকার। এতে ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দল উভয়ই তাদের কাজের জন্য জনগণের নিকট দায়ী থাকে।

২. **আইন ও শাসন বিভাগের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক :** শাসন বিভাগের সদস্যগণ আইনসভার সদস্য হওয়ায় এ সরকারে আইন ও শাসন বিভাগের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকে।

৩. **বিরোধী দলের মর্যাদা :** এ সরকার ব্যবস্থায় বিরোধী দলকে বিকল্প সরকার মনে করা হয়। ফলে জাতীয় সংকটে ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দল একসাথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করতে পারে। বিরোধী দল হচ্ছে সংসদীয় ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ।

৪. **সমালোচনার সুযোগ :** এ সরকারে সংসদ সদস্যগণ বিশেষ করে বিরোধী দলের সদস্যগণ সংসদে বসে সরকারের কাজের সমালোচনা করার সুযোগ পায়। ফলে সরকার তার কাজে সংযত হয় ও ভালো কাজ করার চেষ্টা করে।

৫. **রাজনৈতিক শিক্ষা দেয় :** সংসদীয় সরকার জনমতের দ্বারা পরিচালিত হয়। জনমতকে অনুকূলে রাখার জন্য তাই সরকারি ও বিরোধী দল সবসময় তৎপর থাকে। সংসদে বিতর্ক হয়। এতে জনগণ রাজনৈতিকভাবে সচেতন হয়।

সংসদীয় সরকারের ত্রুটি

সংসদীয় পদ্ধতির সরকারের কিছু ত্রুটি রয়েছে। যথা-

১. **স্থিতিশীলতার অভাব :** সংসদীয় সরকার অস্থিতিশীল হতে পারে। মন্ত্রিসভা আইনসভার আস্থা হারালে অথবা সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতার হেরফের হলে সরকারের পতন ঘটে। এ ধরনের পরিস্থিতি দেশকে অস্থিতিশীল করে তুলতে পারে।

২. **ক্ষমতার অবিভাজন :** এ ধরনের সরকারে শাসন ও আইন প্রণয়ন ক্ষমতা একই স্থানে তথা মন্ত্রিপরিষদের হাতে থাকে বলে মন্ত্রীগণ স্বৈরাচারী হয়ে উঠতে পারে। এ জন্য সংসদীয় সরকারকে সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বৈরাচার বলে আখ্যায়িত করা যায়।

৩. **অতি দলীয় মনোভাব :** সংসদীয় সরকার মূলত দলীয় সরকার। এতে দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতার উপর সরকারের গঠন ও স্থায়িত্ব নির্ভর করে। ফলে দলকে অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। ক্ষমতাসীন ও বিরোধী উভয় দলই চরম দলীয় মনোভাব নিয়ে কাজ করে। এছাড়া দলীয় সরকার হওয়ায় দলের সদস্যদের সন্তুষ্ট করার জন্য মেধা ও যোগ্যতা বিবেচনা না করে অনেককে মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ফলে জাতীয় স্বার্থ ব্যাহত হয়।

৪. **সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব :** এখানে যেকোনো বিষয়ে বহু আলোচনা ও পরামর্শের পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণে দেরি হয়। অনেক কাজই সময়মত করা সম্ভব হয় না।

দলীয় কাজ : সংসদীয় সরকারের দোষ ও ত্রুটির তালিকা তৈরি কর।

রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার

রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার বলতে সেই সরকারকে বোঝায় যেখানে শাসন বিভাগ তার কাজের জন্য আইন বিভাগের নিকট দায়ী থাকে না। রাষ্ট্রপতি তার পছন্দের ব্যক্তিদের নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করেন। রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রিসভার সদস্যগণ আইনসভার সদস্য নন। মন্ত্রীগণ তাদের কাজের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে দায়ী থাকেন। রাষ্ট্রপতির সন্তুষ্টির উপর মন্ত্রীদের কার্যকাল নির্ভর করে। রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারে রাষ্ট্রপতি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তিনিই প্রকৃত শাসক ও সরকারপ্রধান। তিনি কোনো কাজে মন্ত্রীদের পরামর্শ গ্রহণ করতেও পারেন আবার নাও করতে পারেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার প্রচলিত রয়েছে।

রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের গুণ

রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের গুণাবলি নিম্নরূপ :

১. **স্থিতিশীল শাসন :** রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারে রাষ্ট্রপতি একটি নির্ধারিত মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হন। এ সময় একমাত্র অভিশংসন (কোনো সুনির্দিষ্ট অভিযোগের প্রেক্ষিতে আইন সভার দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের অনুমোদন সাপেক্ষে অপসারণ করা) ছাড়া তাকে অপসারণ করা যায় না। ফলে শাসনব্যবস্থা স্থিতিশীল থাকে।

২. **দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ :** এ ব্যবস্থায় আইন বিভাগের সাথে পরামর্শ না করে রাষ্ট্রপতি দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। ফলে যুদ্ধ, জরুরি অবস্থা ও অন্য কোনো সংকটকালে সিদ্ধান্ত গ্রহণে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার পারদর্শিতার পরিচয় দেয়।

৩. **দক্ষ শাসনব্যবস্থা :** এতে রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রীগণকে আইন প্রণয়ন নিয়ে বেশি মাথা ঘামাতে হয় না এবং তারা আইন পরিষদের কাছে দায়ী নন। ফলে তারা প্রশাসনিক বিষয়ে বেশি সময় দিতে পারেন, যা প্রশাসনকে দক্ষ করে তোলে।

৪. **ক্ষমতার স্বাতন্ত্রীকরণ :** এই শাসনব্যবস্থায় সরকারের তিনটি বিভাগ (শাসন, আইন ও বিচার বিভাগ) পৃথকভাবে কাজ করে, আবার অন্যদিকে একটি অন্যটির সাথে সম্পর্ক বজায় রাখে। ফলে এতে ক্ষমতার পৃথকীকরণ ও ভারসাম্য বজায় থাকে।

৫. **দলীয় মনোভাবের কম প্রতিফলন :** আইন সভায় বিল পাসের ক্ষেত্রে সংসদ সদস্যদের মধ্যে ভোটাভুটি সরকারের স্থায়িত্বের উপর প্রভাব ফেলে না। ফলে এ ব্যবস্থায় দলীয় মনোভাব কম প্রদর্শিত হয়। রাষ্ট্রপতি দলের চেয়ে জাতীয় স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করাকে অধিকতর গুরুত্ব দেন।

রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের ত্রুটি

রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের ত্রুটি নিম্নরূপ :

১. **স্বেচ্ছাচারী শাসন :** রাষ্ট্রপতির হাতে সর্বময় কর্তৃত্ব থাকায় এবং শাসন বিভাগ তার কাজের জন্য আইন বিভাগের নিকট দায়ী না থাকায় রাষ্ট্রপতি স্বেচ্ছাচারী শাসকে পরিণত হতে পারেন। যেহেতু তিনি কারও সাথে পরামর্শ করতে বাধ্য নন, সেহেতু খামখেয়ালী ও দায়িত্বহীন শাসনের আশঙ্কা এতে বেশি থাকে।

২. **বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সুসম্পর্কের অভাব :** শাসন, আইন ও বিচার বিভাগের গঠন ও ক্ষমতা আলাদা হওয়ায় পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতার অভাব ও বৈরিতা দেখা দেয়। এ ধরনের পরিস্থিতি সরকারকে নাজুক অবস্থায় ফেলতে পারে।

৩. **অনমনীয় শাসনঃ** রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারে সহজে সংবিধান সংশোধন করা যায় না। ফলে শাসনব্যবস্থা অনমনীয় প্রকৃতির হয়। কোথাও কোনো পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে তা সহজে করা যায় না। আবার রাষ্ট্রপতিকে সহজে পদচ্যুত করা যায় না। ফলে সহজে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন ঘটানো যায় না।

এ অধ্যায়ে আমরা রাষ্ট্র ও সরকারব্যবস্থার বিভিন্ন ধরন ও এদের দোষ ও গুণ সম্পর্কে জানলাম। পৃথিবীর কোনো রাষ্ট্রের সরকারব্যবস্থা কেবল একটি পদ্ধতিকে ধারণ করে না। বরং একাধিক পদ্ধতির সংমিশ্রণে বিভিন্ন রাষ্ট্র ও সরকারব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। যেমন- আমেরিকা একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এখানে রয়েছে রাষ্ট্রপতি শাসিত ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারব্যবস্থা। যুক্তরাজ্যে রয়েছে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার এবং নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র। রাষ্ট্রের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা, জনগণের প্রত্যাশা, বাস্তব পরিস্থিতি ইত্যাদি বিভিন্ন কারণেই এই বিভিন্নতা গড়ে উঠে।

দলীয় কাজ : ১) সংসদীয় ও রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারের মধ্যে কোনটি উত্তম সে সম্পর্কে আলোচনা কর।
২) বাংলাদেশের সরকারব্যবস্থা সরকারের বিভিন্ন ধরনগুলোর মধ্যে কোনগুলোকে ধারণ করে তা আলোচনা কর।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। ক্ষমতার উৎসের ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্রব্যবস্থা কোনটি ?

ক) সমাজতান্ত্রিক
খ) পুঁজিবাদী
গ) রাজতান্ত্রিক
ঘ) গণতান্ত্রিক

২। ব্যক্তি স্বাধীনতার রক্ষাকারী রাষ্ট্রব্যবস্থা কোনটি?

ক) গণতান্ত্রিক
খ) পুঁজিবাদী
গ) একনায়কতান্ত্রিক
ঘ) সমাজতান্ত্রিক

৩। গণতন্ত্রকে দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা বলা হয়। কারণ এখানে শাসকগণ –

i. জনগণের নিকট দায়ী থাকে

ii. জনস্বার্থ রক্ষার চেষ্টা করে

iii. সততার সাথে দায়িত্ব পালন করে

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক) i ও ii খ) ii ও iii

গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

নিচের ছকটি পর্যবেক্ষণ করে ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

'ক' দেশের সরকারব্যবস্থা

X- ইউনিট	Y- ইউনিট
১। সকল শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতার অধিকারী	১। X ইউনিটের এজেন্ট হিসেবে কাজ করে
২। দেশ পরিচালনার নির্দেশনা প্রদান	২। নির্দেশিত কাজ বাস্তবায়ন করে
৩। বিভিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত করে ক্ষমতা বণ্টন	৩। X ইউনিটের নিয়ন্ত্রণে থাকে।

৪। 'ক' রাষ্ট্রে কোন ধরনের সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান ?

ক. যুক্তরাষ্ট্রীয় খ. এককেন্দ্রিক

গ. সমাজতান্ত্রিক ঘ. রাজতান্ত্রিক

৫. উক্ত সরকার ব্যবস্থায়

i. 'Y' ইউনিটটি আঞ্চলিক সরকার হিসেবে কাজ করেছে।

ii. 'X' ইউনিটটি 'Y' ইউনিটের ক্ষমতা ফিরিয়ে নিতে পারে ।

iii. 'X' ইউনিটটি 'ক' রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতার উৎস ।

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক) i ও ii খ) ii ও ii

গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. দুইটি রাষ্ট্রের সরকারের ক্ষমতার ধারা :

'x' ব্যক্তি জনগণের ভোটে নির্বাচিত 'ক' রাষ্ট্রের প্রকৃত শাসক। তিনি আইনসভার সদস্য নন। তাঁর সরকার ব্যবস্থায় দলের চাইতে জাতীয় স্বার্থ বেশি গুরুত্ব পায়।	'y' ব্যক্তির দল জনগণের সরাসরি ভোটের মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করায় 'খ' রাষ্ট্রের সরকার গঠন করে। 'y' ব্যক্তি এবং তাঁর দল আইনসভায় বিভিন্ন দল-মতের প্রাধান্য দিয়ে বিভিন্ন আইন পাস করেন।

ক. উত্তরাধিকার সূত্রে গঠিত সরকারব্যবস্থার নাম কী ?

খ. পুঁজিবাদী রাষ্ট্র কী? ব্যাখ্যা কর।

গ. 'ক' রাষ্ট্রের সরকারব্যবস্থা কোন ধরনের? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'খ' রাষ্ট্রের সরকারব্যবস্থায় জনমতের প্রাধান্য লক্ষ করা যায় -উক্তিটির পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন কর।

২। 'A' রাষ্ট্রের ভৌগোলিক আকৃতি খুব ছোট হওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষা, বিদ্যুৎ, যোগাযোগ ও কৃষি ক্ষেত্রের দ্রুত উন্নয়ন সাধন করে। উক্ত রাষ্ট্রের স্তরে স্তরে অনেক কর্মকর্তা-কর্মচারী নেই বলে অর্থনৈতিক খরচ অনেক কম। অন্যদিকে 'B' রাষ্ট্রের অঞ্চলগুলো অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে স্বাধীন বলে আঞ্চলিক নেতৃত্ব গঠন করে স্থানীয় পরিষদের মাধ্যমে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করে। ফলে এ রাষ্ট্রের সরকারের উচ্চস্তরে কাজের চাপ অনেক কমে যায়।

ক. এক দলের শাসন কায়েম হয় কোন রাষ্ট্রব্যবস্থায়?

খ. উত্তরাধিকারের ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্রব্যবস্থাটি ব্যাখ্যা কর।

গ. 'A ' রাষ্ট্রের সরকারব্যবস্থার ধরনটি ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'B' রাষ্ট্রের সরকারব্যবস্থা স্থানীয় নেতৃত্ব বিকাশে সহায়ক - বিশ্লেষণ কর।

পঞ্চম অধ্যায়

সংবিধান

আমরা রাষ্ট্রে বাস করি। রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য কিছু নিয়ম কানুন রয়েছে। এসব নিয়মাবলির সমষ্টিকে সংবিধান বলে। সংবিধানের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালিত হয়। সংবিধানকে বলা হয় রাষ্ট্রের দর্পণ বা আয়নাস্বরূপ। সংবিধানে নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য, শাসকের ক্ষমতা এবং নাগরিক ও শাসকের সম্পর্ক কিরূপ হবে তা সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ থাকে। কাজেই রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের সংবিধান সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। এ অধ্যায়ে আমরা সংবিধানের ধারণা, সংবিধানের গুরুত্ব, সংবিধান প্রণয়ন পদ্ধতি, বিভিন্ন প্রকার সংবিধানের বৈশিষ্ট্য, বাংলাদেশের সংবিধান তৈরির ইতিহাস, এর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এবং বিভিন্ন সংশোধনীসমূহ সম্বন্ধে জানব।

এ অধ্যায় পড়া শেষে আমরা-

- সংবিধানের ধারণা ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- সংবিধান প্রণয়নের পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারব।
- উত্তম সংবিধানের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারব।
- বাংলাদেশের সংবিধান রচনার ইতিহাস বর্ণনা করতে পারব।
- বাংলাদেশের সংবিধানের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বাংলাদেশের সংবিধানের বিভিন্ন সংশোধনী বর্ণনা করতে পারব।

সংবিধানের ধারণা ও গুরুত্ব

সংবিধান হলো রাষ্ট্র পরিচালনার মৌলিক দলিল। যে সব নিয়মের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালিত হয় তাকে সংবিধান বলে। সরকার কীভাবে নির্বাচিত হবে, আইন, শাসন ও বিচার বিভাগ কীভাবে গঠিত হবে, এদের ক্ষমতা কী হবে, জনগণ ও সরকারের সম্পর্ক কেমন হবে-এসব বিষয় সংবিধানে উল্লেখ থাকে। এসব বিষয়ে সংবিধানের পরিপন্থী কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না। তাই সংবিধানকে রাষ্টের চালিকা শক্তি বলা হয়। রাষ্ট্র বিজ্ঞানের জনক অ্যারিস্টটল বলেন, 'সংবিধান হলো এমন এক জীবন পদ্ধতি যা রাষ্ট্র স্বয়ং বেছে নিয়েছে।'

সংবিধান প্রণয়ন পদ্ধতি

সংবিধান প্রণয়নের বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য পদ্ধতিগুলো নিম্নে বর্ণনা করা হলো-

১. **অনুমোদনের মাধ্যমে :** জনগণকে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে অতীতে প্রায় সব রাষ্ট্রেই স্বেচ্ছাচারী শাসক নিজের ইচ্ছানুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করত। এতে জনগণের মধ্যে ক্ষোভ ও অসন্তোষ দেখা দেয়। জনগণকে শান্ত করার জন্য এবং তাদের অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য একপর্যায়ে শাসক সংবিধান প্রণয়ন করেন। যেমন- ১২১৫ সালে ইংল্যান্ডের রাজা জন 'ম্যাগনাকার্টা' নামে অধিকার সনদ স্বাক্ষরে বাধ্য হন। এটি ব্রিটিশ সংবিধানের এক উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে।

২. **আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে :** সংবিধান প্রণয়নের লক্ষ্যে গঠিত গণপরিষদের সদস্যদের আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সংবিধান রচিত হতে পারে। ভারত, পাকিস্তান ও যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান এভাবে

প্রণয়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানও আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে গণপরিষদ কর্তৃক ১৯৭২ সালে প্রণীত হয়।

৩. **বিপ্লবের দ্বারা :** শাসক যখন জনগণের স্বার্থ ও কল্যাণ নিহিত নয় এমন কোনো কাজ করে অর্থাৎ শাসক স্বৈরাচারী শাসকে পরিণত হয়, তখন বিপ্লবের মাধ্যমে স্বৈরাচারী শাসকের পরিবর্তন ঘটিয়ে নতুন শাসকগোষ্ঠী শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করে এবং নতুন সংবিধান তৈরি করে। রাশিয়া, কিউবা, চীনের সংবিধান এ পদ্ধতিতে তৈরি হয়েছে।

৪. **ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে :** বিবর্তনের মাধ্যমে সংবিধান গড়ে উঠতে পারে। যেমন- ব্রিটেনের সংবিধান ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে ধীরে ধীরে লোকাচার ও প্রথার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। এ ক্ষেত্রে সংবিধান কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রণয়ন করা হয় না, ধীরে ধীরে গড়ে উঠে। তাই বলা হয়, ব্রিটিশ সংবিধান তৈরি হয়নি, গড়ে উঠেছে।

জোড়ায় কাজ : সংবিধান প্রণয়নের কোন পদ্ধতি উত্তম? তার কয়েকটি কারণ ব্যাখ্যা কর।

সংবিধানের শ্রেণিবিভাগ

সংবিধানের শ্রেণিবিভাগ নিচে দেখানো হলো–

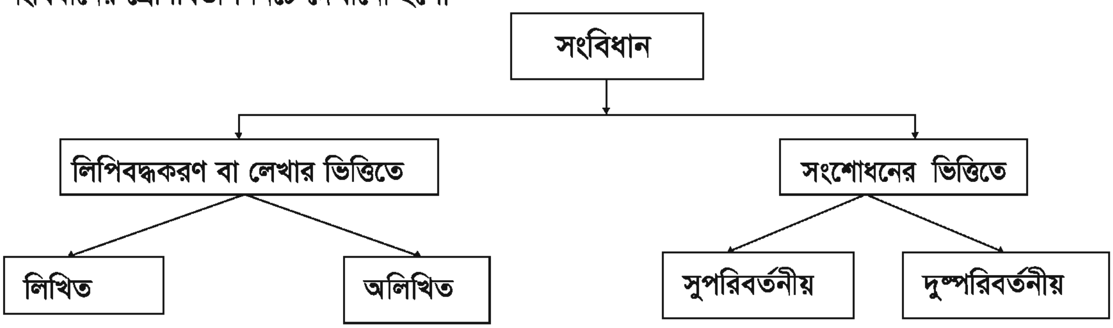

১. লেখার ভিত্তিতে সংবিধানের শ্রেণিবিভাগ : লেখার ভিত্তিতে সংবিধান দুই ধরনের হতে পারে। যথা : ক. লিখিত সংবিধান ও খ. অলিখিত সংবিধান।

ক. লিখিত সংবিধান : লিখিত সংবিধানের অধিকাংশ বিষয় দলিলে লিপিবদ্ধ থাকে। বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান লিখিত।

খ. অলিখিত সংবিধান : অলিখিত সংবিধানের অধিকাংশ নিয়ম কোনো দলিলে লিপিবদ্ধ থাকে না। এ ধরনের সংবিধান প্রথা ও রীতিনীতিভিত্তিক। চিরাচরিত নিয়ম ও আচার অনুষ্ঠানের ভিত্তিতে এ ধরনের সংবিধান গড়ে উঠে। যেমন- ব্রিটেনের সংবিধান অলিখিত।

তবে এ কথা সত্য যে, কোনো সংবিধানই পুরোপুরি লিখিত বা অলিখিত নয়। কোনোটি বেশি লিখিত আবার কোনোটি কম লিখিত। যে সংবিধানে অধিকাংশ বিষয় লিখিত থাকে, তাকে বলে লিখিত সংবিধান। আর যে সংবিধানের অধিকাংশ বিষয় অলিখিত থাকে, তাকে অলিখিত সংবিধান বলে।

২. **সংশোধনের ভিত্তিতে সংবিধানের শ্রেণিবিভাগ :** সংশোধনের ভিত্তিতে সংবিধান দুই প্রকার। যথা – ক. সুপরিবর্তনীয় সংবিধান ও খ. দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান।

ক. **সুপরিবর্তনীয় সংবিধান :** সুপরিবর্তনীয় সংবিধানের যে কোনো ধারা সহজে পরিবর্তন বা সংশোধন করা যায়। এ ক্ষেত্রে সংবিধান সংশোধন বা পরিবর্তন করতে কোনো জটিলতার প্রয়োজন হয় না। সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় আইনসভা এর যেকোনো অংশ সংশোধন করতে পারে। ব্রিটিশ সংবিধান সুপরিবর্তনীয় সংবিধান।

খ. **দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান :** দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানের কোনো ধারা সহজে পরিবর্তন বা সংশোধন করা যায় না, এ ক্ষেত্রে সংবিধান পরিবর্তন বা সংশোধন করতে হলে জটিল পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হয়। সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় এ ধরনের সংবিধান পরিবর্তন করা যায় না। প্রয়োজন হয় বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠতা, সম্মেলন ও ভোটাভুটির। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয়।

লিখিত সংবিধানের বৈশিষ্ট্য

লিখিত সংবিধানের যেসব উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে, সেগুলো নিম্নে বর্ণিত হলো-

১. **সুস্পষ্টতা :** লিখিত সংবিধানের অধিকাংশ ধারা লিখিত থাকে বলে এটি জনগণের নিকট সুস্পষ্ট ও বোধমগ্য হয়। লিখিত সংবিধানে সাধারণত সংশোধন পদ্ধতি উল্লেখ থাকে বিধায় খুব সহজে পরিবর্তন বা সংশোধন করা যায় না। কিন্তু সমাজ প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। লিখিত সংবিধান পরিবর্তিত সমাজের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারে না। এজন্য এটি কখনো কখনো প্রগতির অন্তরায় হিসেবে কাজ করে। তাছাড়া অনেক সময় সংবিধান সংশোধনের জন্য জনগণ বিপ্লব করতে বাধ্য হয়।

২. **স্থিতিশীলতা :** এ সংবিধানে সব কিছু লিখিত থাকে বিধায় শাসক তার ইচ্ছামতো এটি পরিবর্তন বা সংশোধন করতে পারে না। তাই লিখিত সংবিধান যেকোনো পরিস্থিতিতে স্থিতিশীল থাকতে পারে। লিখিত সংবিধানের সকল ধারা জনগণ ও শাসক মেনে চলতে বাধ্য হয়।

৩. **যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারব্যবস্থার উপযোগী :** লিখিত সংবিধান যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারব্যবস্থার জন্য উপযোগী। এ সংবিধানের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারব্যবস্থায় প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করে দেওয়া হয়। সংবিধান লিখিত না হলে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারব্যবস্থায় এরূপ ক্ষমতা বণ্টন সম্ভব হতো না। যেমন- ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে লিখিত সংবিধানের মাধ্যমে ক্ষমতা বণ্টন করে দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, লিখিত সংবিধান যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের সফলতার পূর্বশর্ত।

৪. **শাসক ও জনগণের সম্পর্ক :** লিখিত সংবিধানে শাসকের ক্ষমতা কী হবে, জনগণ কী কী অধিকার ভোগ করবে তার উল্লেখ থাকে। এর ফলে শাসক ও জনগণ নিজেদের ক্ষমতা ও অধিকার সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারে।

দলীয় কাজ : লিখিত সংবিধানে দোষ-ত্রুটি চিহ্নিত কর।

অলিখিত সংবিধানের বৈশিষ্ট্য

অলিখিত সংবিধানের বৈশিষ্ট্য নিম্নে বর্ণনা করা হলো−

১. **প্রগতির সহায়ক :** সমাজ সর্বদা প্রগতির দিকে ধাবিত হয়। আর অলিখিত সংবিধান সমাজের প্রগতির সাথে তাল মিলিয়ে সহজে পরিবর্তন করা যায়। অর্থাৎ এটি সমাজের পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে সহজেই খাপ খাওয়াতে পারে। সুতরাং অলিখিত সংবিধান প্রগতির সহায়ক। কিন্তু অধিক পরিবর্তনশীলতা আবার অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে।

২. **জরুরি প্রয়োজনে সহায়ক :** অলিখিত সংবিধান যেহেতু সহজে পরিবর্তনীয়, তাই জরুরি প্রয়োজন মিটাতে অলিখিত সংবিধান অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করে। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অলিখিত সংবিধান ঘন ঘন পরিবর্তনের ফলে কোনো স্থায়ী নীতি ও কার্যক্রম হাতে নেওয়া যায় না। এর ফলে সরকারব্যবস্থা অস্থিতিশীল হতে পারে।

৩. **বিপ্লবের সম্ভাবনা কম :** এ সংবিধান সহজে পরিবর্তন করা যায়। জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী অলিখিত সংবিধান পরিবর্তন হতে পারে বিধায় বিপ্লবের সম্ভাবনা কম থাকে।

৪. **বিবিধ :** যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারব্যবস্থায় অলিখিত সংবিধান উপযোগী নয়। এ সংবিধানের অধিকাংশ বিষয় লিখিত না থাকায় রাষ্ট্র পরিচালনার বিষয় সম্পর্কে অনেকেরই সুস্পষ্ট ধারণা থাকে না।

জোড়ায় কাজ : লিখিত ও অলিখিত সংবিধানের উল্লেখযোগ্য পার্থক্য তুলে ধর।

উত্তম সংবিধানের বৈশিষ্ট্য

বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের কোনো না কোনো সংবিধান রয়েছে। যে রাষ্ট্রের সংবিধান যত উন্নত, সে রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা ততটা উত্তমভাবে পরিচালিত হয়। উত্তম সংবিধানের নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো রয়েছে।

১. **সুস্পষ্ট :** উত্তম সংবিধানে অধিকাংশ বিষয় লিখিত থাকে। এ সংবিধানের ভাষা সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল হয়। এ কারণে উত্তম সংবিধান সকলের নিকট সুস্পষ্ট ও বোধগম্য হয়।

২. **সংক্ষিপ্ত :** উত্তম সংবিধান সংক্ষিপ্ত প্রকৃতির। অপ্রয়োজনীয় ও অপ্রাসঙ্গিক বিষয় উত্তম সংবিধানে স্থান পায় না। রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য উল্লেখযোগ্য বিধিবিধানগুলো এ সংবিধানে উল্লেখ থাকে।

৩. **মৌলিক অধিকার :** নাগরিকের মৌলিক অধিকার উত্তম সংবিধানে উল্লেখ থাকে। এর ফলে জনগণ তার অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়। তাছাড়া শাসক বা অন্য কেউ এ অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে পারে না।

৪. **জনমতের প্রতিফলন :** উত্তম সংবিধান জনমতের ভিত্তিতে প্রণীত হয়। এ সংবিধানে জনগণের চাহিদা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটে। তাছাড়া সামাজিক রীতি-নীতি ও ঐতিহ্য এ সংবিধানে প্রতিফলিত হয়।

৫. **সুষম প্রকৃতির :** উত্তম সংবিধান সুষম প্রকৃতির। এর অর্থ, উত্তম সংবিধান সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানের মাঝামাঝি অবস্থান করে। অর্থাৎ এটি খুব সুপরিবর্তনীয় কিংবা খুব বেশি দুষ্পরিবর্তনীয় নয়। এর ফলে উত্তম সংবিধান সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে সক্ষম।

৬. **সংশোধন পদ্ধতি :** উত্তম সংবিধানের কোনো ধারার সংশোধন বা পরিবর্তন নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে হয়। অর্থাৎ এ সংবিধানে সংশোধন পদ্ধতি উল্লেখ থাকে। সংবিধানের কোন অংশ কীভাবে সংশোধন করা হবে তা উত্তম সংবিধানে উল্লেখ থাকে।

৭. **রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি :** রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি উত্তম সংবিধানে উল্লেখ থাকে। যেমন- বাংলাদেশের সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

৮. **জনকল্যাণকামী :** দার্শনিক রুশো বলেছেন, যে আইনে মানুষের কল্যাণ নাই তা উত্তম সংবিধান হতে পারে না। সুতরাং উত্তম সংবিধান হবে জনকল্যাণকামী।

কোনো সংবিধানে উপরে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো থাকলে তাকে উত্তম সংবিধান বলা যাবে।

বাংলাদেশের সংবিধান

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালে সংবিধান তৈরির জন্য ৩৪ সদস্যবিশিষ্ট খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি গঠিত হয়। উক্ত কমিটির সভাপতি ছিলেন ড. কামাল হোসেন। এ খসড়া কমিটির প্রথম অধিবেশন বসে ১৯৭২ সালের ১৭ই এপ্রিল। এ কমিটি অক্লান্ত পরিশ্রম করে বাংলাদেশের খসড়া সংবিধান তৈরি করে এবং তা গণপরিষদে উত্থাপিত হয়। ১৯শে অক্টোবর থেকে ৪ঠা নভেম্বর পর্যন্ত গণপরিষদে সংবিধানের খসড়া পাঠ করা হয়। গণপরিষদে বিভিন্ন সদস্যের পক্ষে-বিপক্ষে মতামত দানের পর অবশেষে পরিমার্জিত হয়ে উক্ত সংবিধান ৪ঠা নভেম্বর ১৯৭২ সালে গণপরিষদ কর্তৃক গৃহীত হয় এবং ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭২ থেকে তা কার্যকর হয়।

বাংলাদেশের সংবিধানের বৈশিষ্ট্য

বাংলাদেশের বর্তমান সংবিধানের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নে বর্ণনা করা হলো-

১. **লিখিত দলিল :** বাংলাদেশের সংবিধান একটি লিখিত দলিল। এর ১৫৩টি অনুচ্ছেদ রয়েছে। এটি ১১টি ভাগে বিভক্ত। এর একটি প্রস্তাবনাসহ সাতটি তফসিল রয়েছে।

২. **দুষ্পরিবর্তনীয় :** বাংলাদেশের সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয়। কারণ, এর কোনো নিয়ম পরিবর্তন বা সংশোধন করতে জাতীয় সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সম্মতির প্রয়োজন হয়।

৩. **রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি :** জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি নির্ধারণ করা হয়েছে। রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে এসব মূলনীতির দ্বারা অনুপ্রাণিত ও প্রভাবিত হয়ে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে।

৪. **মৌলিক অধিকার :** সংবিধান হলো রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন। বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে আমরা কী কী অধিকার ভোগ করতে পারব তা সংবিধানে উল্লেখ থাকায় এগুলোর গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমন- জীবনধারণের অধিকার, চলাফেরার অধিকার, বাকস্বাধীনতার অধিকার, চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা, ধর্মচর্চার অধিকার, সম্পত্তির অধিকার ইত্যাদি।

৫. **সর্বজনীন ভোটাধিকার :** বাংলাদেশের সংবিধানে সর্বজনীন ভোটাধিকার প্রদান করা হয়েছে। অর্থাৎ জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, পেশা ইত্যাদি নির্বিশেষে ১৮ বা তদুর্ধ বছর বয়সের এ দেশের সকল নাগরিক ভোটাধিকার লাভ করেছে।

৬. **প্রজাতান্ত্রিক :** সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশ একটি প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এখানে সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ। জনগণের পক্ষে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ রাষ্ট্র পরিচালনা করবেন।

৭. **সংসদীয় সরকার :** বাংলাদেশের সংবিধানে সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভার হাতে শাসনকার্য পরিচালনার ভার অর্পণ করা হয়। এ সরকারব্যবস্থায় মন্ত্রিপরিষদ তার কাজের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী থাকে।

৮. **এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র :** বাংলাদেশ একটি এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র। এখানে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মতো কোনো অঙ্গরাজ্য বা প্রাদেশিক সরকার নেই। জাতীয় পর্যায়ে একটিমাত্র কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা সমগ্র দেশ পরিচালিত হয়।

৯. **আইনসভা :** বাংলাদেশের আইনসভা এক কক্ষবিশিষ্ট। এটি সার্বভৌম আইন প্রণয়নকারী সংস্থা। এর নাম জাতীয় সংসদ। বর্তমানে জাতীয় সংসদ ৩৫০ জন সদস্য নিয়ে গঠিত। সংসদের মেয়াদ ৫ বছর।

১০. **সর্বোচ্চ আইন :** বাংলাদেশের সংবিধান রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন। কারণ বাংলাদেশের সংবিধানের সাথে দেশের প্রচলিত কোনো আইনের সংঘাত সৃষ্টি হলে সে ক্ষেত্রে সংবিধান প্রাধান্য পাবে। অর্থাৎ যদি কোনো আইন সংবিধানের সাথে সামঞ্জস্যহীন হয়, তাহলে ঐ আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ ততোখানি বাতিল হয়ে যাবে।

১১. **বিচার বিভাগের স্বাধীনতা :** বাংলাদেশের সংবিধানে একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার বিভাগের বিধান রয়েছে।

> **দলীয় কাজ :** বাংলাদেশের সংবিধান কি উত্তম? উত্তরের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন কর।

বাংলাদেশের সংবিধানের সংশোধনীসমূহ

১৯৭২ সালে সংবিধান প্রণয়নের পর থেকে এ পর্যন্ত বাংলাদেশের সংবিধান মোট ১৬ বার সংশোধন করা হয়েছে। বাংলাদেশ সংবিধানের ১৬টি সংশোধনীর প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য নিম্নে বর্ণিত হলো-

সংশোধনী ও সাল	বিষয়বস্তু
প্রথম সংশোধনী জুলাই, ১৯৭৩	● ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময়কার মানবতাবিরোধী যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বিধান করা হয়।
দ্বিতীয় সংশোধনী সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩	● দেশের ভেতরে গোলযোগ, যুদ্ধের আশঙ্কা কিংবা মানুষের জীবনযাত্রায় সংকট দেখা দিলে রাষ্ট্রপতিকে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে 'জরুরি অবস্থা' ঘোষণার ক্ষমতা দেওয়া হয়।
তৃতীয় সংশোধনী নভেম্বর, ১৯৭৪	● বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর মধ্যে ভারত-বাংলাদেশের সীমান্ত সংক্রান্ত যে চুক্তি হয়, তৃতীয় সংশোধনীতে তা বৈধ ঘোষণা করা হয়।

সংশোধনী ও সাল	বিষয়বস্তু
চতুর্থ সংশোধনী জানুয়ারি, ১৯৭৫	● সংসদীয় সরকারব্যবস্থার পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। ● উপরাষ্ট্রপতির পদ সৃষ্টি এবং সকল রাজনৈতিক দল বিলুপ্ত করে একটিমাত্র জাতীয় দল সৃষ্টি করা হয়।
পঞ্চম সংশোধনী এপ্রিল, ১৯৭৯	● ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পরে সামরিক সরকার কর্তৃক যেসব বিধিবিধান প্রণয়ন ও সংবিধানের সংশোধনী আনা হয়েছে, সেগুলো পঞ্চম সংশোধনী আইনে বৈধ বলে ঘোষণা করা হয়। ● রাষ্ট্রীয় মূলনীতি পরিবর্তন করা হয়। ● বাংলাদেশের নাগরিকতা 'বাঙালি' থেকে 'বাংলাদেশি' করা হয়।
ষষ্ঠ সংশোধনী জুলাই, ১৯৮১	● উপরাষ্ট্রপতির পদ লাভজনক নয় এই বিধান করে বিচারপতি আব্দুস সাত্তারকে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়।
সপ্তম সংশোধনী নভেম্বর, ১৯৮৬	● ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ থেকে ১৯৮৬ সালের নভেম্বর পর্যন্ত জেনারেল এরশাদ যেসব বিধি-বিধান ও সামরিক আইন জারি এবং তার ভিত্তিতে যেসব কাজ সম্পাদন করেছিলেন, সেগুলোকে এ সংশোধনীতে বৈধতা দেওয়া হয়।
অষ্টম সংশোধনী জুন, ১৯৮৮	● বাংলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম এবং ঢাকার বাইরে হাইকোর্টের ৬টি বেঞ্চ স্থাপন করা হয়।
নবম সংশোধনী জুলাই, ১৯৮৯	● জনগণের সরাসরি ভোটে উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনের বিধান করা হয়। ● রাষ্ট্রপতি পদে কোনো ব্যক্তি পর পর দুই মেয়াদের অধিক অধিষ্ঠিত না হতে পারার নিয়ম করা হয়।
দশম সংশোধনী জুন, ১৯৯০	● জাতীয় সংসদে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ৩০টি আসনের সময় আরও ১০ বছর বৃদ্ধি করা হয়।
একাদশ সংশোধনী আগস্ট, ১৯৯১	● অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ কর্তৃক প্রয়োগকৃত সকল কার্যক্রম বৈধ করা হয় এবং পুনরায় তাঁর প্রধান বিচারপতি পদে ফিরে যাবার বিধান করা হয়।
দ্বাদশ সংশোধনী সেপ্টেম্বর, ১৯৯১	● রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থার পরিবর্তে সংসদীয় সরকারব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন হয়। ● উপরাষ্ট্রপতির পদ বিলুপ্ত করা হয়।
ত্রয়োদশ সংশোধনী মার্চ, ১৯৯৬	● অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়।

চতুর্দশ সংশোধনী **মে, ২০০৪**	• মহিলাদের জন্য জাতীয় সংসদে ৪৫টি আসন সংরক্ষণ করা হয়। • রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর প্রতিকৃতি সরকারি অফিসসহ নির্ধারিত প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের বিধান করা হয়। • সুপ্রীমকোর্টের বিচারক, পিএসসির চেয়ারম্যান ও সদস্যদের অবসরের বয়সসীমা বৃদ্ধি করা হয়।
পঞ্চদশ সংশোধনী **জুলাই,২০১১**	• তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বিলুপ্ত করা হয়। • ১৯৭২ মূল সংবিধানের রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতি যথা : জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তন করা হয়। • রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম রাখার পাশাপাশি সকল ধর্মচর্চার স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়। • জাতীয় সংসদে মহিলাদের জন্য ৫০টি আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।
ষোড়শ সংশোধনী সেপ্টেম্বর,২০১৪	• সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিদের অপসারণের ক্ষমতা সংসদের হাতে ফিরিয়ে আনার বিধান পুন:প্রবর্তন করা হয়।

দলীয় কাজ : সংবিধানের চতুর্থ ও দ্বাদশ সংশোধনী অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা সংক্ষেপে আলোচনা কর।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক কে ?

ক) জন লক খ) জ্যাঁ জ্যাক রুশো

গ) এ্যারিস্টটল ঘ) টি.এইচ. গ্রিন

২। বাংলাদেশ সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর প্রধান বৈশিষ্ট্য কী ?

ক) রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থার প্রবর্তন খ) রাষ্ট্রীয় মূলনীতির পরিবর্তন

গ) সংসদীয় সরকারব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন ঘ) তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বিলুপ্তকরণ।

৩। সংবিধান প্রণয়ন করার প্রয়োজন হয়–

i. জনগণকে শান্ত করার জন্য।

ii. জনগণের অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়ার জন্য।

iii. স্বেচ্ছাচারী শাসক থেকে রাষ্ট্রকে রক্ষা করতে।

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক) i ও ii খ) ii ও iii

গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

'ক' ব্যক্তি প্রতিবেশী 'খ' ব্যক্তির একটি জমি দখল করে নিলে 'খ' ব্যক্তি আইন প্রয়োগকারী সংস্থার শরণাপন্ন হয়। উক্ত সংস্থা প্রচলিত আইনের মাধ্যমে 'খ' ব্যক্তির জমি তাকে বুঝিয়ে দেয়।

৪। সংবিধানের কোন বৈশিষ্ট্যের প্রয়োগের কারণে 'খ' তার সম্পত্তি ফেরত পায়?

ক) মৌলিক অধিকার রক্ষা খ) জনমতের প্রতিফলন

গ) সংশোধন পদ্ধতি ঘ) সুষম প্রকৃতি

৫। সংবিধানে উক্ত বৈশিষ্ট্য উল্লেখ থাকায় জনগণ–

i. নিজেদের অধিকার ভোগের প্রতি সচেতন হয়

ii. কেউ অন্য কারো অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে পারে না

iii. তাদের চাহিদা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন দেখতে পায়

২০১৬

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক) i ও ii
খ) ii ও iii
গ) i ও iii
ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। 'ক' নামক সামাজিক সংগঠনটি সামাজিক চিরাচরিত নিয়ম কানুন অনুযায়ী পরিচালিত হয় এবং নিয়মগুলো কোথাও লিপিবদ্ধ করা হয়নি। সংগঠনের মাঝে কোনো সমস্যা দেখা দিলে তারা প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী আলাপ আলোচনার মাধ্যমে তা নিষ্পত্তি করে। পক্ষান্তরে 'খ' নামক উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক স্কুল পরিচালনায় সুস্পষ্টভাবে লিখিত নিয়মকানুন মেনে স্কুল পরিচালনা করেন। যেকোনো নীতিমালা তৈরি বা শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সক্ষম হন। মাঝে মাঝে লিখিত নিয়ম কানুনের ব্যাখ্যা নিয়ে সমস্যা দেখা দেয়।

ক. ১২১৫ সালে ইংল্যাণ্ডের রাজা জন যে অধিকার সনদ প্রণয়ন করেছিলেন তার নাম কী?

খ. সংবিধান প্রণয়ন প্রয়োজন কেন? ব্যাখ্যা কর।

গ. 'ক' সংগঠনটি পরিচালনার নিয়মাবলি কোন ধরনের সংবিধানের বৈশিষ্ট্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তা আলোচনা কর।

ঘ. 'ক' ও 'খ' প্রতিষ্ঠান দুটির পরিচালনার নিয়মাবলির মধ্যে তুমি কোনটিকে উত্তম বলে মনে কর তার পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন কর।

২। একই ভাষা, সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক ক্ষমতা এবং ধর্মীয় নিরপেক্ষতার ভিত্তিতে 'ক' রাষ্ট্রের সংবিধান রচনা করা হলো। এ রাষ্ট্রের সংবিধানে রাষ্ট্রের সকল কাজে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে। উক্ত রাষ্ট্রের আইন সভায় একটি বিল পাসের ব্যাপারে আইন সভার মোট ২১০ জন সদস্যের মধ্যে ১৪০ জনের সম্মতি না থাকায় বিলটি বাতিল হয়ে যায়।

ক. বাংলাদেশের সংবিধান কত তারিখে কার্যকর হয়?

খ. অলিখিত সংবিধান বলতে কী বোঝায়।

গ. সংশোধনের ভিত্তিতে 'ক' রাষ্ট্রের সংবিধান কোন শ্রেণির? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'ক' রাষ্ট্রের সংবিধানে বাংলাদেশের সংবিধানের বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন লক্ষ করা যায়–বিশ্লেষণ কর।

ষষ্ঠ অধ্যায়
বাংলাদেশের সরকারব্যবস্থা

'সরকার' আমাদের অতি পরিচিত একটি শব্দ। বিশ্বের সব দেশেই কোনো না কোনো সরকারব্যবস্থা রয়েছে। সরকার কাকে বলে সে সম্পর্কে আমরা চতুর্থ অধ্যায়ে জেনেছি। মূলত সরকারের দ্বারা একটি দেশের শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয়। সকল দেশে সরকার থাকলেও তা একরকম নয়। এ অধ্যায়ে আমরা আমাদের দেশের সরকার-পদ্ধতি সম্পর্কে জানব।

এ অধ্যায় পড়া শেষে আমরা -

- বাংলাদেশ সরকারের স্বরূপ উল্লেখ করতে পারব।
- বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার ক্ষমতা ও কার্যাবলি বর্ণনা করতে পারব।
- বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামো বর্ণনা করতে পারব।
- বাংলাদেশের আইনসভার গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলি বর্ণনা করতে পারব।
- বাংলাদেশের বিচার বিভাগের গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলি বর্ণনা করতে পারব।

বাংলাদেশ সরকারের স্বরূপ

স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল বাংলাদেশের প্রথম সরকার গঠিত হয়। বাংলাদেশ একটি গণপ্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এই রাষ্ট্রে সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ। এ ছাড়া বাংলাদেশ একটি এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রও। আমাদের দেশে সংসদীয় পদ্ধতির সরকারব্যবস্থা চালু রয়েছে। এ ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ব্যক্তি। তবে দেশের প্রকৃত শাসন ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর মন্ত্রিপরিষদের হাতে ন্যস্ত।

মন্ত্রিপরিষদই এখানে প্রকৃত শাসন ক্ষমতার অধিকারী এবং প্রধানমন্ত্রী হলেন সরকারপ্রধান। তাঁর নেতৃত্বে মন্ত্রিপরিষদ দেশের শাসনকার্য পরিচালনা করে।

দলীয় কাজ : বাংলাদেশ সরকারের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করে একটি চার্ট/ধারণা মানচিত্র তৈরি কর।

বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন বিভাগ

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সরকারব্যবস্থার মতো বাংলাদেশ সরকারের তিনটি বিভাগ আছে। সেগুলো হচ্ছে : (১) শাসন বিভাগ (২) আইন বিভাগ ও (৩) বিচার বিভাগ। নিচে এদের গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলি সম্পর্কে আমরা জানব।

শাসন বিভাগ

শাসন বিভাগকে নির্বাহী বিভাগও বলা হয়ে থাকে। এটি মূলত রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিপরিষদ নিয়ে গঠিত।

রাষ্ট্রপতি

বাংলাদেশের শাসন বিভাগের সর্বোচ্চ ব্যক্তি হলেন রাষ্ট্রপতি। তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান। তবে রাষ্ট্রপ্রধান হলেও তিনি আসলে নামমাত্র প্রধান। দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া প্রধানমন্ত্রীর

পরামর্শক্রমে তিনি রাষ্ট্রের সকল কাজ পরিচালনা করেন। রাষ্ট্রপতি জাতীয় সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের ভোটে নির্বাচিত হন। তার কার্যকাল পাঁচ বছর। রাষ্ট্রপতি পুনর্নির্বাচিত হতে পারেন। তবে কোনো ব্যক্তি পর পর দুই মেয়াদ অর্থাৎ একটানা ১০ বছরের বেশি রাষ্ট্রপতি পদে থাকতে পারেন না। রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালনকালে তার বিরুদ্ধে আদালতে কোনো অভিযোগ আনা যায় না। তবে সংবিধান লঙ্ঘন বা গুরুতর কোনো অভিযোগে জাতীয় সংসদ অভিশংসনের (অপসারণ পদ্ধতি) মাধ্যমে তাকে মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই অপসারণ করতে পারে।

রাষ্ট্রপতি হতে হলে কোনো ব্যক্তিকে অবশ্যই বাংলাদেশের নাগরিক ও কমপক্ষে ৩৫ বছর বয়স্ক হতে হবে। এছাড়া তাঁর জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতা থাকতে হবে। যদি কেউ রাষ্ট্রপতির পদ থেকে অপসারিত হন তাহলে তিনি আর রাষ্ট্রপতি হতে পারবেন না।

জোড়ায় কাজ : রাষ্ট্রপতির প্রধান যোগ্যতাগুলোর তালিকা তৈরি কর ও নিয়োগ পদ্ধতি আলোচনা কর।

রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও কাজ

রাষ্ট্রপতি অনেক দায়িত্ব পালন করেন। তার ক্ষমতা ও কার্যক্রম নিম্নরূপ :

১. রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের প্রধান। সরকারের সকল শাসনসংক্রান্ত কাজ তাঁর নামে পরিচালিত হয়। তিনি প্রধানমন্ত্রীকে নিয়োগ করেন। অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীদের নিয়োগ করেন। রাষ্ট্রের শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তাদের (মহাহিসাব রক্ষক, রাষ্ট্রদূত ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা) নিয়োগের দায়িত্বও রাষ্ট্রপতির। তিনি সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান। তিন বাহিনীর (সেনা, বিমান ও নৌবাহিনী) প্রধানদের তিনিই নিয়োগ দেন। তবে প্রধানমন্ত্রী ও প্রধান বিচারপতি নিয়োগ ছাড়া অন্যান্য সব কাজ তিনি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে করেন।

২. রাষ্ট্রপতি কিছু আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কাজ করেন। তিনি জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহ্বান করতে, স্থগিত রাখতে ও প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে সংসদ ভেঙে দিতে পারেন। তিনি সংসদে ভাষণ দিতে ও বাণী পাঠাতে পারেন। সংসদ কর্তৃক গৃহীত কোনো বিলে তিনি সম্মতি দান করলে বা সম্মতিদান করেছেন বলে গণ্য হলে বিলটি আইনে পরিণত হয়।

৩. রাষ্ট্রপতির সম্মতি ছাড়া কোনো অর্থ বিল সংসদে উত্থাপন করা যায় না। কোনো কারণে সংসদ কোনো ক্ষেত্রে অর্থ মঞ্জুর করতে অসমর্থ হলে রাষ্ট্রপতি ৬০ দিনের জন্য সংশ্লিষ্ট তহবিল হতে অর্থ মঞ্জুর করতে পারেন।

৪. রাষ্ট্রপতি সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং তাঁর সাথে পরামর্শ করে আপিল ও হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতিদের নিয়োগ করেন। তিনি কোনো আদালত বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির সাজা হ্রাস বা মওকুফ করতে পারেন।

৫. রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের সকল সম্মানের উৎস। তার অনুমতি ছাড়া দেশের কোনো নাগরিক অন্য কোনো দেশের দেওয়া কোনো সম্মান বা পদবি গ্রহণ করতে পারে না।

৬. যুদ্ধ বা অন্য দেশ কর্তৃক আক্রান্ত হলে বা অভ্যন্তরীণ গোলযোগের কারণে দেশের নিরাপত্তা বা শান্তি বিনষ্ট হওয়ার উপক্রম হলে রাষ্ট্রপতি জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন। তবে এ ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর সম্মতি প্রয়োজন হয়।

৭. এ ছাড়া রাষ্ট্রপতি আরও অনেক দায়িত্ব পালন করেন। তিনি জাতীয় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। দেশের বরেণ্য ব্যক্তিদের খেতাব, পদক ও সম্মাননা প্রদান করতে পারেন। বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় চুক্তি, দলিল তাঁর নির্দেশে সম্পাদিত হয়। তিনি বাংলাদেশে নিযুক্ত বিদেশি কূটনীতিকদের পরিচয়পত্র গ্রহণ করেন। প্রধানমন্ত্রী, অন্যান্য মন্ত্রী ও বিচারপতিদের শপথবাক্য পাঠ করান।

জোড়ায় কাজ : শিক্ষার্থীরা রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও কাজের প্রধান ক্ষেত্রগুলো নিচের ছকে লিখ।

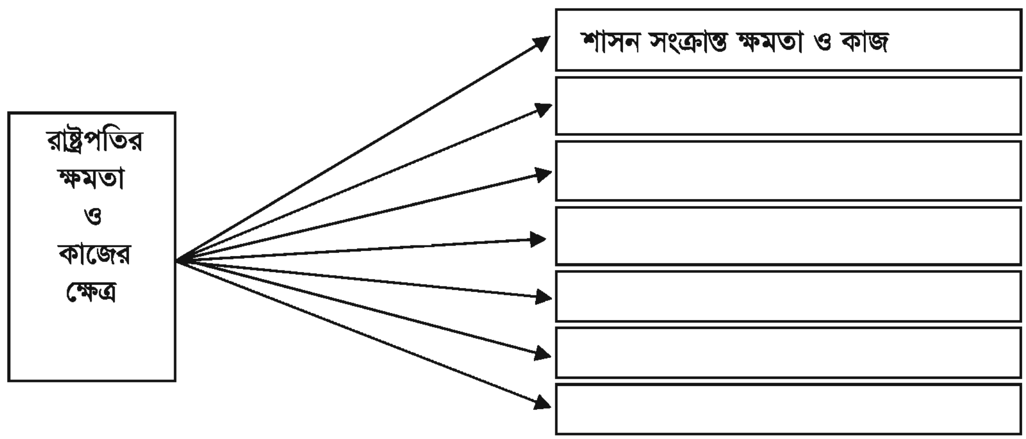

প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিপরিষদের কেন্দ্রবিন্দু এবং সরকারপ্রধান। তাঁকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের শাসনকার্য পরিচালিত হয়। প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর মন্ত্রিসভা দেশের প্রকৃত শাসক। জাতীয় সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের আস্থাভাজন ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দেন। যেমন- ২০০৮ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পায়। ফলে রাষ্ট্রপতি আওয়ামী লীগ প্রধান ও সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সমর্থনপুষ্ট শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন। এর আগে ২০০১ সালে একইভাবে বেগম খালেদা জিয়াকে দেশের প্রধানমন্ত্রী করা হয়েছিল। কোনো দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলে সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি নিজের বিচার-বিবেচনা অনুযায়ী জাতীয় সংসদের যেকোনো সদস্যকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করবেন।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যকাল পাঁচ বছর। তবে, তার আগে কোনো কারণে সংসদ তার বিরুদ্ধে অনাস্থা আনলে এবং তা সংসদে গৃহীত হলে প্রধানমন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে হয়। প্রধানমন্ত্রী স্বেচ্ছায়ও পদত্যাগ করতে পারেন। প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করলে তার মন্ত্রিসভাও ভেঙে যায়। তাই প্রধানমন্ত্রীকে সরকারের স্তম্ভ বলা হয়। তিনি একসাথে সংসদের নেতা, মন্ত্রিসভার নেতা এবং সরকারপ্রধান।

জোড়ায় কাজ : রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর নিয়োগ পদ্ধতির পার্থক্য আলোচনা কর ।

প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কাজ

প্রধানমন্ত্রীকে বহুবিধ কাজ সম্পাদন করতে হয় । যেমন -

১. সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির নামে দেশের শাসন পরিচালিত হলেও আসলে প্রধানমন্ত্রী প্রকৃত শাসনক্ষমতার অধিকারী । মন্ত্রিপরিষদের সহযোগিতায় তিনি শাসনসংক্রান্ত সকল দায়িত্ব পালন করেন । তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি মন্ত্রী, রাষ্ট্রের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, বিদেশে রাষ্ট্রদূত ইত্যাদি নিয়োগ দেন ।

২. প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিপরিষদের প্রধান । তিনি মন্ত্রিসভার সদস্যসংখ্যা নির্ধারণ করেন ও মন্ত্রীদের মধ্যে দপ্তর বণ্টন করেন । মন্ত্রীদের কাজ তদারক করেন । বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কাজের মধ্যে সমন্বয় করেন । সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মন্ত্রীগণ প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ও অনুমোদন নিয়ে কাজ করেন । তিনি যেকোনো মন্ত্রীকে তার পদ থেকে অপসারণের পরামর্শ দিতে পারেন । মোটকথা তাকে কেন্দ্র করে মন্ত্রিসভা গঠিত, পরিচালিত ও বিলুপ্ত হয় ।

৩. প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ ও পরামর্শে অর্থমন্ত্রী বাংলাদেশের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের (জাতীয়) বাজেট প্রণয়ন ও সংসদে উপস্থাপন করেন ।

৪. প্রধানমন্ত্রী জাতীয় সংসদের একজন সদস্য ও সংসদ নেতা । তিনি সংসদে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন । তার নেতৃত্বে সংসদে আইন প্রণয়ন করা হয় । তিনি জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহ্বান, স্থগিত বা ভেঙে দিতে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দেন । এভাবে তিনি আইন প্রণয়নসংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে থাকেন ।

৫. পররাষ্ট্র বিষয়ে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করেন । প্রধানমন্ত্রীর সম্মতি ছাড়া কোনো আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদিত হতে পারে না । আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তিনি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করেন ।

৬. দেশের জরুরি অবস্থায় প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্ত ছাড়া যেকোনো নির্দেশ দিতে পারেন ।

৭. প্রধানমন্ত্রী জাতীয় স্বার্থের রক্ষক । জাতীয় স্বার্থে তিনি বিভিন্ন সময়ে বক্তৃতা ও বিবৃতির মাধ্যমে জনগণকে রাষ্ট্রীয় কর্মসূচি সম্পর্কে অবহিত করেন ও জনগণের মধ্যে সংহতি রক্ষায় কাজ করেন ।

জোড়ায় কাজ : প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কার্যাবলির প্রধান ক্ষেত্রগুলো নিচের ছকে লিখ ।

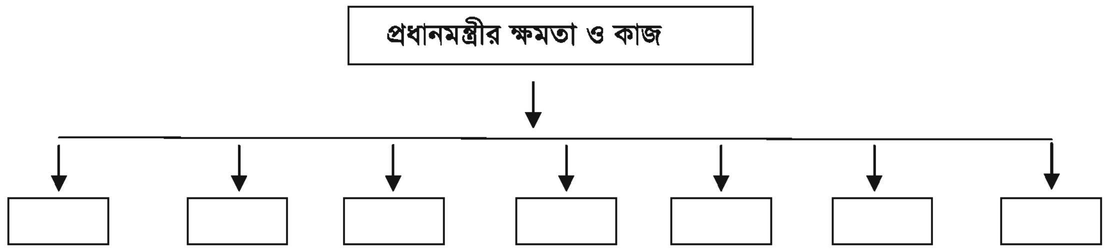

বাংলাদেশে সংসদীয় পদ্ধতির সরকারব্যবস্থা থাকায় প্রধানমন্ত্রীকে কেন্দ্র করেই দেশ, জাতি ও সরকার পরিচালিত হয় । তিনি রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার মধ্যমণি ।

প্যানেল আলোচনা : 'প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার মধ্যমণি' বিষয়টি সম্পর্কে ৪/৫ জন শিক্ষার্থী প্যানেল আলোচনা কর । অন্য শিক্ষার্থীরাও আলোচনায় অংশ নাও ।

দলীয় কাজ : রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কার্যের তুলনামূলক ছক তৈরি করে শ্রেণিতে উপস্থাপন কর।

মন্ত্রিপরিষদ

সরকার পরিচালনার জন্য দেশে একটি মন্ত্রিপরিষদ আছে । প্রধানমন্ত্রী এর নেতা । তিনি যেরূপ সংখ্যক প্রয়োজন মনে করেন, সেরূপ সংখ্যক মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীকে নিয়ে মন্ত্রিপরিষদ গঠন করেন । মন্ত্রিপরিষদের মন্ত্রীগণ সাধারণত সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকে নিযুক্ত হন । সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার যোগ্য কিন্তু সংসদ সদস্য নন এমন ব্যক্তিও মন্ত্রী নিযুক্ত হতে পারেন । তবে তার সংখ্যা মন্ত্রিপরিষদের মোট সদস্য সংখ্যার এক-দশমাংশের বেশি হবে না । প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিসভার সদস্যদের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন করেন । মন্ত্রিসভার সদস্যগণ একক ও যৌথভাবে সংসদের নিকট দায়ী থেকে দায়িত্ব পালন করেন । প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করলে বা কোনো কারণে সংসদ ভেঙে গেলে মন্ত্রিসভাও ভেঙে যায় । প্রধানমন্ত্রী ইচ্ছে করলে মন্ত্রিসভার যেকোনো মন্ত্রীর দপ্তর পরিবর্তন করতে পারেন । আবার যে কোনো মন্ত্রী ইচ্ছে করলে মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করতে পারেন ।

মন্ত্রিপরিষদের ক্ষমতা ও কার্যাবলি

মন্ত্রিপরিষদ দেশের শাসনসংক্রান্ত সব কাজ পরিচালনা করার ক্ষমতার অধিকারী । দেশের শাসনব্যবস্থার চারদিকে রয়েছে এর নিয়ন্ত্রণ । এখন আমরা এর ক্ষমতা ও কার্যাবলি সম্পর্কে জানব ।

১. মন্ত্রিসভার সদস্যগণ প্রধানমন্ত্রীর সহকর্মী হিসেবে দেশের সকল শাসনসংক্রান্ত ক্ষমতা ভোগ ও কার্য পরিচালনা করেন । মন্ত্রীগণ নিজ নিজ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করেন । মন্ত্রিসভার ব্যর্থতার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে সংসদের নিকট জবাবদিহি করতে হয় ।

২. প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিপরিষদের নিয়মিত সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় দেশের শাসনসংক্রান্ত সকল বিষয় (যেমন আইন-শৃংখলা রক্ষা, অর্থনৈতিক অগ্রগতি, বৈদেশিক সম্পর্ক, বাণিজ্য, প্রতিরক্ষা, দ্রব্যমূল্য ও খাদ্য পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি) আলোচিত হয় এবং এসব বিষয়ে প্রয়োজনীয় নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

৩. মন্ত্রিপরিষদ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কাজের মধ্যে সমন্বয় করে থাকে।

৪. আইন প্রণয়ন বা পুরাতন আইন সংশোধন এবং জাতীয় সংসদে নেতৃত্ব দেওয়া মন্ত্রিপরিষদের অন্যতম প্রধান কাজ। এ ছাড়া মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণ নিজ নিজ বিভাগ/মন্ত্রণালয়ের প্রয়োজন অনুযায়ী আইনের খসড়া তৈরি করে জাতীয় সংসদ কর্তৃক অনুমোদনের জন্য বিল আকারে উপস্থাপন করেন এবং তা পাস করানোর জন্য কার্যকর ভূমিকা পালন করেন।

৫. প্রতিবছর সরকার দেশ পরিচালনার জন্য বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন করে। অর্থমন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে খসড়া বাজেট প্রণীত হয়। মন্ত্রিপরিষদের অন্যান্য সদস্যগণ এ বিষয়ে সহযোগিতা করেন। খসড়া বাজেট সংসদে উপস্থাপন করে অনুমোদন করানো মন্ত্রিপরিষদের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

৬. দেশের সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তা রক্ষা মন্ত্রিপরিষদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। দেশের প্রতিরক্ষা বাহিনী গঠনের দায়িত্ব মন্ত্রিসভার। মূলত মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি দেশরক্ষা বাহিনীর প্রধানকে নিয়োগ দেন। দেশের ভিতরে শান্তি-শৃংখলা রক্ষা ও জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাও এর কাজ।

৭. প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিপরিষদ বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ করে। বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাথে চুক্তি সম্পাদন, কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন, আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার দায়িত্ব মন্ত্রিপরিষদের। জাতীয় স্বার্থ ও মর্যাদা ঠিক রেখে মন্ত্রিপরিষদ এসব কাজ করে।

৮. মন্ত্রিপরিষদ সরকার ও জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে। সরকারের নীতি জনগণের কাছে তুলে ধরে এবং ঐসব নীতির পিছনে জনগণের সমর্থন আদায় করে।

জোড়ায় কাজ : মন্ত্রিপরিষদের ক্ষমতা ও কার্যাবলির প্রধান দিকগুলো নিচের ছকে লিখ।

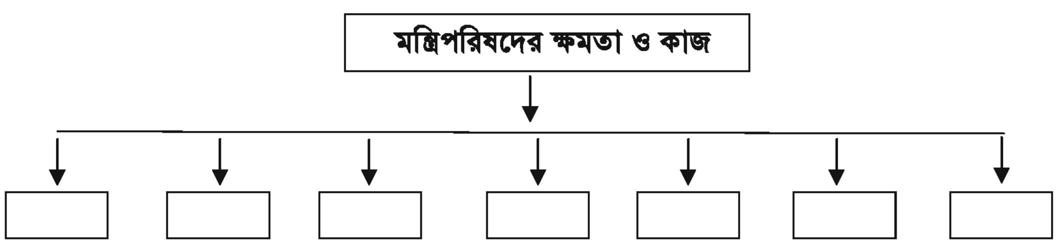

দলীয় কাজ : দলে ভাগ হয়ে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিপরিষদের ক্ষমতা ও কাজের উপর কুইজ প্রতিযোগিতা আয়োজন কর।

বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামো

রাষ্ট্রের শাসনকার্য পরিচালনার দায়িত্ব প্রশাসনের। রাষ্ট্রের ভিতরে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ও রাষ্ট্রের সমৃদ্ধির লক্ষ্যে সুষ্ঠু প্রশাসনের কোনো বিকল্প নেই। প্রশাসনকে তাই বলা হয় রাষ্ট্রের হৃৎপিণ্ড। প্রশাসন একটি নির্দিষ্ট কাঠামোর ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। নিচে বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামো ছকের সাহায্যে তুলে ধরা হলো।

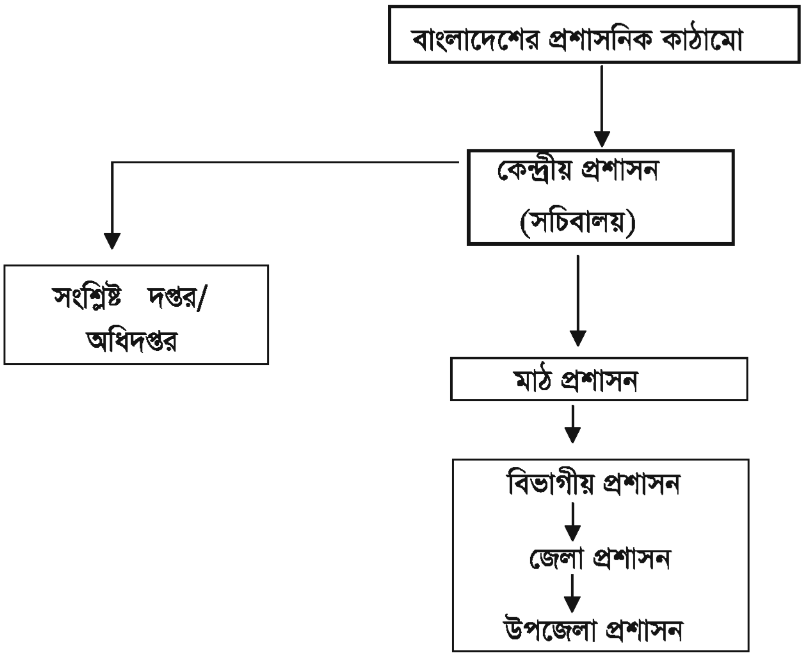

উপরের ছকে লক্ষ করা যাচ্ছে যে বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামো স্তরভিত্তিক। এর দুটি প্রধান স্তর আছে। প্রথম স্তরটি হলো কেন্দ্রীয় প্রশাসন। বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের দ্বিতীয় স্তরটি হলো মাঠ প্রশাসন। মাঠ প্রশাসনের প্রথম ধাপ হলো বিভাগীয় প্রশাসন। দ্বিতীয় ধাপে রয়েছে জেলা প্রশাসন। জেলার পর আছে উপজেলা প্রশাসন। উপজেলা প্রশাসন একেবারে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত।

দেশের সব ধরনের প্রশাসনিক নীতি ও সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় পর্যায়ে গ্রহণ করা হয়। আর কেন্দ্রীয় পর্যায়ে গৃহীত নীতি ও সিদ্ধান্ত মাঠ প্রশাসনের মাধ্যমে সারা দেশে বাস্তবায়িত হয়। মাঠ প্রশাসন মূলত কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হয়ে থাকে।

এছাড়া প্রতি মন্ত্রণালয়ের সাথে সংযুক্ত আছে বিভিন্ন বিভাগ বা অধিদপ্তর। অধিদপ্তরের/দপ্তরের প্রধান হলেন মহাপরিচালক/পরিচালক। মন্ত্রণালয়ের অধীনে আরও আছে বিভিন্ন স্বায়ত্তশাসিত বা আধা-স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, বোর্ড ও কর্পোরেশন। এসব দপ্তর ও অফিসের কোনো কোনোটির কার্যকলাপ আবার বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যন্ত বিস্তৃত। দপ্তর/অধিদপ্তরগুলো সচিবালয়ের লাইন সংস্থা হিসেবে বিভিন্ন সরকারি কাজ বাস্তবায়নে দায়িত্ব পালন করে।

দলীয় কাজ : বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামোর ছকটি বিশ্লেষণ কর ও উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর।

কেন্দ্রীয় প্রশাসন

সচিবালয় কেন্দ্রীয় প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দু। দেশের সকল প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত এখানে গৃহীত হয়। সচিবালয় কয়েকটি মন্ত্রণালয় নিয়ে গঠিত। এক একটি মন্ত্রণালয় এক একজন মন্ত্রীর অধীনে ন্যস্ত। প্রতিটি মন্ত্রণালয়ে একজন সচিব আছেন। তিনি মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক প্রধান এবং মন্ত্রীর প্রধান পরামর্শদাতা। মন্ত্রণালয়ের সকল প্রশাসনিক ক্ষমতা সচিবের হাতে। মন্ত্রীর প্রধান কাজ প্রকল্প প্রণয়ন ও নীতি নির্ধারণ। আর মন্ত্রীকে নীতি নির্ধারণে ও শাসনকার্যে সহায়তা করা এবং এসব নীতি বাস্তবায়নের দায়িত্ব সচিবের।

সচিবালয়ের প্রশাসনিক কাঠামো

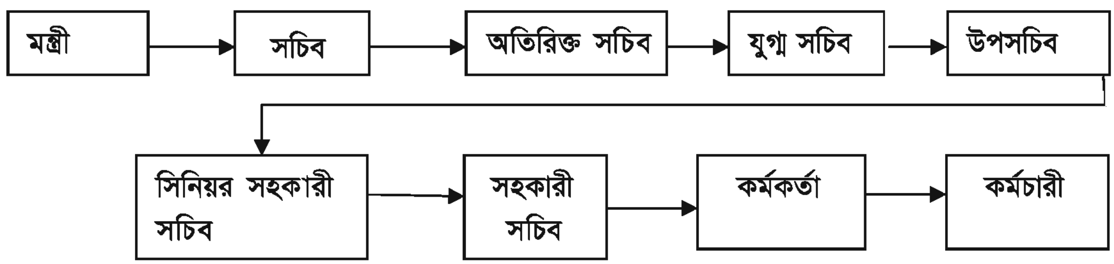

অতিরিক্ত সচিব মন্ত্রণালয়ের দ্বিতীয় প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা। তিনি সচিবকে বিভিন্ন দায়িত্ব পালনে সহায়তা করেন। কোনো মন্ত্রণালয়ে সচিব না থাকলে তিনি সচিবের দায়িত্ব পালন করেন। মন্ত্রণালয়ের প্রতিটি অণুবিভাগের জন্য একজন করে যুগ্ম সচিব থাকেন। তিনি সচিবকে বিভিন্ন কাজে সহায়তা করেন। মন্ত্রণালয়ের কর্মচারী এবং অফিস ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করেন। মন্ত্রণালয়ের এক বা একাধিক শাখার দায়িত্বে থাকেন একজন উপসচিব। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে নীতি নির্ধারণে যুগ্ম সচিব ও অতিরিক্ত সচিবকে পরামর্শ দেন ও সহযোগিতা করেন।

প্রতি শাখায় একজন সিনিয়র সহকারী সচিব ও একজন সহকারী সচিব রয়েছেন। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে উপসচিবের সাথে পরামর্শ করে তাঁরা দায়িত্ব পালন করেন। মন্ত্রণালয়ে আরও বিভিন্ন ধরনের কর্মকর্তা ও কর্মচারী রয়েছেন। তাঁরাও মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কার্য পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

উল্লেখ্য, সরকারের কয়টি মন্ত্রণালয় থাকবে এবং একটি মন্ত্রণালয়ে কতজন অতিরিক্ত সচিব, যুগ্ম সচিব, উপসচিব এবং সিনিয়র সহকারী সচিব ও সহকারী সচিব থাকবেন তার নির্দিষ্ট কোনো সংখ্যা নেই। সরকার ও মন্ত্রণালয়ের কাজের পরিধি অনুযায়ী তাদের সংখ্যা নির্ধারিত হয়ে থাকে।

বিভাগীয় প্রশাসন

বাংলাদেশে আটটি বিভাগ আছে। প্রতিটি বিভাগের প্রশাসনিক প্রধান হলেন একজন বিভাগীয় কমিশনার। কেন্দ্রের প্রতিনিধি হিসেবে তিনি বিভাগের প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করেন। তিনি তাঁর কাজের জন্য কেন্দ্রের নিকট দায়ী থাকেন।

বিভাগীয় কমিশনার জেলা প্রশাসকদের কাজ তদারক করেন। বিভাগের উন্নয়নমূলক কাজ বাস্তবায়ন ও তত্ত্বাবধান করেন। ভূমি রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা করেন ও খাস জমির তদারক করেন। তিনি জেলা প্রশাসকদের বদলি করতে পারেন। বিভাগের ক্রীড়া উন্নয়ন, শিল্পকলা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির উন্নয়নে কাজ করেন। জনকল্যাণ ও সেবামূলক কাজ পরিচালনা করেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেন।

জেলা প্রশাসন

জেলা প্রশাসন মাঠ বা স্থানীয় প্রশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর। এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হলেন জেলা প্রশাসক। দেশের সব জেলায় একজন করে জেলা প্রশাসক আছেন। তিনি বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের একজন অভিজ্ঞ সদস্য। তাকে কেন্দ্র করে জেলার সকল সরকারি কাজ পরিচালিত হয়। নিচে তার কাজগুলো সম্পর্কে জানব।

১. **প্রশাসনিক কাজ :** জেলা প্রশাসক কেন্দ্র থেকে আসা সকল আদেশ-নির্দেশ ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করেন। জেলার বিভিন্ন অফিসের কাজ তদারক ও সমন্বয় করেন। জেলার বিভিন্ন শূন্য পদে লোক নিয়োগ করেন।

২. **রাজস্বসংক্রান্ত ও আর্থিক কাজ :** জেলা প্রশাসক জেলা কোষাগারের রক্ষক ও পরিচালক। জেলার সব ধরনের রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব তার, সে কারণে তিনি কালেকটর নামে পরিচিত। এ ছাড়া তিনি ভূমি উন্নয়ন, রেজিস্ট্রেশন ও রাজস্বসংক্রান্ত বিবাদ মীমাংসা করে থাকেন।

৩. **আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাসংক্রান্ত কাজ :** জেলার মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা ও জনগণের জীবনের নিরাপত্তা প্রদানের দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত। তিনি পুলিশ প্রশাসনের সাহায্যে এ দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

৪. **উন্নয়নমূলক কাজ :** জেলা প্রশাসক জেলার সার্বিক উন্নয়নের চাবিকাঠি। জেলার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ (শিক্ষা, কৃষি, শিল্প, রাস্তাঘাট ও যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়ন ইত্যাদি) বাস্তবায়নের দায়িত্বও তাঁর। তিনি জেলায় প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেন।

৫. **স্থানীয় শাসনসংক্রান্ত কাজ :** জেলা প্রশাসক স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোর (উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা, ইউনিয়ন) কাজ তত্ত্বাবধান করেন। তিনি জেলার অধীনস্থ সকল বিভাগ ও সংস্থার কাজের সমন্বয় করেন।

জেলা প্রশাসনের সর্বোচ্চ ব্যক্তি হিসেবে তিনি আরও অনেক দায়িত্ব পালন করেন। তিনি জেলার সংবাদপত্র ও প্রকাশনা বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করেন। বিভিন্ন জিনিসের লাইসেন্স দেন। জেলার বিভিন্ন বিষয়ের তথ্য সংগ্রহ করেন এবং সে সম্পর্কে সরকারকে অবহিত করেন।

জেলা প্রশাসকের ব্যাপক কাজের জন্য তাকে জেলার 'মূল স্তম্ভ' বলা হয়। তিনি শুধু জেলা প্রশাসক নন। তিনি জেলার সেবক, পরিচালক এবং বন্ধুও বটে।

উপজেলা প্রশাসন

বাংলাদেশে মোট ৪৯২টি প্রশাসনিক উপজেলা আছে। উপজেলার প্রধান প্রশাসক হলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা। উপজেলার প্রশাসনিক কাজ তদারক করা তাঁর অন্যতম দায়িত্ব। এছাড়া তিনি উপজেলার সকল উন্নয়নকাজ তদারক করেন ও সরকারি অর্থের ব্যয় তত্ত্বাবধান করেন। তিনি উপজেলা উন্নয়ন কমিটির প্রধান।

প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেন। দুর্যোগ প্রতিরোধ ও প্রতিকারের ব্যবস্থা করেন। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উপজেলা কোষাগারের রক্ষক। বিভিন্ন সময়ে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্বও তিনি সম্পাদন করেন।

দলীয় কাজ : বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামোর ছক এঁকে শ্রেণিকক্ষের দেয়ালে বা বোর্ডে ঝুলিয়ে এক একটি দল এক একটি স্তর/ধাপ সম্পর্কে আলোচনা কর।

বাংলাদেশের আইনসভা

গঠন

সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে আইনসভা অন্যতম। বাংলাদেশের আইনসভার নাম জাতীয় সংসদ। এটি এক কক্ষবিশিষ্ট। সদস্যসংখ্যা ৩৫০। এর মধ্যে ৩০০ আসনের সদস্যগণ জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। বাকি ৫০টি আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত। এলাকাভিত্তিক সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্যগণ ৩০০টি আসনের নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হন। তবে মহিলারা ইচ্ছে করলে ৩০০ আসনের যেকোনোটিতে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমেও নির্বাচিত হতে পারেন।

সংসদে একজন স্পিকার ও একজন ডেপুটি স্পিকার থাকেন। তাঁরা সংসদ সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত হন। তাঁদের কাজ সংসদ অধিবেশন পরিচালনা করা। সংসদের কার্যকাল পাঁচ বছর। এর পূর্বেও রাষ্ট্রপতি প্রয়োজনে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে সংসদ ভেঙে দিতে পারেন। সংসদের একটি অধিবেশন সম্পন্ন হওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে আরেকটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হতে হয়। মোট সদস্য সংখ্যার মধ্যে কমপক্ষে ৬০ জন উপস্থিত থাকলে কোরাম হয় এবং সংসদ অধিবেশন পরিচালনা করা যায়। প্রধানমন্ত্রী সংসদের নেতা। আসনসংখ্যার দিক দিয়ে নির্বাচনে দ্বিতীয় স্থান অর্জনকারী দলের প্রধান সংসদে বিরোধী দলের নেতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বিভিন্ন কমিটি গঠন করে সংসদ তার কার্যক্রম সম্পাদন করে। সংসদের অনুমতি ছাড়া একনাগাড়ে ৯০ বৈঠক দিবস সংসদ অধিবেশনে অনুপস্থিত থাকলে সদস্যপদ বাতিল হয়ে যায়।

পাঁচ বছর পর পর জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ন্যূনতম ২৫ বছর বয়সী বাংলাদেশের যেকোনো নাগরিক সংসদ সদস্য নির্বাচিত হতে পারেন। তবে কেউ আদালত দ্বারা দেউলিয়া বা অপ্রকৃতিস্থ ঘোষিত হলে বা অন্য রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব নিলে বা আদালতে দোষী সাব্যস্ত হয়ে কারাদণ্ড ভোগ করলে সংসদ সদস্য হওয়ার অযোগ্য হবেন।

কাজ : নিজেদের মধ্যে উন্মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে বোর্ডে জাতীয় সংসদের গঠন সম্পর্কে একটি ধারণা মানচিত্র প্রস্তুত কর।

জাতীয় সংসদের ক্ষমতা ও কার্যাবলি

জাতীয় সংসদের ক্ষমতা ও কার্যাবলি নিম্নরূপ :

১. বাংলাদেশের আইন প্রণয়নের সব ক্ষমতা জাতীয় সংসদের। সংসদ যেকোনো নতুন আইন প্রণয়ন,

প্রচলিত আইনের পরিবর্তন বা সংশোধন করতে পারে। কোনো নতুন আইন পাস করতে হলে খসড়া বিলের আকারে তা সংসদে পেশ করা হয়। সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের ভোটে গৃহীত হলে বিলটি আইনে পরিণত হয়।

২. শাসন বিভাগকে সংসদ নিয়ন্ত্রণ করে। প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার সদস্যগণ সংসদের নিকট দায়ী থাকেন। কোনো কারণে সংসদ প্রধানমন্ত্রীর প্রতি অনাস্থা আনলে মন্ত্রিসভা ভেঙে যায়। মুলতুবি প্রস্তাব, নিন্দা প্রস্তাব, অনাস্থা প্রস্তাব, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, সংসদীয় বিভিন্ন কমিটি ও সংসদে সাধারণ আলোচনার মাধ্যমে জাতীয় সংসদ শাসন বিভাগের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। এ ক্ষেত্রে বিরোধী দলের সদস্যগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন।

৩. জাতীয় সংসদ রাষ্ট্রের তহবিল বা অর্থের রক্ষাকারী। সংসদের অনুমতি ছাড়া কোনো কর বা খাজনা আরোপ ও আদায় করা যায় না। সংসদ প্রতিবছর জাতীয় বাজেট পাস করে। অর্থমন্ত্রী বাজেটের খসড়া সংসদে উপস্থাপন করেন। সংসদ সদস্যগণ দীর্ঘ বিতর্ক ও আলোচনার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সংশোধনীসহ তা পাস করেন।

৪. জাতীয় সংসদের বিচারসংক্রান্ত ক্ষমতা রয়েছে। কোনো সংসদ সদস্য অসংসদীয় আচরণ করলে স্পিকার তাঁকে বহিষ্কার করতে পারেন। তাছাড়া সংবিধান লঙ্ঘন করলে সংসদ স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিসভা ও রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনতে বা তাঁদের অপসারণ করতে পারে।

৫. সংসদ সংবিধানে উল্লিখিত নিয়মের ভিত্তিতে সংবিধান সংশোধন করতে পারে। তবে এজন্য সংসদের মোট সদস্যের কমপক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ ভোটের দরকার হয়।

৬. জাতীয় সংসদের সদস্যগণ সংসদের স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার এবং সংসদের বিভিন্ন কমিটির সদস্যদের নির্বাচিত করেন। সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্যগণও সংসদ সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হয়ে থাকেন। এ ছাড়া সংসদ সদস্যগণ দেশের রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচন করে থাকেন।

বাংলাদেশে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার রয়েছে। এ ধরনের শাসনব্যবস্থায় সংসদ সকল জাতীয় কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু। সংসদকে অর্থবহ ও কার্যকর করতে হলে প্রয়োজন সৎ এবং যোগ্যতাসম্পন্ন সংসদ সদস্য। সংসদে আরও প্রয়োজন দায়িত্বশীল ও শক্তিশালী বিরোধী দল। সৎ ও যোগ্য প্রার্থীগণ যাতে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন, সে বিষয়ে আমাদের সচেতন থাকতে হবে। দেশের কল্যাণের জন্য উপযুক্ত সংসদ সদস্য নির্বাচন করা প্রতিটি নাগরিকের পবিত্র দায়িত্ব।

কাজ - অভিনয় : জাতীয় সংসদে বিল পাস করার প্রক্রিয়ার ওপর শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে একটি সংসদীয় অধিবেশন আয়োজন কর।

দলীয় কাজ : জাতীয় সংসদের ক্ষমতা ও কাজের প্রধান দিকগুলো উল্লেখপূর্বক একটি ছক তৈরি করে শ্রেণিতে আলোচনা কর। একেক দল একেক ধরনের কাজ সম্পর্কে আলোচনা কর।

বাংলাদেশের বিচার বিভাগ

বাংলাদেশ সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে বিচার বিভাগ অন্যতম। নাগরিকের মৌলিক অধিকার রক্ষা, ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা, অপরাধীর শাস্তিবিধান এবং দুর্বলকে সবলের হাত থেকে রক্ষার জন্য নিরপেক্ষ বিচার বিভাগের গুরুত্ব অপরিসীম। বিচার বিভাগ আইনের অনুশাসন ও দেশের সংবিধানকে অক্ষুণ্ন রাখে।

বিচার বিভাগের গঠন

বাংলাদেশের বিচার বিভাগ সুপ্রিম কোর্ট, অধস্তন আদালত এবং প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল নিয়ে গঠিত।

সুপ্রিম কোর্ট

বিচার বিভাগের সর্বোচ্চ আদালতের নাম সুপ্রিম কোর্ট। এর রয়েছে দুটি বিভাগ, যথা : আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগ। সুপ্রিম কোর্টের একজন প্রধান বিচারপতি রয়েছেন, যাকে বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি বলা হয়। রাষ্ট্রপতি তাঁকে নিযুক্ত করেন। প্রত্যেক বিভাগের জন্য যতজন বিচারক প্রয়োজন ততজন বিচারককে নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট গঠিত। প্রধান বিচারপতির সাথে পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি সুপ্রিম কোর্টের দুই বিভাগের বিচারপতিদের নিয়োগ দেন। প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারপতিগণ বিচার পরিচালনার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন। সুপ্রিম কোর্টের বিচারক হতে হলে তাকে অবশ্যই বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে। সুপ্রিম কোর্টে কমপক্ষে ১০ বছর এডভোকেট হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে অথবা বাংলাদেশে বিচার বিভাগীয় পদে ১০ বছর বিচারক হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। সুপ্রিম কোর্টের বিচারকগণ ৬৭ বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত স্বীয় পদে কর্মরত থাকতে পারেন।

জোড়ায় কাজ : সুপ্রিম কোর্টের গঠন আলোচনা কর।

সুপ্রিম কোর্টের ক্ষমতা ও কার্যাবলি

সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগের পৃথক কার্যের এখতিয়ার আছে। এ দুটি কোর্টের ক্ষমতা ও কাজ নিয়েই সুপ্রিম কোর্ট। নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

আপিল বিভাগের ক্ষমতা ও কাজ

- আপিল বিভাগ হাইকোর্ট বিভাগের রায়, ডিক্রি বা দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপিল গ্রহণ করে শুনানির ব্যবস্থা করতে পারে।
- রাষ্ট্রপতি আইনের কোনো ব্যাখ্যা চাইলে আপিল বিভাগ এ বিষয়ে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দিয়ে থাকে।
- ন্যায়বিচারের স্বার্থে কোনো ব্যক্তিকে আদালতের সামনে হাজির হতে ও দলিলপত্র পেশ করার আদেশ জারি করতে পারে।
- আপিল বিভাগ কর্তৃক ঘোষিত আইন হাইকোর্ট বিভাগের জন্য অবশ্যই পালনীয়।

এভাবে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ আইনের ব্যাখ্যা, ন্যায়বিচার সংরক্ষণ ও পরামর্শ দান করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

হাইকোর্ট বিভাগের ক্ষমতা ও কাজ

- নাগরিকের মৌলিক অধিকার রক্ষার জন্য নিষেধাজ্ঞা জারি করতে পারে।
- কোনো ব্যক্তিকে মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী কোনো কাজ করা থেকে বিরত রাখতে পারে অথবা এ ধরনের কোনো কাজ করাকে বেআইনি ঘোষণা করতে পারে।
- অধস্তন কোনো আদালতের মামলায় সংবিধানের ব্যাখ্যাজনিত জটিলতা দেখা দিলে উক্ত মামলা হাইকোর্টে স্থানান্তর করে মীমাংসা করতে পারে।
- অধস্তন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল গ্রহণ করে।
- সকল অধস্তন আদালতের কার্যবিধি প্রণয়ন ও পরিচালনা করে।

আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগ মিলে সুপ্রিম কোর্ট সর্বোচ্চ আদালত হিসেবে দেশের সংবিধান ও নাগরিকের মৌলিক অধিকার রক্ষা করে এবং ন্যায়বিচার নিশ্চিত করে।

দলীয় কাজ : আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগের কাজের তুলনা কর।

অধস্তন আদালত : সুপ্রিম কোর্টের অধীনে বাংলাদেশের প্রতিটি জেলায় বিচার বিভাগের অধস্তন আদালত আছে। অধস্তন আদালতগুলো ফৌজদারি ও দেওয়ানি মামলা পরিচালনা করে।

জেলা জজের আদালত : জেলা আদালতের প্রধান জেলা জজ। তার কাজে সহায়তার জন্য আছেন অতিরিক্ত জেলা জজ ও সাব-জজ। এই আদালত জেলা পর্যায়ে দেওয়ানি (জমিজমাসংক্রান্ত, ঋণচুক্তি ইত্যাদি) ও ফৌজদারি (সংঘাত, সংঘর্ষ সংক্রান্ত) মামলা পরিচালনা করে।

সাব জজ আদালত ও সহকারী জজ আদালত : জেলা জজের আদালতের অধীনে প্রত্যেক জেলায় সাব জজ ও সহকারী জজ আদালত আছে। এগুলো জেলা জজ আদালতকে মামলা পরিচালনায় সহায়তা করে। এছাড়া বিভিন্ন মামলাও পরিচালনা করে থাকে।

গ্রাম আদালত : বাংলাদেশের বিচারব্যবস্থার সর্বনিম্ন আদালত হলো গ্রাম আদালত। এটি ইউনিয়ন পর্যায়ে অবস্থিত। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও বিবাদমান দুই গ্রুপের দুজন করে মোট পাঁচজন সদস্য নিয়ে গ্রাম আদালত গঠিত। যেসব মামলা স্থানীয় পর্যায়ে বিচার করা সম্ভব, মূলত সেগুলোর বিচার এখানে করা হয়। ছোটখাটো ফৌজদারি মামলার বিচার এ আদালতে করা হয়ে থাকে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। বর্তমানে বাংলাদেশে কয়টি বিভাগ আছে ?

ক) ৬ খ) ৭

গ) ৮ ঘ) ৯

২। বাংলাদেশে বর্তমানে কোন পদ্ধতির সরকারব্যবস্থা চালু রয়েছে ?

ক) একনায়কতান্ত্রিক
খ) যুক্তরাষ্ট্রীয়
গ) সংসদীয়
ঘ) রাষ্ট্রপতি শাসিত

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

ছোট রিমা বাবার সাথে টিভির খবর দেখছিল। সে দেখলো দু'জন ব্যক্তি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে হাতে বই নিয়ে একজন পাঠ করছেন, অন্যজন শুনে শুনে বলছেন। রিমা বাবাকে জিজ্ঞেস করলে বাবা বললেন, শাসন বিভাগের সর্বোচ্চ সম্মানিত ব্যক্তি বিচার বিভাগের প্রধানকে শপথ বাক্য পাঠ করাচ্ছেন।

৩। রিমার বাবা শাসন বিভাগের সর্বোচ্চ সম্মানিত ব্যক্তির দ্বারা কাকে বোঝালেন ?

ক) প্রধানমন্ত্রীকে
খ) রাষ্ট্রপতিকে
গ) সচিবকে
ঘ) মহাপরিচালককে

৪। যিনি শাসন বিভাগের সর্বোচ্চ সম্মানিত ব্যক্তি তিনি-

i. সংসদ সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হয়েছেন
ii. পাঁচ বছরের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছেন
iii. দেশের প্রকৃত শাসন ক্ষমতার অধিকারী

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক) i ও ii
খ) ii ও iii
গ) i ও iii
ঘ) i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

জনাব রিপন 'ক' এলাকার একজন জনপ্রতিনিধি হিসেবে এলাকার একটি জনসভায় ভাষণ দিচ্ছিলেন। তিনি তাঁর ভাষণে এলাকার জনগণের দাবি–দাওয়া যথাস্থানে বিল আকারে পেশ করার প্রতিশ্রুতি দেন।

৫। জনাব রিপন 'ক' এলাকার কোন জনপ্রতিনিধি ?

ক) ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান
খ) উপজেলা চেয়ারম্যান
গ) পৌরসভার চেয়ারম্যান
ঘ) সংসদ সদস্য

৬। জনাব রিপনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ কোনটি ?

ক) আইন প্রণয়ন করা
খ) অনাস্থা জ্ঞাপন করা
গ) অধিবেশন মুলতুবির ঘোষণা দেওয়া
ঘ) বাজেট পাস করা

সৃজনশীল প্রশ্ন

১।

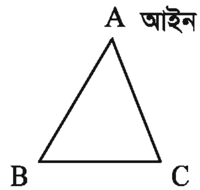

ক. শাসন বিভাগের অপর নাম কী ?

খ. বিভাগীয় প্রশাসন বলতে কী বোঝায় ?

গ. ‘A’ চিহ্নিত স্থানটি সরকারের যে বিভাগকে নির্দেশ করছে তার কাজ ব্যাখ্যা কর ।

ঘ. বাংলাদেশে ‘B’ চিহ্নিত বিভাগ ‘A’ চিহ্নিত বিভাগ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, তুমি কী এর সাথে একমত ? মতামত দাও ।

২। জনাব ‘ক’ একজন প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা হিসেবে চট্টগ্রাম বিভাগের একটি জেলায় একটি খেলার মাঠ এবং শিল্পকলা একাডেমীর দুটি নতুন ভবন নির্মাণে সরকারি সহায়তা প্রদান করেন। অন্যদিকে জনাব ‘খ’ স্থানীয় উপজেলা প্রশাসনের প্রধান কর্মকর্তা হিসেবে ঐ জেলার আদর্শ কৃষকদের মাঝে বীজ, সার, কীটনাশক বিতরণের ব্যবস্থা করেন এবং জমির রাজস্ব সঠিকভাবে আদায় করেন । জনাব ‘খ’ তার সকল কাজের জন্য জনাব ‘ক’ এর নিকট জবাবদিহি করেন ।

ক) যুদ্ধকালীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার গঠিত হয় কবে?

খ) প্রশাসনকে রাষ্ট্রের হৃৎপিণ্ড বলা হয় কেন বুঝিয়ে লিখ ।

গ) জনাব ‘ক’ কোন প্রশাসনের প্রধান কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ? ব্যাখ্যা কর ।

ঘ) জনাব ‘খ’ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা হিসেবে উদ্দীপকে বর্ণিত কাজগুলো ছাড়াও আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেন । তোমার মতামত দাও ।

২০১৬

সপ্তম অধ্যায়

গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দল ও নির্বাচন

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় রাজনৈতিক দল অপরিহার্য। আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা মূলত রাজনৈতিক দলেরই শাসন। জনগণের ভোটের মাধ্যমে গঠিত সরকার হচ্ছে গণতান্ত্রিক সরকার। আর রাজনৈতিক দল ছাড়া এই গণতান্ত্রিক সরকার গঠন সম্ভব নয়। এ অধ্যায় পাঠের মাধ্যমে আমরা রাজনৈতিক দল কী, গণতন্ত্রের সাথে রাজনৈতিক দল ও নির্বাচনের সম্পর্ক, নির্বাচন কমিশন কী ইত্যাদি সম্পর্কে জানব।

এ অধ্যায় পাঠের মাধ্যমে আমরা–

- রাজনৈতিক দলের ধারণা ও বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারব।
- গণতন্ত্রের বিকাশে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারব।
- বাংলাদেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের বর্ণনা দিতে পারব।
- গণতন্ত্র ও নির্বাচনের সম্পর্ক নিরূপণ করতে পারব।
- বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশনের গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলি বর্ণনা করতে পারব।

রাজনৈতিক দল

রাজনৈতিক দল হচ্ছে একটি দেশের জনগোষ্ঠীর সেই অংশ যারা একটি আদর্শ বা কিছু নীতি বা কর্মসূচির ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় সমস্যা সমাধানে সংগঠিত হয়। রাজনৈতিক দলের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে ক্ষমতায় গিয়ে দলের নীতি ও আদর্শ অনুযায়ী দেশ পরিচালনা এবং নির্বাচনি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা। রাজনৈতিক দল সকল ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ, শ্রেণি-পেশা নির্বিশেষে সকলের স্বার্থে কাজ করে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আদর্শ ও কর্মসূচিভিত্তিক রাজনৈতিক দলের উপস্থিতি। বিশ্বে এমন দেশও আছে যেখানে রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব নেই। যেমন- সৌদি আরব। সেখানে রাজপরিবার এবং এর পরিষদই সকল রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। আবার কোথাও বা আইন করে রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করা হয়, যেমন, ২০০৫ সাল পর্যন্ত আফ্রিকা মহাদেশের উগান্ডায় সরকার কর্তৃক রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ছিল।

রাজনৈতিক দলের বৈশিষ্ট্য

সংঘবদ্ধ জনসমষ্টি : রাজনৈতিক দল হচ্ছে কতগুলো নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে সংগঠিত একটি জনসমষ্টি।

ক্ষমতা লাভ : রাজনৈতিক দলের প্রধান লক্ষ্য নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রাষ্ট্রক্ষমতা লাভের মাধ্যমে সরকার গঠন করা।

সুনির্দিষ্ট আদর্শ ও কর্মসূচি : প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের একটি আদর্শ ও সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি থাকে। আদর্শের দিক থেকে কোনো দল ধর্মভিত্তিক আবার কোনো দল ধর্মনিরপেক্ষ হয়। অন্যদিকে অর্থনীতির রূপরেখা বিবেচনায়ও দল ভিন্ন হতে পারে। যেমন- সমাজতান্ত্রিক দল।

প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও নেতৃত্ব : প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো থাকে। কেন্দ্র থেকে স্থানীয় পর্যায় পর্যন্ত দলের শাখা বিস্তৃত থাকে। এছাড়া প্রত্যেক দলের কেন্দ্রীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন কমিটি থাকে। তবে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব দ্বারা দল পরিচালিত হয়।

নির্বাচনসংক্রান্ত কাজ : আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা তথা গণতান্ত্রিক অথবা একনায়কতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থায় নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একনায়কতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থার চেয়ে গণতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থায় নির্বাচনের গুরুত্ব অধিকতর। এ সকল নির্বাচনে অংশগ্রহণের প্রস্তুতি, প্রার্থী মনোনয়ন, নির্বাচনে দলীয় কর্মসূচি প্রণয়ন, নির্বাচনি প্রচার ও ভোট সংগ্রহ দলের এবং দলীয় কর্মীদের দ্বারা সম্পাদিত হয়ে থাকে।

রাজনৈতিক দলের ভূমিকা

নেতৃত্ব তৈরি : রাজনৈতিক দলের যিনি প্রধান তিনিই হলেন দলের নেতা। দলের নেতৃত্ব যেমন জাতীয় পর্যায়ে থাকে, তেমনি স্থানীয় পর্যায়েও থাকে। আবার আজকে যারা স্থানীয় পর্যায়ের নেতা, আগামীতে তাঁরা যে জাতীয় পর্যায়ের নেতা হতে পারবেন না, তা নয়। বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তার দলের নেতা। এই নেতা তৈরির কাজটি করে রাজনৈতিক দল ও জনগণ।

সরকার গঠন : রাজনৈতিক দলের প্রধান কাজ হচ্ছে সরকার গঠন করা। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্বাচনে যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় সেই দলই সরকার গঠন করে।

জনমত গঠন : রাজনৈতিক দলের একটি অন্যতম কাজ হচ্ছে তার আদর্শ ও কর্মসূচির পক্ষে জনমত গঠন করা। এই জনমত গঠনে রাজনৈতিক দল বিভিন্ন সভা, মিছিল ও গণযোগাযোগের কর্মসূচি গ্রহণ করে।

রাজনৈতিক শিক্ষাদান : রাজনৈতিক দলের কাজ হচ্ছে জনগণকে তাদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে সচেতন করা। নির্বাচনের সময় রাজনৈতিক দলগুলো তাদের দলীয় কর্মসূচি ব্যাখ্যা করে এবং অন্যান্য দলের কাজের সমালোচনা করে। জনগণ বিভিন্ন দলের মতামত, আলোচনা-সমালোচনা ইত্যাদি থেকে রাষ্ট্র পরিচালনার অনেক বিষয় জানতে পারে– এভাবে সাধারণ জনগণ রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠে।

গঠনমূলক বিরোধিতা : রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে নির্বাচনে বিজয়ী দল সরকার গঠন করে এবং দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল আইনসভায় বিরোধী দল হিসেবে ভূমিকা পালন করে। সরকারের কোনো কার্যক্রম ভুল হলে বিরোধী দলের প্রধান কাজ হচ্ছে গঠনমূলক সমালোচনার মাধ্যমে সরকারের ভুলত্রুটি ধরিয়ে দেওয়া।

সামাজিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা : একটি সমাজে বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ ও শ্রেণির মানুষ থাকে। তাদের স্বার্থ পরস্পর থেকে আলাদা। এই আলাদা আলাদা স্বার্থ একত্রিত করে তা একটি কর্মসূচিতে পরিণত করা রাজনৈতিক দলের অন্যতম কাজ। রাজনৈতিক দল নির্বাচিত হয়ে ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য জনগণের সমর্থন চায়। যেকোনো দল ক্ষমতায় গিয়ে তাদের কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নীতি প্রণয়ন করে। এই নীতি বাস্তবায়নের উপর সামাজিক ঐক্য নির্ভর করে।

একক কাজ : রাজনৈতিক দলের কোন কাজগুলো জনগণের মনে আশার সঞ্চার করে তার একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

বাংলাদেশের প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহ

একটি দেশের দলব্যবস্থা দ্বারা শুধু সে দেশের রাজনৈতিক দলের উপস্থিতি বোঝায় না। বরং দলব্যবস্থায় দলের সংখ্যা, গঠন, সরকারের সঙ্গে দলের সম্পর্ক ইত্যাদি বোঝায়। দেশের সংবিধান অনুযায়ী প্রত্যেক নাগরিকের স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ ও সংগঠন বা সমিতি করার অধিকার রয়েছে। এর

প্রতিফলন হিসেবে আমরা বাংলাদেশে বহুদলীয় ব্যবস্থা বিদ্যমান দেখতে পাই। বর্তমানে বাংলাদেশে অনেকগুলো রাজনৈতিক দল রয়েছে। এগুলোর মধ্যে আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী উল্লেখযোগ্য। নিচে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক দলগুলোর সংক্ষিপ্ত ধারণা দেওয়া হলো।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

আওয়ামী লীগ এ দেশের সবচেয়ে পুরাতন ও বৃহত্তম রাজনৈতিক দল। ১৯৪৯ সালের ২৩শে জুন ঢাকায় আওয়ামী মুসলীম লীগ নামে দলটি প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য ১৯৫৫ সালে দলের নাম থেকে 'মুসলীম' শব্দটি বাদ দেওয়া হয়। বাঙালি জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও শোষণমুক্ত সমাজ বিনির্মাণ আওয়ামী লীগের মূলনীতি। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে এই দল পাকিস্তানে ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করে। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ১৯৭১ সালে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়। এর মধ্য দিয়ে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল দেশের অন্য আরেকটি বৃহত্তম রাজনৈতিক দল। মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান ১৯৭৮ সালের ১লা সেপ্টেম্বর এই দলটি প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের আদর্শ বা মূলনীতি হচ্ছে- ইসলামি মূল্যবোধে বিশ্বাস, বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র ও মুক্তবাজার অর্থনীতি।

জাতীয় পার্টি

জাতীয় পার্টি দেশের তৃতীয় বৃহৎ দল। ১৯৮৬ সালের ১লা জানুয়ারি লেঃ জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের নেতৃত্বে এই দলটি প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতীয় পার্টির ঘোষণাপত্রে (১) স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব, (২) ইসলামি আদর্শ ও সকল ধর্মের স্বাধীনতা, (৩) বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ, (৪) গণতন্ত্র এবং (৫) সামাজিক প্রগতি তথা অর্থনৈতিক মুক্তি– এই পাঁচটিকে দলের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

জামায়াতে ইসলামী একটি ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল। ১৯৪১ সালে ব্রিটিশ ভারতে মাওলানা আবুল আলা মওদুদীর নেতৃত্বে এ দলের প্রতিষ্ঠা। তখন এর নাম ছিল 'জামায়াতে ইসলামী হিন্দ'। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এর নাম হয় 'জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান'। স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭৯ সালের মে মাসে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর আত্মপ্রকাশ ঘটে। বর্তমানে এর নাম বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী।

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)

মুক্তিযুদ্ধ-উত্তর স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭২ সালের ৩১শে অক্টোবর জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) প্রতিষ্ঠিত হয়। জাসদ সমাজতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসী।

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি)

ভারত ও পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির ধারায় বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির জন্ম। এদেশে কমিউনিস্ট আন্দোলনের পথিকৃৎ কমরেড মনি সিং (মৃত্যু ১৯৯০) ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির প্রাণপুরুষ।

বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি

এদেশের বহুধা বিভক্ত চীনপন্থী কমিউনিস্টদের কয়েকটি অংশ মিলিত হয়ে বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি গঠন করে। ১৯৮০ সালে এ দলের আত্মপ্রকাশ।

গণতন্ত্রের বিকাশে রাজনৈতিক দল

গণতন্ত্র মানেই হচ্ছে রাজনৈতিক দলের উপস্থিতি। গণতন্ত্রের সফলতার জন্য রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা রাজনৈতিক দলই জনগণের মতামতকে সুসংগঠিত করে এবং জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটায়।

রাজনৈতিক দল এর সদস্য ও নেতাদেরকে গণতান্ত্রিক আচার-আচরণে অভ্যস্ত হতে শেখায়। যেমন- দলীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় দলের নেতা ও কর্মীদেরকে মত প্রকাশের সুযোগ দেওয়া হয় এবং অন্যের মতের প্রতি সহনশীল হতে শেখায়।

জনগণের স্বার্থবিরোধী সরকারকে অপসারণ করে রাজনৈতিক দল গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন করে। ১৯৯০ সালে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলো জনস্বার্থবিরোধী সামরিক সরকারকে হটিয়ে গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠা করে। ১৯৯১ সালে দেশের সকল রাজনৈতিক দলের ঐকমত্যের মাধ্যমে আবারও সংসদীয় গণতান্ত্রিক সরকার পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়।

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় নির্দিষ্ট সময় অন্তর ক্ষমতার পরিবর্তন হয়। সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সরকার গঠন করা হয়। রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণ ছাড়া এ নির্বাচন সম্ভব নয়।

একক কাজ : গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের ভূমিকা ছক/ধারণা চার্টের মাধ্যমে তুলে ধর।

নির্বাচন

নির্বাচন হচ্ছে জনপ্রতিনিধি বাছাইয়ের পদ্ধতি। স্থানীয় পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত ভোটাধিকার প্রাপ্ত সকল নাগরিক ভোট দিয়ে জনপ্রতিনিধি বাছাই করে। প্রতিনিধি বাছাইয়ের প্রক্রিয়াকে নির্বাচন বলে। যারা ভোট দেয়, তাদের নির্বাচক বা ভোটার বলে। নির্বাচকের সমষ্টিকে নির্বাচকমণ্ডলী বলা হয়। সুষ্ঠু নির্বাচন গণতান্ত্রিক শাসন পদ্ধতির অন্যতম শর্ত। এ ছাড়া সামরিক শাসন ও এক ব্যক্তিকেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায়ও কখনো কখনো নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়।

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় নির্বাচনের গুরুত্ব অপরিসীম। নির্বাচনের মাধ্যমেই জনমত প্রকাশ পায়। নির্বাচনের মাধ্যমেই ভোটারগণ একাধিক প্রতিনিধিদের মধ্য থেকে যোগ্য প্রার্থীকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করে। যে দল

বেশি ভোট পায়, তারা সরকার গঠন করে। নির্বাচকমণ্ডলী সরকার ও জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধ হিসেবে কাজ করে। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় নির্বাচন সরকারকে জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য করে। একটি দল নির্বাচিত হয়ে সঠিকভাবে জনগণের জন্য কাজ না করলে পরবর্তী নির্বাচনে জনগণ সাধারণত সেই দলকে আর নির্বাচিত করে না। উন্নত গণতান্ত্রিক দেশে এটি যেমন সত্যি, তেমনিভাবে অনুন্নত দেশের ক্ষেত্রেও সত্যি। বৃটেনে ২০১০ সালের নির্বাচনে লেবার পার্টির পরিবর্তে সে দেশের জনগণ কনজারভেটিভ পার্টিকে ভোট দেয়। তেমনি, বাংলাদেশে ২০০১ সালে আওয়ামী লীগের পরিবর্তে বিএনপি'কে এবং ২০০৮ সালে বিএনপি'র পরিবর্তে আওয়ামী লীগকে এ দেশের জনগণ ক্ষমতায় বসায়। এভাবেই নির্বাচন জনগণের সাথে শাসকশ্রেণির যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। জনগণ নির্বাচনের মাধ্যমে শাসকশ্রেণির প্রতি একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সমর্থন অব্যাহত রাখে। বাংলাদেশে স্বাধীনতার পর ১৯৭৩ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত ৪০ বছরে ১৫ বার সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর মধ্যে ২ বার ছিল গণভোট, ৩ বার রাষ্ট্রপতি এবং ১০ বার সংসদ নির্বাচন। দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় এ সব নির্বাচনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

নির্বাচনের প্রকারভেদ

নির্বাচন দুই প্রকার। যেমন- প্রত্যক্ষ নির্বাচন ও পরোক্ষ নির্বাচন।

প্রত্যক্ষ নিবাচন : যে নির্বাচনে জনগণ সরাসরি ভোট দিয়ে প্রতিনিধি বাছাই করে তাকে প্রত্যক্ষ নির্বাচন বলা হয়। যেমন- বাংলাদেশের সংসদ সদস্যগণ জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন।

পরোক্ষ নির্বাচন : জনগণ ভোটের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধি বা একটি মধ্যবর্তী সংস্থা নির্বাচিত করেন। এই জনপ্রতিনিধিগণ ভোট দিয়ে যখন রাষ্ট্রপতি বা সংসদের সংরক্ষিত আসনের সদস্য নির্বাচন করেন, তখন তাকে বলা হয় পরোক্ষ নির্বাচন। যেমন- বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি সংসদ সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত হন। আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি মধ্যবর্তী সংস্থা দ্বারা নির্বাচিত হন।

একক কাজ : গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্বাচকমণ্ডলী গুরুত্বপূর্ণ কেন তার কয়েকটি কারণ লিপিবদ্ধ কর।

নির্বাচনের পদ্ধতি

নির্বাচনের পদ্ধতি বলতে বোঝায় কীভাবে ভোট প্রদান করে প্রার্থী বাছাই করা হয়। বর্তমানে ভোট প্রদানের দুটি পদ্ধতি রয়েছে। (ক) প্রকাশ্য ভোটদান পদ্ধতি ও (খ) গোপন ভোটদান পদ্ধতি। প্রকাশ্য ভোটদান পদ্ধতিতে ভোটারগণ নিজ নিজ পছন্দের ব্যক্তিকে সকলের সামনে প্রকাশ্যে ভোট দেয়। এতে ভোটাররা প্রকাশ্যে 'হ্যাঁ' ধ্বনি বা 'হাত তুলে' সমর্থন দান করে। অন্যদিকে গোপন ভোটদান পদ্ধতিতে ভোটারগণ গোপনে ব্যালটপত্রে পছন্দকৃত ব্যক্তির নামের পাশে নির্ধারিত চিহ্ন এঁকে বা সিল দিয়ে ভোট প্রদান করে। বর্তমানে এ পদ্ধতি সর্বজনস্বীকৃত।

এক ব্যক্তি এক ভোট

নির্বাচনপদ্ধতির মধ্যে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হচ্ছে 'এক ব্যক্তি, এক ভোট' পদ্ধতি। 'এক ব্যক্তি, এক ভোট' বর্তমানে সর্বত্র গৃহীত নীতি। এ পদ্ধতিতে একটি আসনের জন্য যেকোনো সংখ্যক প্রার্থী

প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন। একজন ভোটার কেবল তাঁর পছন্দের প্রার্থীকে একটি ভোট দিবেন। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে যিনি বেশি ভোট পাবেন তিনি নির্বাচিত হবেন।

একক কাজ : নির্বাচনপদ্ধতির বৈশিষ্ট্যগুলো পৃথকভাবে ছকের মাধ্যমে তুলে ধর।

নির্বাচন কমিশন

গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান নির্মাণের পূর্ব শর্ত হচ্ছে কার্যকর নির্বাচনব্যবস্থা। অন্যকথায়, নির্বাচনের উপর জনগণের আস্থা। সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনব্যবস্থা হচ্ছে গণতন্ত্রের রক্ষাকবচ। আর এই সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের।

গঠন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের আওতায় নির্বাচন কমিশন গঠিত। এটি সাংবিধানিকভাবে গঠিত একটি প্রতিষ্ঠান। প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অনধিক চারজন কমিশনারসহ মোট পাঁচজন নিয়ে নির্বাচন কমিশন গঠিত। এদেরকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ দেন। নির্বাচন কমিশনের সভায় প্রধান নির্বাচন কমিশনার সভাপতির কাজ করেন। প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য কমিশনারের মেয়াদ তাদের কার্যভার গ্রহণের তারিখ হতে পাঁচ বছর। নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব পালনে সহায়তা করা সরকার ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষের কর্তব্য। নির্বাচন কমিশন সংবিধানে বর্ণিত নির্দেশনাবলি এবং দেশের নির্বাচনি আইন দ্বারা পরিচালিত হয়।

নির্বাচন কমিশনের কার্যাদি সম্পন্ন করার জন্য নিজস্ব সচিবালয় রয়েছে। সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি নিয়ে সংসদ প্রতিষ্ঠার জন্য নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা খুবই জরুরি। নির্বাচন কমিশন এর জনবল ও আর্থিক ক্ষমতার জন্য সরকারের উপর নির্ভরশীল। তাই জনবল ও অর্থসংক্রান্ত ব্যাপারে নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতা থাকা একান্ত আবশ্যক।

ক্ষমতা ও কার্যাবলি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১৯-এ নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব বর্ণিত হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব হলো রাষ্ট্রপতি ও সংসদ নির্বাচন পরিচালনা, নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রস্তুতকরণ, ভোটারদের পরিচয়পত্র প্রদান, আইন কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য নির্বাচন (এর মধ্যে সকল স্থানীয় সরকার পরিষদ যেমন- ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পার্বত্য জেলা পরিষদ) পরিচালনা এবং আনুষঙ্গিক কার্যাদির সুষ্ঠু সম্পাদন। এছাড়া নির্বাচনে প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র বাছাইকরণ, দল সম্পর্কিত নীতিমালা ও নির্বাচন পরিচালনাসংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন করাও নির্বাচন কমিশনের কাজ। এছাড়া নির্বাচন কমিশনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণ করা। যেমন- বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৩০০টি নির্বাচনি এলাকা রয়েছে। সেখান থেকে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে সংসদ সদস্যগণ নির্বাচিত হন। ভৌগোলিক আয়তন ও ভোটার সংখ্যার ভিত্তিতে নির্বাচনি এলাকা নির্ধারিত হয়। ভৌগোলিক এলাকাভিত্তিক ৩০০ আসন ছাড়াও বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে আরো ৫০টি সংরক্ষিত আসন রয়েছে। এগুলো মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট। তাঁরা জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত ৩০০ সংসদ সদস্য কর্তৃক পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন।

দলীয় কাজ : সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা মুখ্য– এ বিষয়ে শ্রেণিকক্ষে বিতর্কের আয়োজন কর ।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১ । জাতীয় সংসদে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন কতটি?

ক) ১৩ খ) ৫০

গ) ৩০০ ঘ) ৩৫০

২ । রাজনৈতিক দলের প্রধান কাজ কোনটি?

ক) নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা গ্রহণ করা

খ) দলীয় আদর্শ ও কর্মসূচির পক্ষে জনমত গঠন

গ) গঠনমূলক বিরোধিতার মাধ্যমে সরকারের ভুলত্রুটি ধরা

ঘ) বিভিন্ন দলের স্বার্থ একত্র করে রাজনৈতিক কর্মসূচি স্থির করা

ছকটি পর্যবেক্ষণ করে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

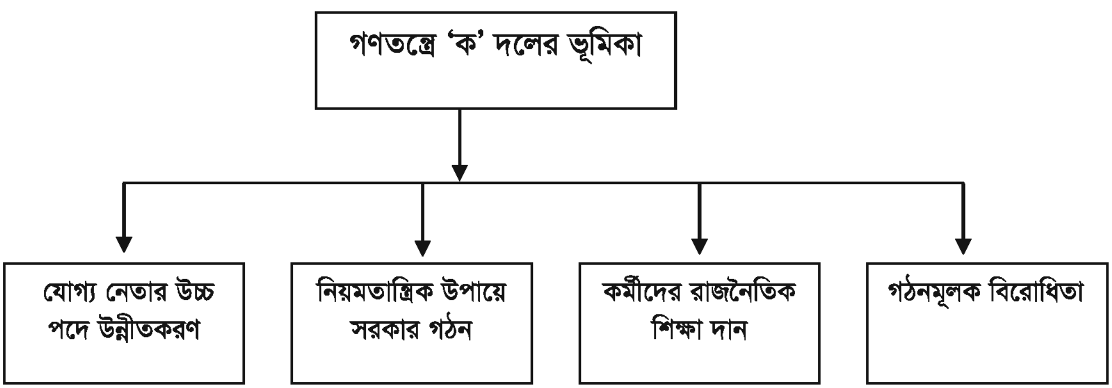

৩ । গণতন্ত্রের বিকাশে প্রয়োজন–

i. দলীয় সিদ্ধান্তে কর্মীদের মতামতকে প্রাধান্য দেওয়া

ii. সরকারের বিভিন্ন কাজে বিরোধী দলের গঠনমূলক সমালোচনা

iii. নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার পরিবর্তন

২০১৯

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক) i ও ii খ) ii ও iii

গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

৪। 'ক' দলের ছকের ভূমিকাগুলো পালন করতে সহজ হবে–

ক) রাজতান্ত্রিক সরকারে খ) একনায়কতান্ত্রিক ব্যবস্থায়

গ) সমাজতান্ত্রিক শাসনে ঘ) সংসদীয় সরকারে

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচনে 'ক' ও 'খ' ব্যক্তি ঢাকার একটি আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। তাঁরা ভোটারদের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে কুশল বিনিময় করেন। এছাড়াও নির্বাচনী এলাকার বিভিন্ন স্থানে মিটিং, মিছিল কর্মসূচি পালন করেন। নির্বাচনে ভোটারগণ 'খ' ব্যক্তিকে সৎ, যোগ্য মনে করে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করে।

ক. কোন শাসন ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দল অপরিহার্য?

খ. রাজনৈতিক দলের প্রধান লক্ষ্য কী? ব্যাখ্যা কর।

গ. 'খ' ব্যক্তি কোন পদ্ধতিতে নির্বাচিত হন? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. নির্বাচনে 'ক' ও 'খ' ব্যক্তির কাজগুলোর মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক দলের কোন প্রধান কাজের প্রতিফলন ঘটেছে? উত্তরের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন কর।

অষ্টম অধ্যায়

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারব্যবস্থা

রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য কেন্দ্রীয় প্রশাসনের পাশাপাশি স্থানীয় শাসনব্যবস্থা গড়ে উঠে। স্থানীয় পর্যায়ের সমস্যা সমাধানের জন্য তৃণমূল পর্যায়ে এই ধরনের সরকার গড়ে উঠে। বাংলাদেশে এই ধরনের স্থানীয় সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান। স্থানীয় সরকারব্যবস্থায় জনগণ রাষ্ট্রের শাসনকার্যে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। তাই স্থানীয় শাসন গণতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থার অপরিহার্য অংশ। এ অধ্যায়ে আমরা স্থানীয় সরকারব্যবস্থার গঠন, ক্ষমতা ও কাজ সম্পর্কে জানব।

এ অধ্যায় পাঠের মাধ্যমে আমরা–

- বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারব্যবস্থার গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলি বর্ণনা করতে পারব।
- বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারব্যবস্থার বিভিন্ন স্তরের পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে পারব।
- নাগরিকতার বিকাশে স্থানীয় সরকারের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারব।
- নাগরিক সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকারের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারব।

স্থানীয় সরকার

স্থানীয় সরকার হচ্ছে সমগ্র রাষ্ট্রকে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত করে ক্ষুদ্রতর পরিসরে প্রতিষ্ঠিত সরকারব্যবস্থা। কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে সম্পর্কের ভিত্তিতে স্থানীয় সরকারের রূপ দুই ধরনের হয়। যেমন : ১। স্থানীয় সরকার ও ২। স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সরকার। স্থানীয় প্রশাসন হচ্ছে সেই প্রশাসন যেখানে প্রশাসককে কেন্দ্রীয় সরকার নিয়োগ দেয় এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ বাস্তবায়নই এর প্রধান কাজ। বিভাগ, জেলা, উপজেলা পর্যায়ে প্রশাসনিক কর্মকর্তা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে সচিব সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হন। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার বলতে বুঝায় এমন ধরনের সরকারব্যবস্থা যা ছোট ছোট এলাকায় স্থানীয় প্রয়োজন মেটাবার জন্য জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত ও আইনের মাধ্যমে ক্ষমতাপ্রাপ্ত। আমাদের দেশে ইউনিয়ন পরিষদ, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারের উদাহরণ। স্থানীয় প্রশাসন আবার স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারের সহযোগী হিসাবে কাজ করে।

স্থানীয় সরকারের গুরুত্ব

ব্রিটিশ রাজনৈতিক দার্শনিক জন স্টুয়ার্ট মিলের মতে, স্থানীয় সরকার সরকারি ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করে এবং এ বিষয়ে নাগরিকদেরকে সচেতন করে। স্থানীয় সরকার স্থানীয় পর্যায়ে নাগরিকদেরকে যথাযথভাবে বিভিন্ন সেবা প্রদান করতে পারে। কেন্দ্রীয় প্রশাসকদের পক্ষে সঠিক ভাবে স্থানীয় জনগণের স্বার্থরক্ষা, তাদের সমস্যা সমাধান করা এবং স্থানীয় উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা অর্জন করা সম্ভব হয় না। এ ক্ষেত্রে তাদেরকে স্থানীয় সরকারের উপর নির্ভর করতে হয়। স্থানীয় সরকার এ সকল বিষয়ে তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারকে যথাযথ নীতিমালা গ্রহণ ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে সহায়তা করে।

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারব্যবস্থার স্বরূপ

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারব্যবস্থার দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। মুঘল আমল থেকে শুরু হয়ে ব্রিটিশ শাসন পর্যন্ত নানা আইনি সংস্কারের মধ্য দিয়ে এদেশে স্থানীয় সরকারের শাসন-কাঠামো রূপ লাভ করে। পাকিস্তানি শাসন আমলে এর প্রকৃতি অপরিবর্তিত থাকে। ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর নতুন রাষ্ট্রের সবকিছুই ঢেলে সাজানোর প্রয়োজন হয়। নতুন রাষ্ট্রে ১৯৭২-এর সংবিধানে স্থানীয় সরকারব্যবস্থার উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়।

বাংলাদেশে বর্তমানে তিন স্তরবিশিষ্ট স্থানীয় সরকার কাঠামো লক্ষ করা যায়। যথা– ইউনিয়ন পরিষদ, থানা/ উপজেলা পরিষদ ও জেলা পরিষদ। এছাড়া শহরগুলোতে পৌরসভা, ১২টি বড় শহরে সিটি কর্পোরেশন, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলায় তিনটি (খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, রাঙামাটি) স্থানীয় জেলা পরিষদ রয়েছে। উল্লিখিত তিন স্তরের মধ্যে ইউনিয়ন পরিষদকেই নিচের দিকে সবচেয়ে কার্যকর ইউনিট বলে মনে করা হয়ে থাকে।

গ্রাম বা এর নিকটবর্তী হচ্ছে ইউনিয়ন ও উপজেলা পরিষদ। শহর এলাকায় রয়েছে পৌরসভা, জেলা পরিষদ ও সিটি কর্পোরেশন। এছাড়া পার্বত্য এলাকার জন্য বিশেষ স্থানীয় সরকারের ব্যবস্থা রয়েছে।

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার

স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের অধীন		পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন
গ্রামভিত্তিক স্থানীয় সরকার	শহরভিত্তিক স্থানীয় সরকার	পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ
উপজেলা পরিষদ (৪৯২)	জেলা পরিষদ (৬১)	১। বান্দরবান পাহাড়ি জেলা পরিষদ
ইউনিয়ন পরিষদ (৪৫৫৪)	সিটি কর্পোরেশন (১২)	২। রাঙামাটি পাহাড়ি জেলা পরিষদ
	পৌরসভা (৩২৭)	৩। খাগড়াছড়ি পাহাড়ি জেলা পরিষদ

উল্লেখ্য বাংলাদেশে প্রতিটি স্থানীয় সরকারব্যবস্থায় মহিলাদের প্রতিনিধিত্বের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এবার আমরা বিভিন্ন স্থানীয় সরকার সম্পর্কে জানব।

ইউনিয়ন পরিষদ

গঠন

গড়ে ১০-১৫টি গ্রাম নিয়ে একটি ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত। এর একজন নির্বাচিত চেয়ারম্যান, ৯ টি ওয়ার্ড থেকে নয়জন নির্বাচিত সাধারণ সদস্য ও তিনজন নির্বাচিত মহিলা সদস্য (সংরক্ষিত আসনে) রয়েছেন। একটি ইউনিয়ন ৯টি ওয়ার্ডে বিভক্ত।

মহিলা সদস্যগণ প্রতি ৩ ওয়ার্ডে ১ জন–এই ভিত্তিতে জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হন। ইউনিয়ন পরিষদে একজন বেতনভুক্ত সচিব থাকে। ইউনিয়ন পরিষদের কার্যকাল ৫ বছর। তবে মেয়াদ পূর্তির পূর্বেও দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের অনাস্থা ভোটের মাধ্যমে চেয়ারম্যান ও অন্য যেকোনো সদস্যকে অপসারণ করা যায়। বাংলাদেশে সর্বমোট ৪৫৫৪টি ইউনিয়ন পরিষদ রয়েছে।

কার্যাবলি

ইউনিয়ন পরিষদ গ্রামীণ জীবনে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গ্রামীণ সমস্যা দূরীকরণ, গণসচেতনতা বৃদ্ধি ও দায়িত্বশীল নেতৃত্ব তৈরি করার লক্ষ্যে ইউনিয়ন পরিষদ অনেক কাজ করে। নিম্নে সেগুলো আলোচনা করা হলো :

১. ইউনিয়ন পরিষদ রাস্তাঘাট, সেতু, কালভার্ট নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং রাস্তার ধারে বৃক্ষরোপণ করে।

২. কৃষি উন্নয়নের জন্য ইউনিয়ন পরিষদ উন্নতমানের বীজ, সার ও কীটনাশক সরবরাহ ও অধিক খাদ্য উৎপাদনে উৎসাহ প্রদান করে।

৩. মৎস্য চাষ, পশুপালন ও পশুসম্পদ উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

৪. জনস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য ইউনিয়ন পরিষদ পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা করে। ময়লা আবর্জনা ফেলা, প্রাণী জবাই, গবাদি পশুর গোসল, ময়লা কাপড়-চোপড় ধোয়া ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে।

৫. প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য দাতব্য হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করে।

৬. ইউনিয়ন পরিষদ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে গণসচেতনতা তৈরি করে এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ অল্প খরচে সহজে পাওয়ার ব্যবস্থা করে।

৭. শিক্ষা বিস্তার ও নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য ইউনিয়ন পরিষদ দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান, বয়স্ক শিক্ষাদান কেন্দ্র ও লাইব্রেরি স্থাপন ইত্যাদি করে।

৮. জনগণের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কুটির শিল্প স্থাপন ও সমবায় আন্দোলন পরিচালনা করে এবং এ ব্যাপারে জনগণকে উৎসাহিত করে।

৯. ইউনিয়ন পরিষদ নিজ অফিসের ব্যয় নির্বাহের জন্য বিভিন্ন ধরনের কর ধার্য ও আদায় করে এবং বিভিন্ন ধরনের রাজস্ব সংগ্রহে সরকারকে সহায়তা করে।

১০. ইউনিয়ন পরিষদ জন্ম-মৃত্যু ও বিবাহ রেজিস্টার রক্ষণাবেক্ষণ করে।

১১. বন্যা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় ইউনিয়ন পরিষদ দুস্থদের সাহায্য ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে।

১২. ইউনিয়ন পরিষদ গ্রামীণ জীবনের বিভিন্ন বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করে। সর্বোচ্চ পাঁচ (০৫) হাজার টাকা দাবির দেওয়ানি ও ছোটখাটো ফৌজদারি মামলার বিচার ইউনিয়ন পরিষদ করতে পারে।

আয়ের উৎস

ইউনিয়ন পরিষদের আয়ের উৎস :

ক. বাড়িঘর, দালান-কোঠার উপর কর

খ. জন্ম, বিবাহ ও ভোজের উপর ফি

গ. সিনেমা, থিয়েটার, যাত্রা, সার্কাস, মেলা ইত্যাদির উপর কর

ঘ. যানবাহনের উপর কর

ঙ. লাইসেন্স, পারমিট ফি

চ. জনস্বার্থে বিশেষ কল্যাণকর কাজের জন্য ফি

ছ. হাট বাজার, জলমহাল, ফেরিঘাট ইজারা ও টোল সংগ্রহ

জ. সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বরাদ্দ/অনুদান ইত্যাদি ।

দলগত কাজ : ১. শহর ও গ্রামভিত্তিক স্থানীয় সরকারের একটি তালিকা তৈরি কর ।

২. ইউনিয়ন পরিষদের আয়ের উৎসের একটি তালিকা তৈরি কর ।

উপজেলা পরিষদ

আমাদের দেশে থানা/উপজেলা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক স্তর ।

গঠন

একজন চেয়ারম্যান, দুজন ভাইস চেয়ারম্যান (এদের মধ্যে একজন হবেন মহিলা) এবং উপজেলার আওতাধীন ইউনিয়ন পরিষদসমূহের চেয়ারম্যানবৃন্দ, পৌরসভার (যদি থাকে) মেয়র এবং তিনজন মহিলা সদস্যের সমন্বয়ে উপজেলা পরিষদ গঠিত হয়। ২০০৯ সালের উপজেলা পরিষদ আইন অনুযায়ী সংসদ সদস্যদেরকে পরিষদের পরামর্শকের ভূমিকা প্রদান করা হয়েছে। চেয়ারম্যান উপজেলার ভোটারদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন ।

ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও পৌরসভার (যদি থাকে) মেয়রবৃন্দ পদাধিকারবলে এর সদস্য হবেন। ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভার (যদি থাকে) নির্বাচিত মহিলা সদস্যদের ভোটে তাদের মধ্য থেকে তিনজন মহিলা সদস্য নির্বাচিত হবেন। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) পরিষদের নির্বাহী কর্মকর্তা বা সচিবের দায়িত্ব পালন করবেন। পরিষদের কার্যকাল হবে ৫ বছর। বর্তমানে বাংলাদেশে ৪৯২টি উপজেলা রয়েছে ।

কার্যাবলি

উপজেলা পরিষদের কাজগুলো নিচে আলোচনা করা হলো।

১. ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়ন কার্যক্রমের সমন্বয়সাধন করে।

২. যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য আন্তঃইউনিয়ন সংযোগকারী রাস্তা নির্মাণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করে।

৩. মহিলা ও শিশু উন্নয়ন, সমাজকল্যাণ, যুব, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে সহায়তা দান করে।

৪. কৃষি উন্নয়নের লক্ষ্যে পশু পালন, মৎস্য চাষ, বনজ সম্পদ উন্নয়ন ও সেচ প্রকল্প গ্রহণসহ বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করে।

৫. নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে জনমত গঠনসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

৬. প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করে।

৭. ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপন ও বিকাশের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করে।

৮. শিক্ষা প্রসারের জন্য মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষা কার্যক্রমের মান উন্নয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রম তদারক করে।

৯. নিরাপদ খাবার পানি সরবরাহ ও পয়নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন নিশ্চিত করে।

১০. উপজেলা আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নসহ পুলিশ বিভাগের কার্যক্রম আলোচনা করে।

১১. আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে কর্মসূচি গ্রহণ করে।

১২. সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য কার্যক্রম সম্পাদন করে।

আয়ের উৎস

উপজেলা পরিষদ কর্তৃক ধার্যকৃত কর, টোল, ফি এবং সরকার ও অন্যান্য উৎস থেকে প্রাপ্ত অর্থ বা অনুদান ইত্যাদি নিয়ে উপজেলা পরিষদের তহবিল গঠিত হবে।

একক কাজ : ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা পরিষদ গঠনের পার্থক্যসমূহের একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

জেলা পরিষদ

জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জেলার জনগণ দ্বারা সরাসরি নির্বাচনের বিধান রাখা হয়। জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান একজন প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদার অধিকারী এবং জেলা প্রশাসককে তার অধীনে প্রধান নির্বাহী করা হয়। সংসদ সদস্য এই পরিষদে পরামর্শকের ভূমিকা পালন করেন। তবে বর্তমানে সরকার জেলা পরিষদে নির্বাচিত চেয়ারম্যানের বদলে একজন করে প্রশাসক নিয়োগ দিয়েছেন।

গঠন

২০০০ সালের জেলা পরিষদ আইন অনুযায়ী জেলা পরিষদ গঠিত হবে একজন চেয়ারম্যান, পনেরজন সদস্য এবং সংরক্ষিত আসনে ৫ জন মহিলা সদস্য নিয়ে। এরা সবাই একটি নির্দিষ্ট জেলার অধীন সিটি কর্পোরেশনের মেয়র, কমিশনারবৃন্দ, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত হবেন। এই পরিষদের মেয়াদ হবে পাঁচ বছর।

কার্যাবলি

২০০০ সালের আইনের অধীনে জেলা পরিষদকে ১২টি বাধ্যতামূলক এবং ৬৮টি ঐচ্ছিক কার্যাবলির দায়িত্ব দেওয়া হয়। জেলা পরিষদের উল্লেখযোগ্য কাজের মধ্যে রয়েছে পরিকল্পনা এবং উন্নয়ন, শিল্প এবং বাণিজ্যের উন্নয়ন, সরকারি হাসপাতাল তত্ত্বাবধান, পারিবারিক ক্লিনিক, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন। সেই সাথে আন্তঃজেলা সড়ক প্রকল্প প্রস্তুতকরণ এবং চলমান পুলিশি কর্মকাণ্ডের তত্ত্বাবধান, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নয়নে সহায়তা, সন্ত্রাস দমনে সুপারিশ এবং উপজেলা কর্মকাণ্ডের তদারক। জেলা পরিষদ ৫ বছর মেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করে এবং স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদনের জন্য পাঠায়।

আয়ের উৎস

জেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮ অনুযায়ী জেলা পরিষদের ৮টি আয়ের উৎস আছে। কর, টোল, ফিস, সম্পত্তি হতে প্রাপ্ত আয়/ মুনাফা, ব্যক্তি, সরকার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান, বিনিয়োগ হতে প্রাপ্ত আয় এবং অন্যান্য উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থ। জেলা পরিষদের জন্য জমি হস্তান্তর করের ১ শতাংশ এবং ৫ শতাংশ ভূমি কর রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া হাট-বাজার, ফেরিঘাট এবং জলমহাল থেকে বর্ধিত পরিমাণ লিজের অর্থ জেলা পরিষদ পাবে। তবে গঠনতন্ত্রে যেভাবে বলা আছে, জেলা পরিষদ সম্পূর্ণ সেভাবে এখনও কার্যকর নয়।

পৌরসভা

গ্রামে যেমন ইউনিয়ন পরিষদ, তেমনি শহরের জন্য রয়েছে পৌরসভা। বর্তমানে বাংলাদেশে ৩২৭টি পৌরসভা রয়েছে।

গঠন

স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন ২০০৯ অনুযায়ী পৌরসভা গঠিত হবে একজন মেয়র, সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত সংখ্যক ওয়ার্ডের সমানসংখ্যক কাউন্সিলর এবং কেবল মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত নির্ধারিত সংখ্যক কাউন্সিলরের সমন্বয়ে। এই সকল পদেই জনগণের দ্বারা প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হওয়ার বিধান রাখা হয়েছে।

কার্যাবলি

পৌরসভা শহরের জনগণের স্থানীয় বহুবিধ সমস্যার সমাধান এবং উন্নয়নমূলক কাজের দায়িত্ব পালন করে। এই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে পৌরসভাকে বহুবিধ কাজ করতে হয়। উল্লেখযোগ্য কাজগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো।

১. পৌর এলাকায় শিক্ষা বিস্তারের জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের জন্য অনুদান প্রদান, হোস্টেল নির্মাণ, মেধাবী ও দরিদ্র শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান, বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র ও নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন, পাঠাগার স্থাপন করা ইত্যাদি কাজ করে।

২. পৌরসভা শহরের জনস্বাস্থ্য রক্ষামূলক কার্যাদি সম্পন্ন করে। জনস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য রাস্তাঘাট, পুকুর, নর্দমা ও ডাস্টবিন নির্মাণ করে। সংক্রামক ও মহামারী ব্যাধি প্রতিরোধ ও প্রতিষেধক দানের ব্যবস্থা করে। হাসপাতাল, মাতৃসদন, শিশুসদন, পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র নির্মাণ ও পরিচালনার ব্যবস্থা করে।

৩. মৃতদেহ দাফনের জন্য গোরস্তান, সৎকারের জন্য শ্মশান ইত্যাদি নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করে। অনাথ ও দুস্থদের জন্য এতিমখানা ও আশ্রম নির্মাণ করে।

৪. জনগণের জন্য নিরাপদ খাওয়ার পানির এবং আবদ্ধ পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করে।

৫. পৌর এলাকার জনগণের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য নৈশপ্রহরী নিয়োগ করে। অপরাধমূলক ও বিপজ্জনক খেলা ও পেশা নিয়ন্ত্রণ করে।

৬. পৌরসভা এলাকার পরিবেশ উন্নয়ন ও সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য রাস্তার ধারে বৃক্ষরোপণ ও বন সংরক্ষণ করে। জনগণের বিনোদনের জন্য পার্ক ও উদ্যান নির্মাণ, মিলনায়তন স্থাপন এবং উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ সংরক্ষণ করে।

৭. পৌর এলাকায় গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগি পালন, খামার স্থাপন, গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগির চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, গবাদি পশু বিক্রি ও রেজিস্ট্রিকরণ, বিপজ্জনক পশু আটক ও হত্যা, পশুর মৃতদেহ অপসারণ ইত্যাদি কাজ করে।

৮. খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধে, পচা ও ভেজাল খাবার বিক্রি বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে। মাদকজাতীয় খাদ্য ও পানীয় অবাধে বিক্রি বন্ধের জন্য এসব দ্রব্য প্রস্তুত, ক্রয়-বিক্রয় এবং সরবরাহের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করে। বিধিনিষেধ লঙ্ঘনকারীকে শাস্তি দেয়।

৯. পরিকল্পিত শহর গড়ার জন্য পৌরসভা বাড়িঘর নির্মাণের অনুমতি দেয়। অননুমোদিত ও বেআইনি নির্মাণ ভেঙে দেয়।

১০. সুপরিকল্পিত সুন্দর শহর গড়া এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য পৌরসভা মহাপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে।

১১. পৌরসভা যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে এবং মোটরগাড়ি ছাড়া অন্যান্য যানবাহনের লাইসেন্স প্রদান করে।

১২. প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় পৌরসভা দুর্গতদের সাহায্য, সেবা এবং ত্রাণের ব্যবস্থা করে।

১৩. পৌরসভা শান্তিপূর্ণ পরিবেশ রক্ষার জন্য সন্ত্রাস দমন ও শান্তি-শৃঙ্খলা ভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

১৪. পৌরসভা সর্বোচ্চ পাঁচ হাজার টাকা মূল্য জড়িত দেওয়ানি ও ছোটখাটো ফৌজদারি মামলার বিচার করতে পারে। এজন্য মেয়র ও চারজন কাউন্সিলরের সমন্বয়ে আদালত গঠন করা হয়।

আয়ের উৎস

বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে পৌরসভা তার ব্যয়ভার নির্বাহ করে থাকে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে– ঘরবাড়ি, দোকানপাট, বিদ্যুৎ, পানি ও অন্যান্য সেবা এবং বিনোদনমূলক বিষয়ের উপর ধার্য কর, মার্কেট ভাড়া, হাট-বাজার ও খেয়াঘাট ইজারা, লাইসেন্স-পারমিট, যানবাহন রেজিস্ট্রেশন ফি, সরকারি বরাদ্দ ইত্যাদি।

সিটি কর্পোরেশন

বাংলাদেশের কয়েকটি প্রধান শহরকে কেন্দ্র করে সিটি কর্পোরেশনগুলো গড়ে উঠেছে। বাংলাদেশের মোট ১২টি সিটি কর্পোরেশন রয়েছে। এগুলো হলো ঢাকায় দুইটি (ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দক্ষিণ), চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, সিলেট, বরিশাল, রংপুর, নারায়ণগঞ্জ, কুমিল্লা, গাজীপুর ও ময়মনসিংহ।

গঠন

প্রত্যেক সিটি কর্পোরেশন নির্ধারিত সংখ্যক ওয়ার্ডে বিভক্ত থাকে। একজন মেয়র, নির্ধারিত ওয়ার্ডের সমানসংখ্যক কাউন্সিলর এবং নির্ধারিত ওয়ার্ডের এক-তৃতীয়াংশ সংখ্যক সংরক্ষিত আসনের মহিলা কাউন্সিলর নিয়ে সিটি কর্পোরেশন গঠিত হয়। মেয়র ও কাউন্সিলরগণ জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হন এবং সংরক্ষিত আসনের মহিলা কাউন্সিলরগণ নির্বাচিত হন কাউন্সিলরদের ভোটে। সিটি কর্পোরেশনের মেয়র প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদা ভোগ করেন। সিটি কর্পোরেশনের মেয়াদ ৫ (পাঁচ) বছর।

কার্যাবলি

মহানগর এলাকার শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা, বিভিন্ন সমস্যার সমাধান এবং উন্নয়নের জন্য সিটি কর্পোরেশন বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করে থাকে। নিচে তা আলোচনা করা হলো।

১. সিটি কর্পোরেশন মহানগরীর রাস্তাঘাট নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করে। মোটরগাড়ি, বাস, ট্রাক ছাড়া অন্যান্য যানবাহনের লাইসেন্স প্রদান করে এবং রাস্তায় যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে।

২. জনস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য সিটি কর্পোরেশন নালা-নর্দমা, রাস্তাঘাট, আবাসিক এলাকা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখে। ময়লা আবর্জনা ফেলার জন্য ডাস্টবিন নির্মাণ, বিভিন্ন স্থানে শৌচাগার, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ইত্যাদি নির্মাণ করে। এছাড়া হাসপাতাল, মাতৃসদন, শিশুসদন, পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র নির্মাণ ও পরিচালনা করে।

৩. জনসাধারণের জন্য নিরাপদ খাওয়ার পানি সরবরাহ, কূপ ও নলকূপ খনন এবং আবদ্ধ পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করে।

৪. সিটি কর্পোরেশন মহানগর এলাকায় পচা-বাসি ও ভেজাল খাদ্যদ্রব্য বিক্রি ও সরবরাহের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করে। খাদ্য ও পানীয় সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করে। খাদ্য ও পানীয় প্রস্তুত, আমদানি ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে লাইসেন্স প্রদান করে।

৫. মহানগর এলাকায় গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগি চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন, গবাদি পশু রেজিস্ট্রিকরণ, বিপজ্জনক পশু আটক ও হত্যা, পশুর মৃতদেহ অপসারণ, হাঁস-মুরগির খামার স্থাপন ইত্যাদি কাজ করে।

৬. মহানগরীর গরিব-দুঃখী মানুষকে সাহায্য করা, অনাথ আশ্রম ও জনকল্যাণ কেন্দ্র স্থাপন, ভিক্ষাবৃত্তি ও পতিতাবৃত্তি রোধ ও পুনর্বাসন, জুয়াখেলা, মাদকাসক্তি ও অসামাজিক কাজ প্রতিরোধের ব্যবস্থা করে।

৭. প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় সিটি কর্পোরেশন ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে।

৮. মহানগরীর নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র, নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করে। শিক্ষা বিস্তারের জন্য নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অনুদান প্রদান, হোস্টেল নির্মাণ, বৃত্তি প্রদান, পাঠাগার নির্মাণ ও পরিচালনা ইত্যাদি কাজ করে।

৯. সাংস্কৃতিক উন্নয়নের জন্য সিটি কর্পোরেশন মিলনায়তন, আর্ট-গ্যালারি, তথ্যকেন্দ্র, জাদুঘর, মুক্তমঞ্চ ইত্যাদি নির্মাণ করে।

১০. মহানগরের পরিবেশের উন্নয়ন ও সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য সিটি কর্পোরেশন রাস্তার পাশে ও উন্মুক্ত স্থানে বৃক্ষরোপণ ও বন সংরক্ষণ করে। জনসাধারণের অবকাশ যাপনের জন্য উদ্যান নির্মাণ করে।

১১. সিটি কর্পোরেশন মহানগর এলাকায় ঘরবাড়ি নির্মাণের অনুমতি প্রদান করে। অননুমোদিত ঘরবাড়িসহ সকল স্থাপনা ভেঙে দেয় এবং অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের ব্যবস্থা করে।

১২. সিটি কর্পোরেশন জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন করে।

১৩. মহানগরীর শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য সিটি কর্পোরেশন ছোটখাটো বিচারকাজ সম্পাদন করে। বিবাদ মীমাংসা ও মহল্লায় শান্তি রক্ষার জন্য শান্তিরক্ষী নিয়োগ করে। মহানগরীতে চুরি-ডাকাতি, হাইজ্যাকরোধ ও সন্ত্রাস দমনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

১৪. সর্বোপরি মহানগরীর সার্বিক উন্নয়নের জন্য সিটি কর্পোরেশন উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে।

আয়ের উৎস

ক. সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক আরোপিত যেকোনো কর, উপকর, টোল ও ফিস ইত্যাদি;

খ. কর্পোরেশনের উপর ন্যস্ত এবং তৎকর্তৃক পরিচালিত সকল সম্পত্তি হতে প্রাপ্ত আয় বা মুনাফা;

গ. সরকার বা অন্যান্য কর্তৃপক্ষের নিকট হতে প্রাপ্ত অনুদান;

২০১৫ ঘ. স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিবিশেষ কর্তৃক প্রদত্ত দান;

ঙ. কর্পোরেশনের উপর ন্যস্ত সব ট্রাস্ট হতে প্রাপ্ত আয়;

চ. কর্পোরেশনের অর্থ বিনিয়োগ হতে প্রাপ্ত মুনাফা;

ছ. অন্যান্য উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থ;

জ. আইনের অধীন অর্থদণ্ড থেকে প্রাপ্ত অর্থ ইত্যাদি।

একক কাজ : সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন করের উৎসের একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বিশেষ স্থানীয় সরকারব্যবস্থা

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বিশেষ স্থানীয় সরকারব্যবস্থা গড়ে উঠার প্রেক্ষাপট অন্যান্য স্থানীয় সরকার থেকে আলাদা। ঐতিহাসিকভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতি ও জীবনযাপন পদ্ধতি বাঙালিদের চেয়ে ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। এ আলাদা পরিচয় প্রতিষ্ঠার জন্য তারা দীর্ঘদিন ধরে সংগ্রাম করে আসছিল। তাদের দাবির ফলেই ১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তির মাধ্যমে এ অঞ্চলে ভিন্ন প্রকৃতির স্থানীয় সরকার কাঠামো গড়ে উঠেছে।

পার্বত্য জেলা পরিষদ

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিভিন্ন ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত একটি অঞ্চল। এছাড়া মূলধারার বাঙালিরাও সেখানে বসবাস করে। এসব অঞ্চলে রয়েছে বিভিন্ন সমস্যা, যা সমাধানে প্রয়োজন বিভিন্ন পদক্ষেপ। এ ছাড়া এ অঞ্চলের প্রকৃতি ও জীবন ধারা আলাদা হওয়ায় এ অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন বিশেষ ধরনের ব্যবস্থা। এ কারণে রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান এ তিন পার্বত্য জেলায় তিনটি বিশেষ ধরনের জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ প্রবর্তন করা হয়। পূর্বে পরিষদের মেয়াদ ছিল ৩ বছর। বর্তমানে তা বাড়িয়ে ৫ বছর করা হয়েছে।

গঠন-কাঠামো ও প্রকৃতি

প্রত্যেকটি জেলা পরিষদ ১ জন চেয়ারম্যান, ৩০ জন সাধারণ সদস্য এবং ৩ জন মহিলা সদস্যসহ সর্বমোট ৩৪ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হবে। এদের সকলে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন। সদস্যদের মধ্যে পাহাড়ি ও বাঙালি উভয় পক্ষের প্রতিনিধি থাকবে। জনসংখ্যার অনুপাত অনুযায়ী কার সংখ্যা কত তা নির্ধারিত হবে। অপরদিকে, মহিলা আসন ব্যতীত পাহাড়িদের জন্য রিজার্ভ আসন বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মধ্যে বণ্টন হবে। ৩ জন মহিলা সদস্যের মধ্যে ২ জন হবেন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর এবং ১ জন হবেন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বাইরের বা বাঙালি। চেয়ারম্যান অবশ্যই ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মধ্য থেকে হবেন। সদস্যদের আসনসংখ্যা

দু'সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হলেও ভোটদান হবে সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে। সংরক্ষিত রিজার্ভ আসন ছাড়াও অন্য আসনে মহিলারা নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবে। একজন সরকারি কর্মকর্তা পরিষদের সচিবের দায়িত্ব পালন করবেন। পরিষদের কার্যকাল হবে ৫ বছর।

দলীয় কাজ : পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ স্থানীয় সরকার পদ্ধতির সাথে দেশের অন্যান্য স্থানীয় সরকারের পার্থক্যের উপর একটি পোস্টার তৈরি কর।

কার্যাবলি

পার্বত্য জেলা পরিষদের কার্যাবলি নিম্নরূপ :

১. স্থানীয় পুলিশ ও জেলার আইন-শৃঙ্খলা সংরক্ষণ, তত্ত্বাবধান ও উন্নতি সাধন।
২. জেলার স্থানীয় কর্তৃপক্ষসমূহের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সমন্বয়সাধন ও বাস্তবায়নে সহযোগিতা দান।
৩. শিক্ষার উন্নয়ন ও বিস্তার এবং প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি।
৪. স্বাস্থ্যরক্ষা, জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি বাস্তবায়ন।
৫. কৃষি ও বন উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ।
৬. পশুপালন।
৭. মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন।
৮. সমবায় আন্দোলনে উৎসাহ প্রদান।
৯. স্থানীয় শিল্প, ব্যবসা ও বাণিজ্যের প্রসার।
১০. অনাথ ও দুস্থদের জন্য আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণসহ অন্যান্য সমাজকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড।
১১. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতি সংরক্ষণ ও এর বিকাশ সাধন। ক্রীড়া ও খেলাধুলার আয়োজন ও উন্নয়ন।
১২. যোগাযোগব্যবস্থার উন্নতি সাধন।
১৩. পানি সরবরাহ ও সেচব্যবস্থার উন্নয়ন।
১৪. ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা।
১৫. পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন।
১৬. স্থানীয় পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন।
১৭. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর রীতিনীতি, প্রথার আলোকে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর বিরোধের বিচার ও মীমাংসা।

আয়ের উৎস

পরিষদের আয়ের উৎসের মধ্যে নিম্নে উল্লিখিত বিষয়াবলি অন্তর্ভুক্ত–

ক. স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরের উপর ধার্য করের অংশ ।

খ. ভূমি ও দালান কোঠার উপর হোল্ডিং কর ।

গ. রাস্তা, পুল ও ফেরির উপর টোল ।

ঘ. যানবাহনের রেজিস্ট্রেশন ফি ।

ঙ. পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের উপর কর ।

চ. শিল্প প্রতিষ্ঠানের উপর হোল্ডিং কর ।

ছ. সামাজিক বিচারের ফি ।

জ. লটারির উপর কর ।

ঝ. চিত্তবিনোদনমূলক কর্মের উপর কর ।

ঞ. বনজ সম্পদের উপর রয়্যালটির অংশবিশেষ ।

ট. খনিজ সম্পদ অন্বেষণ বা উত্তোলনের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুমতিপত্র বা পাট্টা সূত্রে প্রাপ্ত রয়্যালটির অংশবিশেষ ।

ঠ. সরকার কর্তৃক পরিষদকে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে আরোপিত কোনো কর ।

পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ

তিনটি পার্বত্য জেলায় কার্যক্রম সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে ঐ তিন জেলাধীন সমগ্র এলাকাজুড়ে একটি আঞ্চলিক পরিষদ আছে ।

গঠন

১ জন চেয়ারম্যান, ১২ জন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সদস্য, ৬ জন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বাইরের বা বাঙালি সদস্য, ২ জন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মহিলা সদস্য, ১ জন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বাইরের বা বাঙালি মহিলা সদস্য এবং তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের ৩ চেয়ারম্যানসহ সর্বমোট ২৫ জন সদস্য নিয়ে আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত হবে। চেয়ারম্যান অবশ্যই ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর হবেন এবং তিনি প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদা ভোগ করবেন। ১২ জন ক্ষুদ্র

নৃগোষ্ঠীর সদস্যের মধ্যে ৫ জন চাকমা, ৩ জন মারমা, ২ জন ত্রিপুরা, ১ জন মুরং ও তনচৈঙ্গা এবং ১ জন লুসাই, বোম, পাংখো, খুমী, চক ও খিয়াং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হবেন। ৬ জন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সদস্যের মধ্যে প্রতিটি পার্বত্য জেলা হতে ২ জন করে থাকবেন। ২ জন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মহিলা সদস্যের মধ্যে ১ জন চাকমা এবং অপর জন অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবেন। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বাইরের বা বাঙালি মহিলা সদস্য তিন পার্বত্য জেলার বাঙালি মহিলাগণের মধ্য থেকে হবেন। তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানগণ ব্যতীত আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান ও অন্য সকল সদস্য জেলা পরিষদসমূহের সদস্যগণ কর্তৃক পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হবেন। তিন পার্বত্য জেলার চেয়ারম্যানগণ পদাধিকারবলে এর সদস্য হবেন এবং তাঁদের ভোটাধিকার থাকবে। একজন সরকারি কর্মকর্তা পরিষদের নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করবেন। আঞ্চলিক পরিষদের মেয়াদ হবে ৫ বছর।

কার্যাবলি

পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের কার্যাবলি হবে নিম্নরূপ–

১. তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের অধীনে পরিচালিত সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডসহ এদের আওতাধীন এবং এদের উপর অর্পিত বিষয়াদির সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সমন্বয়।

২. পৌরসভাসহ স্থানীয় পরিষদসমূহ তত্ত্বাবধান ও তাদের কর্মকাণ্ডের সমন্বয়সাধন।

৩. পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের কার্যাবলির সার্বিক তত্ত্বাবধান।

৪. পার্বত্য জেলাসমূহের সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা ও উন্নয়নের তত্ত্বাবধান ও সমন্বয়।

৫. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর রীতিনীতি, প্রথা ইত্যাদি এবং সামাজিক বিচার তত্ত্বাবধান ও সমুন্নত রাখা।

৬. জাতীয় শিল্পনীতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পার্বত্য অঞ্চলে ভারী শিল্প স্থাপনে লাইসেন্স প্রদান।

৭. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা এবং এনজিওদের কার্যাবলির সমন্বয়সাধন।

আয়ের উৎস

প্রতি অর্থবছর শুরু হওয়ার পূর্বে পরিষদ ঐ বছরের সম্ভাব্য আয় ও ব্যয়-সম্বলিত বিবরণী বা বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন করবে। নিম্নোক্ত উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থ নিয়ে আঞ্চলিক পরিষদের তহবিল গঠিত হবে–

ক. পার্বত্য জেলা পরিষদের তহবিল হতে প্রাপ্ত অর্থ, যার পরিমাণ সময় সময় সরকার নির্ধারণ করবে।

খ. পরিষদের উপর ন্যস্ত এবং তৎকর্তৃক পরিচালিত সকল সম্পত্তি থেকে প্রাপ্ত অর্থ বা মুনাফা।

গ. সরকার বা অন্যান্য কর্তৃপক্ষের ঋণ ও অনুদান।

ঘ. কোনো প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান।

ঙ. পরিষদের অর্থ বিনিয়োগ থেকে অর্জিত মুনাফা।

চ. পরিষদ কর্তৃক প্রাপ্ত যেকোনো অর্থ।

ছ. সরকারের নির্দেশে পরিষদের উপর ন্যস্ত অন্যান্য আয়ের উৎস থেকে প্রাপ্ত অর্থ ইত্যাদি।

সরকারের সঙ্গে পার্বত্য জেলা ও আঞ্চলিক পরিষদের সম্পর্ক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের আওতায় বিশেষ ব্যবস্থা হিসেবে পার্বত্য জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করা হয়েছে। উভয় পরিষদকে আইন অনুযায়ী নির্দিষ্ট ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রদান করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণ ও আওতাধীন কোনো প্রকারের জমি, পাহাড় ও বনাঞ্চল পরিষদের সাথে আলোচনা ও পরিষদের সম্মতি ব্যতিরেকে সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ ও হস্তান্তর করা যাবে না। আইন প্রণয়ন-সংক্রান্ত ব্যাপারে বলা হয়েছে, সরকার আঞ্চলিক পরিষদ বা পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কে কোনো আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করলে পরিষদ ও সংশ্লিষ্ট পার্বত্য জেলা পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে এবং পরিষদের পরামর্শ বিবেচনাক্রমে আইন প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। জেলা ও আঞ্চলিক পরিষদ আইনের বা কোনো বিধি-বিধানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিধি প্রণয়ন করতে পারবে। যাহোক, আইন প্রণয়নের ক্ষমতা সরকারের হাতে ন্যস্ত। অপরদিকে, সরকার প্রয়োজন দেখা দিলে জেলা পরিষদের কাজকর্মের ব্যাপারে নির্দেশ প্রদান বা অনুশাসন এবং গেজেট আদেশ দ্বারা আঞ্চলিক পরিষদ বাতিল ঘোষণা পর্যন্ত করতে পারবে।

নাগরিকতা বিকাশে স্থানীয় সরকার

বাংলাদেশে শহর ও গ্রামীণ নাগরিকদের সাথে স্থানীয় সরকারের যোগাযোগ ব্রিটিশ শাসনামল থেকেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নাগরিকতার বিকাশে স্থানীয় সরকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। নিচে তা আলোচনা করা হলো।

১) **নাগরিক সেবা প্রদানে স্থানীয় সরকার :** সকল শ্রেণির মানুষ তাদের নানা প্রয়োজনে স্থানীয় সরকার দপ্তরে যোগাযোগ করে। যেমন- শিক্ষার্থীদের পিতার আয়ের সনদপত্র সত্যায়িতকরণে এবং জন্মনিবন্ধনের সার্টিফিকেট তোলার প্রয়োজনে ইউনিয়ন পরিষদ অফিসে যেতে হয়। ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা নাগরিকদেরকে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সেবা প্রদান নিশ্চিত করার বিবরণ প্রকাশ করে, যা 'নাগরিক সনদ' নামে পরিচিত।

নাগরিক সেবা সহজলভ্য করার জন্য স্থানীয় পর্যায়ে বর্তমান ই-গভার্নেন্স চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে ঘরে বসে মানুষ বিভিন্ন বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য দ্রুত গতিতে লাভ করতে পারবে।

স্থানীয় সরকারের ক্ষেত্রে নতুন এই সংযোজন এক যুগান্তকারী ঘটনা। এ ব্যবস্থা নাগরিক অধিকার অর্জনে পূর্বের চেয়ে বেশি সহায়ক হবে।

২. **স্থানীয় শাসনে জনগণের অংশগ্রহণ :** গ্রামে স্থানীয় সরকারের ভূমিকা গ্রামের মানুষদেরকে সরকারের সাথে সংযুক্ত করে। ইউনিয়ন পরিষদ গ্রামীণ বিবাদ সমাধানে সক্রিয় ভূমিকা রাখে।

৩. বিবাদ নিষ্পত্তি

যেকোনো বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য ইউনিয়ন পরিষদ আয়োজিত সালিশ বা অনানুষ্ঠানিক নিষ্পত্তির ব্যবস্থা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এ ক্ষেত্রে সরকার প্রতিষ্ঠিত গ্রাম আদালত গ্রামীণ জনগণের বিবাদ নিষ্পত্তিতে আরও কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে বলে আশা করা যায়। এর ফলে গ্রামের গরিব মানুষ শহরে এসে বিচারের জন্য হয়রানির শিকার হওয়া থেকে রক্ষা পাবে।

কেস ১ : ধনিয়া ইউনিয়নের ৪ নং ওয়ার্ডের আবুল কালাম ও তার ভাতিজা জমিসংক্রান্ত বিবাদে জড়িয়ে পড়ে এবং এ ঝগড়া কয়েক বছর ধরে চলতে থাকে। ইউনিয়ন পরিষদের নেতৃত্বে সালিশের মাধ্যমে এ সমস্যা সমাধান করা হয়। যদি আবুল কালাম এ মামলা নিয়ে জেলা পর্যায়ে যেত, তাহলে তার অনেক অর্থ ও সময় নষ্ট হতো। এ অপচয়ের হাত থেকে আবুল কালাম রক্ষা পেল।

জোড়ায় কাজ : আবুল কালামের জমি সংক্রান্ত বিবাদটি মীমাংসায় তার স্থানীয় সরকারের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।

৪. নারীর ক্ষমতায়ন

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক হলো নারী। সমাজের অর্ধেক অংশকে অধিকারবঞ্চিত রেখে কোনো সমাজ উন্নতি লাভ করতে পারে না। তাই বর্তমানে সারা বিশ্ব নারীর ক্ষমতায়নকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। পরিবার, সমাজ ও জাতীয় ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ, মতামত প্রকাশ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাই নারীর ক্ষমতায়ন। নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের অধিকারের সমতা বজায় রাখতে হবে। এর গুরুত্ব উপলব্ধি করে ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র প্রকাশ করে এবং নারী উন্নয়নে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ১৯৫১ সালে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) কর্তৃক একই ধরনের কাজের জন্য নারী ও পুরুষ শ্রমিকের জন্য একই বেতন দান এবং ১৯৫২ সালে নারীর রাজনৈতিক অধিকারের কথা ঘোষণা করে। যার ফলে নির্বাচনে নারী ভোট দান ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে। ১৯৬০ সালে নারীদের কর্ম সংস্থান ও পেশার ক্ষেত্রে বৈষম্য বিলোপ সনদ প্রদান করা হয় যা ১৯৭৯ সালের ডিসেম্বর মাসে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত হয়। বাংলাদেশসহ মোট ১৩২টি দেশ বর্তমানে এ সনদ সমর্থন করেছে।

স্থানীয় সরকারে নারীর অংশগ্রহণ আগের যেকোনো সময়ের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। নারীরা ইউনিয়ন পরিষদ থেকে শুরু করে উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন সর্বত্র নির্বাচনে জয়লাভ করে নাগরিক হিসেবে স্থানীয় সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণকে প্রভাবিত করতে সক্ষম হচ্ছে।

উল্লেখ্য, ১৯৯৭ সালের প্রণীত আইন অনুযায়ী বাংলাদেশে ৪৪৯৮টি ইউনিয়ন পরিষদে ১৩,৪৫২টি নারী সদস্য পদ সৃষ্টি করা হয়। এই আইনের মাধ্যমে প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদে ৩টি করে সংরক্ষিত নারী আসনের ব্যবস্থা রাখা হয়, যারা সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়। স্থানীয় সরকারের অন্যান্য স্তরেও নারীর অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর ফলে নারীর ক্ষমতায়নের পথ সুগম হয়েছে।

৫. সংখ্যালঘুর অধিকার প্রতিষ্ঠা

এখন ধর্মীয়, লিঙ্গ পার্থক্য বা জাতিগত পরিচয় নাগরিক অধিকার অর্জনে আর কোনো প্রতিবন্ধকতা নয়। পার্বত্য তিন জেলায় বিশেষ ধরনের স্থানীয় সরকারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ঐ অঞ্চলে বসবাসকারী ১৩টি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করা হয়েছে।

এর ফলে ঐ অঞ্চলের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিক্ষা-দীক্ষা এবং অন্যান্য সামাজিক, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের উন্নয়নের মধ্য দিয়ে তারা বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে যোগ্য মর্যাদা অর্জন করতে পারছে।

সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীতে (জুলাই ২০১১) পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর স্বতন্ত্র পরিচয়কে স্বীকৃতি দিয়ে তাদের নাগরিক অধিকারের মর্যাদা আরও শক্তিশালী করা হয়েছে।

৬. গণতান্ত্রিক মনোভাব এবং নেতৃত্বের বিকাশ

জাতীয় পর্যায়ে যেমন নাগরিকরা ভোটাধিকার ভোগ করে থাকে, তেমনি স্থানীয় পর্যায়েও নাগরিকরা এই অধিকার ভোগ করে। স্থানীয় সরকার নির্বাচনে জনগণের ভোট প্রদানের হার জাতীয় নির্বাচনের চেয়েও বেশি। এই নির্বাচনে ভোট দিয়ে মানুষ তাদের স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি নির্বাচন করে। জাতীয়ভাবে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের থেকে স্থানীয় পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধির পার্থক্য হচ্ছে তাদেরকে মানুষ বেশি কাছে পায়। কারণ তারা স্থানীয় জনগণের কাছাকাছি থাকে। ফলে স্থানীয় নাগরিকরা তাদের জবাবদিহি করতে বাধ্য করতে পারে। বিশেষ করে ইউনিয়ন পরিষদের ক্ষেত্রে এটি অধিকতর সত্য। স্থানীয় পর্যায়ে এই ভোটাধিকার চর্চা নাগরিকদের গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন করে। এর ফলে স্থানীয় নেতৃত্বের বিকাশ ঘটে যা পরবর্তীতে জাতীয় নেতৃত্বেও অবদান রাখে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বাংলাদেশে মোট ইউনিয়ন পরিষদের সংখ্যা কত ?

ক) ১১৮ খ) ৪৬০

গ) ৪৮৩ ঘ) ৪৫৫৪

২. ডাস্টবিন নির্মাণ পৌরসভার কোন ধরনের কাজ ?

ক) উন্নয়নমূলক খ) জনস্বাস্থ্যমূলক

গ) শান্তিপূর্ণ পরিবেশ রক্ষা সংক্রান্ত ঘ) সৌন্দর্য রক্ষা সংক্রান্ত

৩. নাগরিক সেবা প্রদানের জন্য স্থানীয় সরকার

i. আয়ের সনদপত্র সত্যায়িত করে

ii. জন্ম নিবন্ধন সনদ প্রদান করে

iii. নাগরিক সনদ প্রদান করে

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক) i ও ii　　খ) ii ও iii

গ) i ও iii　　ঘ) i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

জনাব রাশেদ একটি স্থানীয় পর্যায়ের সরকারপ্রধান। তিনি পচা, বাসি ও ভেজাল খাদ্যদ্রব্য বিক্রি ও সরবরাহের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মহানগরের হোটেল ও রেস্টুরেন্টগুলোতে অভিযান চালান এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

৪। জনাব রাশেদ কোন স্থানীয় সরকারের প্রধান ?

ক) সিটি কর্পোরেশন　　খ) জেলা পরিষদ

গ) উপজেলা পরিষদ　　ঘ) পৌরসভা

৫। উক্ত সরকার গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণ হলো–

ক) রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয়

খ) জনগণের মধ্যে নাগরিক সচেতনতা বৃদ্ধি পায়

গ) স্থানীয় পর্যায়ে নাগরিক সেবা নিশ্চিত করা হয়

ঘ) শিক্ষার হার বৃদ্ধি পায়।

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। জনাব রমজান আলী একটি উপজেলা শহরের স্থানীয় সরকারের প্রধান। তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে জনগণের চাহিদা পূরণের জন্য ঘরবাড়ি, দোকানপাট, হাটবাজার, যানবাহন ইত্যাদি থেকে অর্থ সংগ্রহ করে মহল্লার মোড়ে মোড়ে ডাস্টবিন নির্মাণ, নর্দমা ও পুকুর পরিষ্কার করে মশার ঔষধ ছিটানোর ব্যবস্থা করেন। কয়েকটি মাতৃসদন স্থাপন করে বিনামূল্যে শিশু ও প্রসূতি মায়েদের সেবা প্রদানের ব্যবস্থা করেন।

ক. বর্তমানে বাংলাদেশে সিটি কর্পোরেশনের সংখ্যা কত?

খ. পাঠাগার স্থাপন পৌরসভার কোন ধরনের কাজ– ব্যাখ্যা কর।

গ. জনাব রমজান আলীর কাজগুলোর মূল উদ্দেশ্য কী? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. অনুচ্ছেদে উল্লেখিত কাজগুলো কি জনাব রমজান আলীর এলাকার উন্নয়নের জন্য যথেষ্ট? তোমার মতামত দাও।

২। বেগম কামরুন নাহার জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তার এলাকা থেকে জনগণের ভোটে নির্বাচিত হওয়ার পর প্রথমে তিনি স্থানীয় ও জাতীয় নির্বাচনে সংরক্ষিত আসন ছাড়াও অন্যান্য আসনে নারীদের প্রতিযোগিতা করার জন্য অনুপ্রাণিত করেন। পরে তিনি একটি নারী শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে নারীদের সেলাই শিক্ষা, বাঁশ ও বেতের কাজ, হাঁস-মুরগি পালন ও কম্পিউটার প্রশিক্ষণদানের ব্যবস্থা করেন। তিনি শিক্ষিত মেয়েদেরকে সরকারি বেসরকারি চাকরিসহ যেকোনো পেশায় অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেন।

ক. ১৯৯৭ সালে প্রণীত আইনে ইউনিয়ন পরিষদে কতটি নারী সদস্যপদ সৃষ্টি করা হয়েছে?

খ. নারীর ক্ষমতায়ন বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর।

গ. বেগম কামরুন নাহারের প্রথম কাজটি নারীর কোন ধরনের ক্ষমতায়নকে নির্দেশ করছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'নারী শিক্ষা কেন্দ্রে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ নারীদের স্বাবলম্বী করে তুলবে।" – পক্ষে যুক্তি দাও।

নবম অধ্যায়

নাগরিক সমস্যা ও আমাদের করণীয়

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোতে নাগরিকতা ও পৌরনীতির সম্পর্ক, নাগরিকতার ধারণা, সুনাগরিকের গুণাবলি, নাগরিকের সাথে সরকার ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। এসব ধারণা ব্যবহার করে বর্তমান অধ্যায়ে আমরা নাগরিক জীবনে নানাবিধ সমস্যাবলি এবং সমাধানের উপায় সম্পর্কে আলোচনা করব।

এ অধ্যায় পাঠের মাধ্যমে আমরা –

- আমাদের নাগরিক জীবনের প্রধান সমস্যাগুলো চিহ্নিত করতে পারব।
- জনসংখ্যা সমস্যার কারণ ও এর প্রভাব এবং সমাধানের উপায় বিশ্লেষণ করতে পারব।
- নিরক্ষরতার কারণ, প্রভাব ও সমাধানের উপায় বর্ণনা করতে পারব।
- খাদ্যনিরাপত্তাজনিত সংকটের কারণ ও প্রতিকারের উপায় ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পরিবেশগত দুর্যোগের ধারণা বর্ণনা করতে পারব।
- পরিবেশগত দুর্যোগ মোকাবেলার উপায় বর্ণনা করতে পারব।
- সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদের উৎস, সমাজ জীবনে এর প্রভাব এবং তা নিরসনের উপায় ব্যাখ্যা করতে পারব।
- নারী নির্যাতনের কারণ ও প্রতিকারের উপায় বর্ণনা করতে পারব।
- নাগরিক সমস্যা সমাধানে নাগরিকের ভূমিকা নির্ণয় করতে পারব।

আমরা সবাই বাংলাদেশের নাগরিক। নাগরিক হিসেবে আমরা শহর অথবা গ্রামে বাস করি। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আমাদের অবস্থান হয় প্রথমে পরিবারে, তারপর সমাজে, তারপর রাষ্ট্রে। এসব ক্ষেত্রে বসবাস করতে গিয়ে আমরা বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধার পাশাপাশি নানারকম অসুবিধা বা সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকি। নাগরিক জীবনের এ ধরনের কিছু সমস্যা ও তার প্রতিকার সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো।

১. জনসংখ্যা সমস্যা ও প্রতিকার

জনসংখ্যা সমস্যা কী?

মানুষের জন্মহার মৃত্যুহারকে ছাড়িয়ে গেলে এবং এই জন্মহার দেশের সম্পদের বৃদ্ধিকে ছাড়িয়ে গেলে জনসংখ্যা একটি দেশের সমস্যায় পরিণত হয়। কারণ, বাড়তি জনসংখ্যার চাহিদা দেশের সীমিত সম্পদ দিয়ে পূরণ করা সম্ভব হয় না। জনসংখ্যা সমস্যা বাংলাদেশ ও বিশ্বের একটি অন্যতম প্রধান সমস্যা তবে কেউ কেউ আবার পৃথিবীতে অশান্তি, ক্ষুধা-দারিদ্র্য, বর্ণবৈষম্য, স্বাস্থ্য ইত্যাদি সমস্যার তুলনায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি সমস্যাকে সামান্য হিসেবে বিবেচনা করেন। কোনো কোনো অঞ্চলে আবার জনসংখ্যার বৃদ্ধি প্রয়োজন, কেননা উৎপাদন কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য শ্রমিকের দরকার হয়। আরেকটি মত অনুসারে, শুধু জনসংখ্যা বৃদ্ধিই সর্বত্র সব সমস্যার জন্য দায়ী নয়। ভবিষ্যৎ বংশধরদের স্বার্থের কথা বিবেচনা করে বিশ্ব জনসংখ্যার বর্তমান বৃদ্ধির হার কমানোর প্রয়োজন রয়েছে।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা সমস্যার চিত্র

জনসংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশ পৃথিবীতে ৮ম এবং এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে ৫ম স্থানে অবস্থান করছে। এদেশের ক্ষেত্রফল মাত্র ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটার। বাংলাদেশের জনসংখ্যা প্রায় ১৫ কোটি এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৩৭(২০১১)। বাংলাদেশে প্রতি বর্গ কিলোমিটার জায়গায় ১১০০ মানুষ বাস করে, যেখানে চীনে ১.৪ বিলিয়ন লোকসংখ্যা থাকা সত্ত্বেও প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ১৪০ জন লোক বাস করে আর ভারতে ১.২ বিলিয়ন লোকসংখ্যা সত্ত্বেও প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৩৬২ জন বাস করে।

অধিক জনসংখ্যা বাংলাদেশের নাগরিক জীবনের একটি অন্যতম প্রধান সমস্যা। অধিক জনসংখ্যার কারণে শহর ও গ্রামে জীবনযাপন কষ্টকর হয়ে পড়েছে। শহরে জনসংখ্যার চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যুৎ, পানি ও গ্যাস সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে না। প্রতিনিয়ত বিদ্যুতের লোডশেডিং এবং পানির অপর্যাপ্ত সরবরাহের কারণে নাগরিক জীবন কষ্টকর হয়ে পড়েছে। গ্রামে অধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ না থাকায় সেখানকার বেকার মানুষ শহরে পাড়ি দিচ্ছে। গ্রামেও অধিক জনসংখ্যাজনিত কারণে পর্যাপ্ত খাবারের অভাব দেখা দেয়, উপযুক্ত শিক্ষার সুযোগ থাকে না, অপুষ্টি এবং চিকিৎসার অভাব প্রতিনিয়ত পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া আমাদের দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে আবাদী জমিতে এবং বনভূমি কেটে বসতি গড়ে উঠছে। অতিরিক্ত জনসংখ্যার ফলে খাল-বিল, নদী-নালা ভরাট হয়ে যাচ্ছে। এতসব সমস্যা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ বিদেশে জনশক্তি রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করার মাধ্যমে এই সমস্যাকে সম্ভাবনায় পরিণত করছে। কিন্তু মোট জনসংখ্যার তুলনায় তা এখনো যথেষ্ট নয়।

বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ

জলবায়ুর প্রভাব : বাংলাদেশ গ্রীষ্মমণ্ডলে অবস্থিত। তাই এদেশের জলবায়ু উষ্ণ। উষ্ণ জলবায়ুর প্রভাবে এখানকার ছেলেমেয়েরা অপেক্ষাকৃত কম বয়সে সাবালক হয় ও সন্তান ধারণক্ষমতার অধিকারী হয়। ফলে এখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি।

বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ : বিবাহ আমাদের দেশে একটি ধর্মীয় কর্তব্য বলে মনে করা হয়। এ কর্তব্যবোধের তাড়নায় বিশেষ করে বাবা-মা তাড়াতাড়ি তাদের ছেলেমেয়েদের বিয়ে দিতে তৎপর হন। ফলে বাল্যবিবাহ আমাদের সমাজে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। কম বয়সে বিয়ে হওয়ার কারণে তাদের সন্তান-সন্ততির সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এছাড়া কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায়, একজন পুরুষ একাধিক বিয়ে করে। বিশেষ করে অল্প আয়ের পরিবারগুলোতে এ প্রবণতা বেশি থাকে। এভাবে বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহের ফলে বাংলাদেশের জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

দারিদ্র্য : আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ দরিদ্র। দরিদ্র মানুষের জীবনের মানও কম। তারা পরিবারের সদস্যদের ভরণ পোষণের কোনো সুদূরপ্রসারী চিন্তা করে না। অন্যদিকে ভবিষ্যতের চিন্তায় তারা অধিক সন্তান জন্মদান করে। ফলে স্বাস্থ্যহীন জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা : আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক মনে করেন যে, পুত্র সন্তান বৃদ্ধ পিতামাতাকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা দিতে সক্ষম। অধিক নিরাপত্তার আশায় তাঁরা একাধিক পুত্র সন্তান কামনা করেন। ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

শিক্ষার অভাব : শিক্ষার অভাব ও অজ্ঞতার কারণে ছেলেমেয়েদের খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান সম্বন্ধে চিন্তাভাবনা না করেই আমাদের দেশের মানুষ অধিক সন্তান জন্ম দিয়ে থাকে। ফলে জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি : আমাদের দেশের অধিকাংশ বাবা-মা ছেলেমেয়ে বড় হলে বিয়ে না দিলে কখন, কোথায়, কোন সামাজিক অপরাধ করে বসবে এই ভয়ে ভীত থাকে। এই ভয় এবং সমাজের চোখে হেয় হওয়ার আশঙ্কায় তারা দ্রুত ছেলেমেয়েদের বিয়ে দিয়ে বিপদ এড়াতে চেষ্টা করে। এতে করে জনসংখ্যা অধিক হারে বেড়ে যাচ্ছে।

জন্মশাসনের অভাব : ছোট পরিবার সুখী পরিবার–এরূপ সচেতনতার অভাব আমাদের দেশে বেশি। তাছাড়া পরিবার পরিকল্পনার সুবিধাদির অভাব থাকায় এবং এ ব্যাপারে সচেতন না হওয়ার কারণে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের উপায় : সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ

দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশে বহুবিধ সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। এ ব্যাপক জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করতে না পারলে দেশে ভয়ানক পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা যেতে পারে।

জনসংখ্যার পুনর্বণ্টন : বাংলাদেশের সর্বত্র জনসংখ্যার অবস্থান একই রকম নয়। কাজেই যেখানে জনসংখ্যার ঘনত্ব খুব বেশি সেখান থেকে অল্প ঘনত্ব এলাকায় জনসংখ্যা সরিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে জনসংখ্যা পুনর্বণ্টন করতে হবে। এতে জনগণের কর্মসংস্থান হবে আর জীবনযাত্রার মানও বেড়ে যাবে।

জনশক্তি রপ্তানি : আমাদের দেশে শ্রমিকের মজুরি কম। কারণ, শ্রমিকের আধিক্য। বিপুল জনসংখ্যাকে প্রযুক্তি ও দক্ষতাভিত্তিক প্রশিক্ষণ দিয়ে মধ্যপ্রাচ্য, দূরপ্রাচ্য, আফ্রিকা ও পাশ্চাত্যের উন্নত দেশে প্রেরণের ব্যবস্থা নিতে হবে। এতে বৈদেশিক মুদ্রায় আয় বাড়বে আর বেকারত্ব দূর হবে। জনশক্তি মন্ত্রণালয়কে এ ব্যাপারে উদ্যোগী হতে হবে।

কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ও আয় পুনর্বণ্টন : জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের জন্য জনগণের জীবনমান বৃদ্ধি করতে হবে। জনগণের জীবনমান তখনই বৃদ্ধি পাবে যখন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে, তাদের আয় বৃদ্ধি পাবে। যারা ধনী তাদের উপর অধিক হারে কর ধার্য করে আদায়কৃত করের টাকা দিয়ে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করতে হবে। মানুষকে কাজ দিতে পারলে এবং অভাব থেকে মুক্ত করতে পারলে তারা নিজেরা আত্মসচেতন হবে এবং দায়দায়িত্ব বুঝতে পারবে।

শিক্ষার প্রসার : শিক্ষা মানুষকে সচেতন করে। শিক্ষিত জনগোষ্ঠী জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সচেষ্ট থাকে। ছোট পরিবারের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে শিক্ষিত পরিবার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমিয়ে আনে।

২০১৯

অর্থনৈতিক উন্নয়ন : কৃষির উন্নয়ন, শিল্পের উন্নয়ন, উন্নত বাজার সৃষ্টি এবং উন্নত যোগাযোগব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নতি ত্বরান্বিত করতে হবে। উচ্চ ফলনশীল ফসল আবাদ, একই জমিতে একাধিক ফসল চাষাবাদ করতে হবে। কাঁচামাল তৈরি করে শিল্প গড়ে তুলতে হবে। কুটির শিল্পের তৈরি মালামাল দিয়ে বৃহৎ শিল্প গড়ে তুলতে হবে। কৃষিজাত দ্রব্য ও শিল্পজাত দ্রব্য যাতে ন্যায্যমূল্যে ও সহজে বিক্রি করা যায় তার জন্য বাজার এবং যোগাযোগব্যবস্থার উন্নতি করতে হবে। এসব করতে সক্ষম হলে জনসংখ্যা সমস্যা না হয়ে জনসম্পদে পরিণত হবে।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা : উচ্চ জন্মহার রোধ করে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। 'একটি সন্তান কাম্য, দুটি যথেষ্ট'–এই শ্লোগানকে কার্যকর করতে হবে। এ ব্যাপারে নাগরিক সচেতনতা ও সরকারের দায়-দায়িত্ব বেশি। নাগরিকবৃন্দকে ভাবতে হবে যে অধিক সন্তান জন্ম দেওয়ার মধ্যে কোনো কৃতিত্ব নেই। তাই তাদের পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। অপরদিকে সরকারকে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়কে অধিক হারে মাঠকর্মী নিয়োগ করতে হবে। জন্মনিয়ন্ত্রণের ঔষধপত্র সহজলভ্য করতে হবে এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের সেবা দেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে ক্লিনিক গড়ে তুলতে হবে। তাছাড়া জন্মনিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে গণসচেতনতা বৃদ্ধি পাবে।

জনসংখ্যানীতি গ্রহণ : ১৯৭৬ সালের জনসংখ্যানীতিকে আরও সংস্কার করে ২০০৪ সালে সরকার নতুন জনসংখ্যানীতি গ্রহণ করে। এই নীতির আওতায় সরকার জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- সকলের জন্য পরিবার পরিকল্পনাসহ সন্তান উৎপাদন সম্পর্কিত স্বাস্থ্যসেবা সহজলভ্য করা এবং এর প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা। পাশাপাশি কিশোর-কিশোরীদের সচেতন করার জন্য জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে তথ্য, উপদেশ ও সেবা প্রদানের ব্যবস্থা করা; গণমাধ্যমকে ব্যবহার করে জন্মনিয়ন্ত্রণের কুফল সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করা; নারী-পুরুষের সমতা এবং নারীর ক্ষমতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সহায়তা করা। জনসংখ্যানীতির এসব দিক বাস্তবায়ন করতে হবে।

সুবিধাবঞ্চিতদের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে উদ্বুদ্ধকরণ : বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে জনসংখ্যা কার্যক্রমের ক্ষেত্রে সেবাবঞ্চিত এলাকাসমূহে সেবার মান উন্নত করতে হবে এবং গরিব ও দুস্থদেরকে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে সরকারি ও বেসরকারি চিকিৎসকগণকে একসাথে কাজ করতে হবে। ক্ষুদ্রঋণের ব্যবস্থা করে মহিলাদের ঘরের বাইরে এনে নতুন পেশা গ্রহণের সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে তাদেরকে অধিক সন্তান উৎপাদন করা থেকে বিরত থাকার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

একক কাজ : তোমার প্রতিবেশীদের মধ্যে অধিক জনসংখ্যার একটি পরিবার চিহ্নিত করে পরিবারটির সমস্যার ধরন ও প্রভাব অনুসন্ধান কর।

জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানে নাগরিক হিসেবে আমাদের করণীয়

বাংলাদেশে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ জরুরি। সচেতন নাগরিক হিসেবে জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানে ভূমিকা রাখা সকলের নাগরিক দায়িত্ব। প্রথমত, জনসংখ্যা বৃদ্ধির কুফল সম্পর্কে নাগরিক হিসেবে আমরা নিজেরা সচেতন হতে পারি এবং অন্যকেও সচেতন করতে পারি। দ্বিতীয়ত, আমাদের বা প্রতিবেশী পরিবারে কোনো নিরক্ষর শিশু বা ব্যক্তি থাকলে তাদেরকে আমরা শিক্ষার সুযোগ দিয়ে উৎসাহিত করতে পারি, যাতে সে জনসম্পদ হয়ে গড়ে উঠতে পারে। সম্পদের তুলনায় অধিক জনসংখ্যা যেমন একটি পরিবারের জন্য অভিশাপ, তেমনি তা জাতির জন্যও বোঝা। অন্যদিকে, জনসংখ্যা যে পরিমাণে আছে তাদেরকে যথার্থ শিক্ষার মাধ্যমে দক্ষ করতে পারলে তা জাতির জন্য সম্পদে পরিণত হবে।

২. নিরক্ষরতা

নিরক্ষরতা বাংলাদেশের একটি অন্যতম নাগরিক সমস্যা। লেখাপড়া না জানার কারণে নিরক্ষর ব্যক্তি রাষ্ট্র ও সমাজের উপকারে আসেনা বরং সমাজের বোঝা স্বরূপ। বাংলাদেশের অধিকাংশ লোকই গ্রামে বাস করে। নিরক্ষর বলতে সেই ব্যক্তিকে বুঝায়, যার কোনো অক্ষর জ্ঞান নেই, এমনকি যিনি তার নাম পর্যন্ত লিখতে পারেন না। আমাদের দেশে গ্রামের বহু লোকই নিরক্ষর। শহরাঞ্চলেও অনেক নিরক্ষর লোক আছে। সরকারের প্রাথমিক এবং গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ১৯৯৭ সালে 'সম্পূর্ণ সাক্ষরতা আন্দোলন' (Total Literacy Movement) শুরু করে। সম্পূর্ণ সাক্ষরতা আন্দোলনের মাধ্যমে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ২০১৪ সালের মধ্যে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করার রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

দরিদ্র শ্রেণির মধ্যে নিরক্ষরতার হার খুবই বেশি। এর মূল কারণ তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা। দরিদ্র শ্রেণির সন্তানেরা মেধাবী হওয়া সত্ত্বেও লেখাপড়া করতে পারে না। অনেক দরিদ্র শিক্ষার্থী টাকার অভাবে উচ্চতর ডিগ্রি নেওয়া পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। এর মধ্যেও অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তি, বেসরকারি ব্যাংক এবং সংস্থা অর্থ সাহায্য দিয়ে দরিদ্র অথচ মেধাবী শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া অব্যাহত রাখতে অবদান রাখছে।

নিরক্ষরতা দূরীকরণ : সরকার ও নাগরিকের করণীয়

নিরক্ষরতা জাতীয় সমস্যা। একে মোকাবিলা করা সবার দায়িত্ব। নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে দেশকে রক্ষা করতে হলে সরকার ও নাগরিকের ভূমিকা সমান গুরুত্বপূর্ণ।দেশের প্রায় অর্ধেক জনসংখ্যা নিরক্ষর। এই বিশাল নিরক্ষর জনসমষ্টিকে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন করা একা সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। শিক্ষিত সকল মানুষকে এ দায়িত্ব নিতে হবে। আর যারা নিরক্ষর, তাদের নিজেদেরকেও লেখাপড়া শিখতে আগ্রহী হতে হবে। সকলে সম্মিলিতভাবে এ সমস্যার সমাধান করতে পারলে জাতীয় উন্নয়ন অর্জন করা সম্ভব হবে।

দেশের বিপুল সংখ্যক মানুষকে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন করার জন্য সরকার ও নাগরিকবৃন্দকে যেসব কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে, সেগুলো আলোচনা করা হলো।

তথ্য সংগ্রহ

নিরক্ষর মানুষের সঠিক সংখ্যা ও অবস্থান নির্ধারণ করতে হবে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন এলাকা ও অবস্থানভেদে প্রচলিত পেশার সমস্যা ও সমস্যার কারণ নির্ণয় করতে হবে। সরকার প্রকল্প গ্রহণ ও টাস্কফোর্স গঠন করে এ কাজটি করতে পারে। সঠিক তথ্য দেওয়ার জন্য নাগরিকদের স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসতে হবে।

বয়স্ক শিক্ষা

গ্রামে গ্রামে বয়স্ক শিক্ষা ও খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষাদানে সরকারকে বিশেষ কর্মসূচি নিতে হবে অথবা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে (এনজিও) নিয়োজিত করতে হবে। এ ব্যাপারে আমাদের শিক্ষিত বেকারদেরও কাজে লাগানো যেতে পারে।

কর্মমুখী শিক্ষা

আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পরিবর্তে পেশাভিত্তিক শিক্ষার জন্য বই রচনা করা প্রয়োজন। শুধু আনুষ্ঠানিক শিক্ষা নিরক্ষর বয়স্কদের খুব একটা কাজে আসবে না। কিছুদিন পর তারা তাদের শিক্ষা ভুলে যেতে পারে। কর্মমুখী শিক্ষাদান করে প্রত্যেক পেশার সঙ্গে নিরক্ষরদের পরিচিত করে তুলতে হবে। তাহলে তারা অর্জিত শিক্ষা ও অক্ষরজ্ঞান সহজে ভুলবে না।

শিক্ষার জন্য ঋণ ও অনুদান প্রথা চালুকরণ

সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য অনুদান ও বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা নিতে হবে। যদিও নিরক্ষরদের শিক্ষা আনুষ্ঠানিক নয়, তবুও তাদেরকে বৃত্তি ও উপবৃত্তি দিলে তারা শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী হবে। এরূপ ঋণ, অনুদান, বৃত্তি ও উপবৃত্তি প্রদান করা একা সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে আমাদের শিক্ষিত ও সম্পদশালীদের এগিয়ে আসতে হবে। জনগণ ও রাষ্ট্রের উন্নয়নের জন্য বদান্যতার মনোভাব নিয়ে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।

শিক্ষা ব্যাংক চালুকরণ

নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য শিক্ষা ব্যাংক চালু করা যেতে পারে। এরূপ ব্যাংক শুধু নিরক্ষরদের ক্ষেত্রে ঋণ দেবে না বরং প্রাথমিক শিক্ষা থেকে শুরু করে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা পর্যায়ে শিক্ষাঋণ প্রদান করবে। শিক্ষার্থী ঝরে পড়া বন্ধ করতে হলে আর্থিক সহায়তা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে শিক্ষা ব্যাংক প্রতিষ্ঠা একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হতে পারে। সরকার আন্তরিক হলে এরূপ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা ও চালু করা সম্ভব।

নাগরিকদের অংশগ্রহণ

নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে কাজে লাগাতে হবে। শিক্ষা উপকরণ থেকে শুরু করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ব্যাপারে নাগরিকদের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করতে হবে। এ ব্যাপারে দেশের বেশ কয়টি এনজিও যেমন– আহসানিয়া মিশন, ব্র্যাক, স্বনির্ভর বাংলাদেশ, প্রশিকা, কেয়ার, সিডা, ইউসেপ প্রভৃতি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সরকার ও নাগরিকদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিরক্ষরতা দূর করা সম্ভব হলে জাতীয় অগ্রগতির শক্ত ভিত রচিত হবে। অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ পেশাভিত্তিক শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে জনশক্তিতে পরিণত হবে।

নিরক্ষরতা দূরীকরণে ব্যক্তিগতভাবে আমরা আমাদের বাসায় কেউ নিরক্ষর থেকে থাকলে তাকে অক্ষরজ্ঞান দিতে পারি। অথবা বন্ধুদের সাথে মিলে আমরা নিরক্ষরতা দূরীকরণে ক্লাব গড়ে তুলতে পারি। আমরা দরিদ্র ছেলেমেয়েদের স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে প্রাথমিক অক্ষরজ্ঞান দিতে পারি। নাগরিক হিসেবে আমাদের এই কাজ জাতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। কেননা শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড।

৩. খাদ্যনিরাপত্তা

খাদ্যনিরাপত্তা কী?

খাদ্যনিরাপত্তা বলতে কেবল খাদ্য প্রাপ্তিকে বোঝায় না। খাদ্যের প্রাপ্যতা, খাদ্য ক্রয় করার ক্ষমতা এবং খাদ্যের পুষ্টি–এই তিনটি বিষয়কেই বোঝানো হয়। অবশ্য বাংলাদেশের মানুষের খাদ্যে যেহেতু খাদ্যশস্য, বিশেষ করে চাউলের প্রাধান্য রয়েছে, সেহেতু চাউলের সরবরাহ এবং মূল্যের স্থিতিশীলতাই খাদ্যনিরাপত্তা অর্জনের মূল বিষয়।

বাংলাদেশে খাদ্যনিরাপত্তাহীনতার প্রকৃতি

বর্তমানে বাংলাদেশের প্রায় অর্ধেক জনসংখ্যা খাদ্যভিত্তিক দারিদ্র্যের শিকার। মাথাপিছু দৈনিক প্রয়োজনীয় ২,১২২ কিলোক্যালরি গ্রহণ করার জন্য পর্যাপ্ত খাবার কেনার সম্পদ তাদের কাছে নেই। খাদ্যে ক্যালরি ঘাটতি ছাড়াও এই দরিদ্র জনগোষ্ঠীর খাদ্য সুষম নয়। তাদের প্রতি বেলার খাদ্যেই শস্যের প্রাধান্য রয়েছে। তারা প্রতিদিন যে ক্যালরি গ্রহণ করে, তার ৮০ শতাংশই আসে শস্য হতে, যার মধ্যে চাউলই প্রধান। চর্বি, তেল এবং প্রোটিনযুক্ত খাদ্য তারা সামান্যই গ্রহণ করে। এই ধরনের সমতাহীন খাদ্যের বড় শিকার হচ্ছে নারী ও শিশুরা। পুরুষের তুলনায় নারী ও শিশুদের অধিক পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজন রয়েছে।

খাদ্যনিরাপত্তাহীনতার কারণ

খাদ্যনিরাপত্তাহীনতার প্রধান কারণ হচ্ছে-

কম খাদ্য উৎপাদন : দেশে শাকসবজি, ফল, ডাল, তৈলবীজ, মাছ, মাংস, ডিম, দুধ ইত্যাদির উৎপাদন কম, অন্যদিকে জনগণের স্বল্প আয়, তাদের শস্যজাতীয় খাবারের উপর নির্ভরশীলতা ইত্যাদি এ স্বল্প উৎপাদনের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। ফলে দেখা দেয় খাদ্যনিরাপত্তাহীনতা।

জনগণের কম আয় : আমাদের দেশের জনগণের মাথাপিছু আয় বিশ্বের বেশিভাগ দেশের তুলনায় কম। জনগণের মাথাপিছু আয় কম হলে তাদের পক্ষে প্রয়োজন অনুযায়ী খাদ্য কেনা সম্ভব হয় না। ফলে দেখা দেয় খাদ্যের নিরাপত্তাহীনতা।

পুষ্টি জ্ঞানের অভাব : জনগণের একটি উল্লেখযোগ্য অংশের মধ্যে পুষ্টি জ্ঞানের অভাব রয়েছে। আর এই জ্ঞানের অভাবের কারণে তারা সঠিক স্বাস্থ্য উপযোগী খাদ্য বেছে নিতে পারে না।

সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের খাদ্যলভ্যতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং আমদানি উভয়েরই অবদান রয়েছে এই খাদ্যলভ্যতায়। কিন্তু এই বাড়তি খাদ্য বাংলাদেশের যে অর্ধেক জনগোষ্ঠী দীর্ঘকাল ধরে দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করছে এবং খাদ্যনিরাপত্তাহীনতায়

২০১৬

ভুগছে, তাদেরকে খাদ্যনিরাপত্তা দিতে পারেনি। কারণ তাদের না আছে নিজের উৎপাদিত পর্যাপ্ত ফসল এবং না আছে তাদের খাদ্য ক্রয় করার জন্য পর্যাপ্ত অর্থ ও অন্যান্য সম্পদ। দুর্যোগের সময় যে ত্রাণ বিতরণ করা হয় তা এই জনগোষ্ঠীকে সাময়িকভাবে খাদ্যনিরাপত্তা প্রদান করে। কিন্তু সেটি তাদের দীর্ঘকালীন খাদ্যনিরাপত্তা প্রদান করতে পারেনি।

খাদ্যনিরাপত্তা অর্জনে সরকারি উদ্যোগ

খাদ্যনিরাপত্তা অর্জনে দরকার হয় একটি সঠিক খাদ্যনীতি। দারিদ্র্য নিরসনের মাধ্যমে খাদ্যনিরাপত্তা বিধানই বাংলাদেশের খাদ্যনীতির সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। সরকার কর্তৃক শস্য মজুদ জরুরি অবস্থায় খাদ্যশস্যের ন্যূনতম সরবরাহকে নিশ্চিত রাখে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ তথা বন্যা এবং অন্য কোনো কারণে খাদ্যঘাটতি দেখা দিলে এতে দরিদ্র শ্রেণি সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। আর এই সংকট মোকাবেলায় সরকার সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানের কর্মসূচি গ্রহণ করে। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মোট ব্যয়ের ৯৫ শতাংশ ব্যয় হয় খাদ্য বিতরণ কর্মসূচিগুলোতে যার লক্ষ্য হচ্ছে ত্রাণ প্রদান করা এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আয় উপার্জনকারী দক্ষতা, অবকাঠামো ইত্যাদি সুবিধা পেতে নানা অসমতা দূর করা। মোট জনসংখ্যার যে অংশ খাদ্য সাহায্য কর্মসূচিগুলোতে অংশ নেয়, তাদের পর্যালোচনা করলে দেখা গেছে Vulnerable Group Development (VGD), Food For Education এবং Vulnerable Group Feeding (VGF) –এই তিনটি কর্মসূচি খুব ভালোভাবে প্রকৃত দরিদ্রদের অবস্থার উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে।

খাদ্যনিরাপত্তা অর্জনের উপায়

খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রয়োজন খাদ্য উৎপাদন, লভ্যতা, ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি ইত্যাদি। পৃথিবীর অনেক দেশ যেমন : চীন, ভারত, সিঙ্গাপুর এবং আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে জমি অধিগ্রহণ করে খাদ্য উৎপাদন বাড়ানোর পরিকল্পনা করছে, যা আমাদের দেশেও করতে পারে। জাতীয় পর্যায়ে খাদ্যলভ্যতা বাজারের কার্যকারিতা, অবকাঠামো, অভ্যন্তরীণ খাদ্য উৎপাদনে ঋতুবৈচিত্র্য, বাজারের দক্ষতা এবং সরকারি খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে। আর গৃহস্থের খাদ্যনিরাপত্তা নির্ভর করে খাদ্য উৎপাদন বা প্রাপ্তি এবং বাজারে এই খাদ্যের সহজলভ্যতার উপর। খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে কৃষককে সহজশর্তে ঋণ দিলে কৃষক এই ঋণ ব্যবহার করে উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা করবে।

দলীয় কাজ : করিম বাজারে গিয়ে দেখল যে, বাজারে চালের দাম বাড়তি এবং বাজারে পর্যাপ্ত চাল নেই। এই ঘটনার কারণগুলো চিহ্নিত করে সমাধানের উপায় লিখ।

শুধু খাদ্য সরবরাহ আর ভোগই স্বাস্থ্যকর এবং উৎপাদনশীল জাতি উপহার দিতে পারে না। এজন্য খাদ্যের গুণ এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করা দরকার। এছাড়া খাদ্যের ভেজাল খাদ্যের নিরাপত্তার একটি বিরাট প্রতিবন্ধকতা। মানবস্বাস্থ্যের জন্যও তা মারাত্মক ক্ষতিকর। প্রচলিত আইন ব্যবহার করে এবং প্রয়োজনবোধে আইন সংস্কার করে ও সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে সরকার কর্তৃক খাদ্যে ভেজাল নিয়ন্ত্রণ করা খুবই জরুরি হয়ে পড়েছে।

খাদ্যনিরাপত্তা অর্জনে নাগরিক হিসেবে আমাদের করণীয়

২০০০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে চরম দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করত ৪৪ শতাংশ মানুষ। ২০০৫ সালে তা কমে দাঁড়ায় ৪০ শতাংশে। এই হতদরিদ্র মানুষ খাদ্যের ন্যূনতম চাহিদা পূরণ করতে পারে না। নাগরিক হিসেবে খাদ্যনিরাপত্তা অর্জনের জন্য আমাদের সকলের দায়িত্ব রয়েছে। খাদ্যনিরাপত্তা সম্পর্কে আমরা ভালোভাবে জেনে তা নিশ্চিত করতে নিজেরা উদ্যোগ নিতে পারি। বাড়ির আশেপাশে খালি জায়গায় আমরা নানা রকম শস্য চাষ করে শস্যের চাহিদা মেটাতে পারি। ব্যক্তিগতভাবে আমরা প্রত্যেকেই খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে সচেতন হয়ে নিজের খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারি।

৪. পরিবেশগত দুর্যোগ

আমাদের চারপাশের নদ-নদী, খাল-বিল, পাহাড়-পর্বত, গাছ-পালা, মাটি এ সবকিছু নিয়েই আমাদের পরিবেশ। সুস্থ প্রাকৃতিক পরিবেশ অব্যাহত রাখা আমাদের স্থিতিশীল উন্নয়ন ও স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের প্রধান ভিত্তি। মানুষের কর্মকাণ্ড যখন পরিবেশের এই স্বাভাবিক অবস্থাকে বিনষ্ট করে, তখনই পরিবেশের দুর্যোগ সৃষ্টি হয়।

পরিবেশগত দুর্যোগের কারণ

পরিবেশকে ঘিরেই মানুষ বেড়ে উঠে। আবার মানুষের কারণে কোনো না কোনোভাবে প্রতিনিয়তই পরিবেশ দূষিত হয়। শিল্প উন্নয়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন এগিয়ে নিতে একের পর এক গাছ-পালা কেটে, বন উজাড় করে মানুষ শিল্প-কারখানা গড়ে তুলেছে। এর ফলে পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান যেমন : মাটি, বায়ু, পানি দূষিত হচ্ছে। নগরের শিল্প-কারখানাগুলো জলাধারকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে। শিল্প-কারখানার অপরিশোধিত বর্জ্য নর্দমার পানিতে ফেলায় তা নদীতে মিশে পানি দূষিত করছে। এছাড়া জমিতে সার ও কীটনাশক ব্যবহারের ফলেও পানি দূষিত হচ্ছে। দূষণের কারণে এখন ঢাকার বুড়িগঙ্গা নদী জৈবিক দৃষ্টিকোণ থেকে মৃত। শীতলক্ষ্যা, তুরাগ ও বালু নদও ক্রমেই একই পরিণতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে। ঢাকার বাইরে নদ-নদীগুলোর অবস্থাও একই রকম। চট্টগ্রামে কর্ণফুলী নদী মারাত্মক দূষণের শিকার। মুন্সিগঞ্জের ধলেশ্বরী নদীর পার্শ্বে প্রতিষ্ঠিত সিমেন্ট কারখানাগুলোর দূষণে সে এলাকার পানি, জমি ও বায়ু বিষাক্ত হয়ে পড়েছে।

পরিবেশ বিপর্যয়ের আরেক দৃষ্টান্ত হলো বনাঞ্চল হ্রাস ও এর অবক্ষয়। যেমন : ইটের ভাটার জ্বালানি হিসেবে, বাসাবাড়ির রন্ধন কাজে জ্বালানি হিসেবে, ভবন নির্মাণ ও ঘরের জানালা-দরজার জন্য এবং আসবাবপত্র তৈরি ইত্যাদি কাজে ব্যাপক হারে কাঠের ব্যবহার হচ্ছে। এছাড়া পাহাড়ি অঞ্চলে বন ও গুল্ম ধ্বংস করে জুম চাষ প্রকৃতি ও পরিবেশের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। একটি দেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য সে দেশের মোট আয়তনের ২৫ ভাগ বন থাকা প্রয়োজন। অথচ আমাদের দেশের বনাঞ্চলের পরিধি দেশের মোট আয়তনের ২০ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ৬ শতাংশে পৌঁছেছে। যেটুকু বন অবশিষ্ট আছে, তাও বিভিন্ন হুমকির সম্মুখীন।

ক্ষতিকর দিক

বনের সংকোচন, জলাধারগুলোর অধিগ্রহণ ও দূষণের ফলে দেশের জীববৈচিত্র্য মারাত্মকভাবে হ্রাস পেয়েছে। দেশীয় প্রজাতির শস্য, মাছ, গাছ, উদ্ভিদ প্রভৃতি আজ সর্বাত্মক হুমকির সম্মুখীন। পরিবেশ আন্দোলনের চাপে সরকার পলিথিন ব্যাগ ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলেও তা প্রায়ই মানা হচ্ছে না। তদুপরি বিভিন্ন পণ্যের মোড়ক হিসেবে প্লাস্টিকের ব্যবহার ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে শহরে, এমনকি গ্রামে বর্জ্য হিসেবে প্লাস্টিক ও জৈবিকভাবে অপচনশীল অন্যান্য সামগ্রীর পরিমাণ বাড়ছে। মাত্র একবার ব্যবহারযোগ্য উপকরণের ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে চিকিৎসাবর্জ্যের পরিমাণ দ্রুত হারে বাড়ছে এবং এর মধ্যে অনেক বিষাক্ত ও তেজস্ক্রিয় উপাদান থেকে যাচ্ছে। পৃথক ও সুষ্ঠু অপসারণ ব্যবস্থা না থাকার ফলে এসব বর্জ্য সাধারণ বর্জ্যের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে এবং পরিবেশকে বিষাক্ত করছে।

এদিকে জলবায়ু পরিবর্তন বাংলাদেশের অস্তিত্বের জন্য এক বড় হুমকি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। বিভিন্নভাবে জলবায়ু পরিবর্তন বাংলাদেশকে আক্রান্ত করছে এবং করবে। তার মধ্যে অন্যতম হলো, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়ার কারণে লবণাক্ততার প্রসার, নদীপ্রবাহের চরমভাবাপন্নতা বৃদ্ধি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বৃদ্ধি ও রোগ মহামারীর প্রসার। ঘনবসতির কারণে জলবায়ু পরিবর্তনের এসব প্রভাবের ফলে বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষের বাস্তুহারা ও জীবিকাহারা হওয়ার আশঙ্কা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ পরিস্থিতি বাংলাদেশকে সামগ্রিকভাবে অস্থিতিশীল করে দিতে পারে। তা প্রতিবেশী দেশ, এমনকি পুরো বিশ্বের জন্যই একদিন বিপদের কারণ হয়ে উঠতে পারে। সে কারণে দীর্ঘমেয়াদি দৃষ্টিকোণ থেকে জলবায়ু পরিবর্তনই বাংলাদেশের জন্য আজ সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য সবাইকে সমষ্টিগতভাবে সচেতন হতে হবে।

পরিবেশগত দুর্যোগ মোকাবিলায় সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ

বস্তুত, বাংলাদেশের উন্নয়নে পরিবেশ সংরক্ষণ জরুরি। বেশি জনসংখ্যার কারণে পরিবেশ দূষণ দ্বারা আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা বিপুলভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বল্প আয়তন ও জনসংখ্যার উচ্চ ঘনত্বের কারণে বাংলাদেশের জন্য এসব সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করেছে। ভয়াবহ এই পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণের জন্য যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন, তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

- অপরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠা কলকারখানা বন্ধ ঘোষণা করা।
- মানুষের বসতি রয়েছে এমন এলাকায় শিল্প-কারখানা স্থাপনের অনুমতি না দেওয়া।
- যে শিল্পগুলো পরিবেশ দূষণের জন্য সর্বাধিক দায়ী, সেগুলো চিহ্নিত করে এর মধ্যে পরিবেশ দূষণের জন্য সর্বাধিক ক্ষতিকারক শিল্পগুলো বন্ধ ঘোষণা করা।
- শিল্প-শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় শিক্ষাদান ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- যেখানে-সেখানে ময়লা আবর্জনা না ফেলা।
- বনায়ন বৃদ্ধি করা এবং এ বিষয়ে সকলকে উৎসাহিত করা।

- ব্যাপক সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা এবং বৃক্ষরোপণ আন্দোলন জোরদার করা ।
- পাহাড় কাটা নিয়ন্ত্রণ করা ।
- পলিথিন ব্যাগ ব্যবহার নিষিদ্ধ এবং এ সংক্রান্ত আইনের যথাযথ প্রয়োগ বাস্তবায়ন করা ।
- প্লাস্টিকের ব্যবহার বন্ধ করা ।
- ইটের ভাটায় জ্বালানি কাঠ পোড়ানো বন্ধ করতে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া ।
- স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে তোলা, যাতে তারা পরিবেশের বিরূপ প্রভাব সম্পর্কে সচেতন থাকে ।
- অধিক মাত্রায় সার ও কীটনাশক ব্যবহার বন্ধ করে জৈবসার ব্যবহারে উৎসাহিত করা ।
- পরিবেশ রক্ষার আন্দোলনে জনগণকে উৎসাহিত ও অংশগ্রহণে রাজি করানো ।
- ক্ষতিকারক উপাদানগুলোর পরিমাপ করার জন্য বিশেষজ্ঞ দল গঠন করে তাদের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা ।

নাগরিক হিসেবে আমাদের করণীয়

নাগরিক হিসেবে পরিবেশ সংরক্ষণে আমাদের দায়িত্ব রয়েছে । আমাদের উচিত অন্যায়ভাবে কোনো গাছ না কাটা, পরিবেশ সংরক্ষণে আমাদের আঙিনাসহ বাড়ি ও রাস্তার আশে-পাশে গাছ লাগানো, পলিথিনের ব্যাগ আশপাশের ড্রেনে না ফেলা এবং নিজেরা সংগঠিত হয়ে সমাজের মানুষকে পরিবেশদূষণের কুফল সম্পর্কে সচেতন করা ।

দলীয় কাজ : তোমার বাসা-বাড়ির চারপাশের নদী ও খাল-বিল দূষণমুক্ত রাখতে কী কী পদক্ষেপ নিবে তা লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন কর ।

৫. সন্ত্রাস

সন্ত্রাস কী?

সন্ত্রাসের মূল কথা বল প্রয়োগ বা বল প্রয়োগের ভীতি প্রদর্শন করে কোনো উদ্দেশ্যসাধন বা কার্যোদ্ধারের চেষ্টা করা । এটা যেমন দুস্কৃতকারীরা বা সমাজবিরোধীরা করতে পারে, তেমনি সমগ্র রাষ্ট্রে তথা সমগ্র বিশ্বের পটভূমিতেও এমন চেষ্টা হতে পারে । সন্ত্রাস সমাজে যুগ যুগ ধরে চলছে । সন্ত্রাসের প্রধান উৎসগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো ।

- কোনো লক্ষ্য অর্জনে সহিংস কর্মপন্থা গ্রহণ অথবা সহিংসতা ব্যবহারের হুমকি ।
- বঞ্চিত শ্রেণির মানবাধিকার রক্ষার জন্য সহিংস এবং অন্যান্য চরমপন্থী কর্মকাণ্ড পরিচালনা ।
- সহিংসতার লক্ষ্যে নিরীহ মানুষের জীবন ও সম্পত্তির ক্ষতিসাধন অথবা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানকে আক্রমণের লক্ষ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা ।
- অধিকার আদায়ে আইনগত বিধান ও শান্তিপূর্ণ সমাধানের উপায় থাকা সত্ত্বেও সহিংস কর্মপন্থা ব্যবহার করা ।

সন্ত্রাসের ধরন

অপরাধী চক্রের দ্বারা সংগঠিত সন্ত্রাস

অপরাধী চক্রের দ্বারা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। এই অপরাধী চক্র সংগঠিতভাবে সন্ত্রাস চালায়। এদের এক শীর্ষ নেতা থাকে, যে লোকচক্ষুর আড়ালে থেকে নিজের নিয়োজিত লোক দ্বারা মানুষ খুন, চাঁদাবাজি ইত্যাদি কর্মকাণ্ড করে থাকে। এছাড়া নানাভাবে মানুষের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করে।

রাজনৈতিক সন্ত্রাস

কোনো কোনো রাজনৈতিক দল, সংগঠন বা গোষ্ঠীবিশেষ রাজনীতির নামে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড অবলম্বন করে। ধর্মের নামে এদের কাউকে কাউকে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালিয়ে যেতে দেখা যায়। শ্রেণি-সংগ্রামের নামেও কোনো কোনো দল বা সংগঠন সহিংস তৎপরতায় লিপ্ত হয়। আবার দেশের প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলের ছত্রচ্ছায়ায়ও কখনো কখনো সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালিত হতে দেখা যায়।

আদর্শভিত্তিক সন্ত্রাস

কোনো গোষ্ঠী তাদের সুনির্দিষ্ট আদর্শ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সন্ত্রাসের পথ বেছে নিতে পারে। একসময় শ্রেণি-শত্রু খতমের নামে আমাদের দেশে অনেক রাজনৈতিক হত্যা হয়েছে। ধর্মীয় জঙ্গিবাদ মুসলমান, হিন্দু, খ্রিষ্টান এবং ইহুদি সহ সকল সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে বিরাজমান। ধর্মীয় জঙ্গিগোষ্ঠীগুলো সহিংস পন্থায় সাধারণ মানুষ হত্যা ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি সাধন করে থাকে। এসব হচ্ছে ধর্মের নামে চূড়ান্ত ধর্মবিরোধী কাজ।

রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস

অনেক সময় রাষ্ট্র নানা অজুহাতে সন্ত্রাসী পন্থা অবলম্বন করে প্রতিষ্ঠান বা জনগোষ্ঠীর উপর দমন-পীড়ন চালায়। এরূপ অবস্থা হলো রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস। যেমন : ইসরাইল রাষ্ট্র প্যালেস্টাইনের জনগণের উপর বিভিন্ন সময় এ ধরনের তৎপরতা চালিয়ে আসছে। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরস্থ সংখ্যালঘু বা ভিন্ন জনগোষ্ঠীর উপরও এরূপ আক্রমণ পরিচালিত হতে দেখা যায়।

সন্ত্রাসের কারণ : সন্ত্রাস দুটি কারণে সংঘটিত হয়, ক) সাধারণ কারণ, খ) বহিঃস্থ কারণ।

সাধারণ কারণ

অর্থনৈতিক বৈষম্য

কোনো সমাজে সম্পদের অসম বণ্টন থাকলে একশ্রেণির লোক অধিক ধনী হয় এবং অন্য শ্রেণি অধিকতর দরিদ্র হয়। এ অবস্থা বঞ্চিতদের মনে ক্ষোভের সৃষ্টি করে। ফলে নিম্ন আয়ের পরিবারে ক্ষুধা নিবৃত্তি, দারিদ্র্য ও বেকারত্ব কাটিয়ে উঠার জন্য পরিবারের কেউ কেউ অল্প সময়ের মধ্যে বেশি টাকা উপার্জনের জন্য অপরাধী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়। এছাড়া বেকারত্ব আমাদের দেশে একটি সামাজিক ব্যাধি। যার নেতিবাচক প্রভাব পড়ে সমাজের কর্মক্ষম যুবসমাজের উপর। এর ফলে যুবসমাজ অনৈতিক সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে নিজেদের ভাগ্য নির্মাণে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হতে উদ্বুদ্ধ হয়।

সংকীর্ণ রাজনৈতিক সংস্কৃতি

একটি দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে যদি স্বার্থপরতা প্রবল থাকে এবং রাজনীতি যদি হয় ব্যক্তিস্বার্থ ও দলীয় স্বার্থ উদ্ধারের হাতিয়ার, তাহলে সেই রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে সন্ত্রাসের জন্ম অস্বাভাবিক নয়। কারণ, ব্যক্তিস্বার্থ আদায়ের জন্যই সন্ত্রাসীদেরকে লালন-পালন করতে হয়।

সুশাসনের অভাব

অপরাধীকে খুঁজে বের করে শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও প্রশাসনের দায়িত্ব। কিন্তু প্রশাসনিক দুর্বলতা এবং রাজনৈতিক চাপের কারণে প্রশাসন অনেক সময় নীরব ভূমিকা পালন করে। এছাড়া আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কাঠামোগত দুর্বলতা রয়েছে। যেমন : দুর্বল প্রশিক্ষণ, পুরনো অস্ত্র, পুলিশ ও জনসংখ্যার ভারসাম্যহীন অনুপাত যা সন্ত্রাস দমনে আইন-প্রয়োগকারী সংস্থার ভূমিকাকে দুর্বল করে। এসব কারণে অনেক দুর্বল সন্ত্রাসীরাও শক্তি প্রদর্শনে সক্ষম হয়। তাছাড়া উন্নত প্রশিক্ষণ না পাওয়ার কারণে অনেক সময় বিদ্যমান গোয়েন্দা সংস্থাগুলো দ্বারা সমকালীন সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলা করা সম্ভব হয় না।

বহিঃস্থ কারণ

সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে যেমন অভ্যন্তরীণ ইন্ধন কাজ করে, তেমনি এর পিছনে বাইরের ইন্ধনও থাকতে পারে। অবৈধ অস্ত্রের যোগান, অবৈধ অস্ত্রের সহজলভ্যতাও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের পিছনে কাজ করে বলে ধারণা করা হয়।

সন্ত্রাস প্রতিরোধ ও প্রতিকারের উপায়

বাংলাদেশে সন্ত্রাস একটি সামাজিক ব্যাধি। একে যেমন প্রতিরোধ করা যায়, তেমনি নিরাময়ও করা যেতে পারে। সন্ত্রাস যাতে জন্ম নিতে না পারে এবং সন্ত্রাসীরা যাতে নাগরিকদের জানমালের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করতে না পারে সে জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা আবশ্যক।

সন্ত্রাসবিরোধী আইন প্রণয়ন : সন্ত্রাস দমনের লক্ষ্যে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইন প্রণয়ন করা আবশ্যক। যারা প্রকাশ্যে আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে নাগরিকদের জানমালের ক্ষতি সাধন করছে, তাদেরকে কোনোভাবে ক্ষমা করা যায় না। সন্ত্রাস দমনের জন্য চরম শাস্তির ব্যবস্থা করলে সন্ত্রাস অনেকটা কমে যাবে আশা করা যায়।

পুলিশ প্রশাসনের পুনর্গঠন : সন্ত্রাস প্রতিরোধের জন্য পুলিশ বাহিনীকে আধুনিক অস্ত্রে ও যন্ত্রপাতিতে সজ্জিত করতে হবে এবং যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ দিতে হবে। তাছাড়া আমাদের দেশে পুলিশ ও জনসংখ্যার অনুপাতে ব্যাপক ব্যবধান বিদ্যমান। এখানে প্রায় ১৪০০ মানুষের জন্য একজন পুলিশ কর্মকর্তা। এ অবস্থার নিরসন হওয়া বাঞ্ছনীয়। পুলিশের সংখ্যা, পুলিশ ফাঁড়ি, থানার সংখ্যা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ও বেকার ভাতা প্রদান : দেশে কুটির শিল্প, বৃহদায়তন শিল্প ও কলকারখানা স্থাপন, সকল ক্ষেত্রে শূন্যপদ পূরণ ও নতুন নতুন কর্মক্ষেত্র তৈরি করতে হবে। বেকারত্ব দূরীকরণ সম্ভব হলে সন্ত্রাসী কর্মতৎপরতা অনেকাংশে হ্রাস পাবে। বেকারত্ব দূরীকরণের জন্য অগ্রসর দেশের মতো না হলেও ন্যূনতম জীবনমান বজায় রাখার মতো বেকার ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা করা দরকার। সামাজিক নিরাপত্তা হিসেবে বেকার ভাতা উত্তম ব্যবস্থা।

সর্বজনীন শিক্ষা ও মূল্যবোধের জাগরণ : সবার জন্য শিক্ষার সুযোগের মাধ্যমে নাগরিকদের মধ্যে সামাজিক ও নৈতিক বোধ জাগ্রত করতে হবে। এ উদ্দেশ্যে বিদ্যালয় এবং বিভিন্ন শিক্ষা কর্মসূচিতে নৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায়। এতে সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপ প্রতিরোধ ও প্রতিকার সম্ভব হবে।

রাজনৈতিক দলে সন্ত্রাসীদের আশ্রয় না দেওয়া : রাজনৈতিক দলে কোনো সন্ত্রাসীকে আশ্রয় দেওয়া যাবে না। কোনো দল সন্ত্রাসীদের মদদ দিলে বা আশ্রয় দিলে সে দলের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করতে হবে। এমন দলের কোনো সদস্যকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হবে না, এ মর্মে সংসদে আইন তৈরি করতে পারে।

প্রশাসনিক কঠোরতা : সন্ত্রাস দমন, ঘুষ ও দুর্নীতি বন্ধ, স্বজনপ্রীতি রোধ এবং কঠোর প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে পুলিশ প্রশাসন ও সাধারণ প্রশাসন যাতে কাজ করতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে।

গণসচেতনতা : জনগণের সচেতন প্রতিরোধ সন্ত্রাস দমনে খুবই কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। জনগণ সচেতনভাবে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সোচ্চার ও সংঘবদ্ধ হলে সন্ত্রাস বহুলাংশে হ্রাস পাবে।

নাগরিক হিসেবে আমাদের করণীয়

নাগরিক হিসেবে আমরা সন্ত্রাসী তৎপরতা সম্পর্কে সচেতন থাকব। সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের খারাপ দিকগুলো সম্পর্কেও আমরা জানব। সন্ত্রাসী তৎপরতা রোধে আমরা আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে সহায়তা করব। সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ মেনে চলব।

একক কাজ : সম্প্রতি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চিহ্নিত করে তার সমাধানে তোমার সুপারিশ লিখ।

দলীয় কাজ : সন্ত্রাসী তৎপরতা কীভাবে মোকাবেলা করা যায়, তার উপরে একটি তালিকা তৈরি করে শ্রেণিতে ঝুলিয়ে রাখ।

৬. নারী নির্যাতন : কারণ ও প্রতিকার

নারী নির্যাতন কী?

বেইজিং ঘোষণা অনুযায়ী, নারী নির্যাতন বলতে এমন যেকোনো কাজ বা আচরণকে বোঝায়, যা নারীর বিরুদ্ধে সংঘটিত হয় এবং যা নারীর শারীরিক ও মানসিক ক্ষতি সাধন করে। এছাড়া, কোনো ক্ষতি

সাধনের হুমকি, জোরপূর্বক অথবা খামখেয়ালিভাবে সমাজ অথবা ব্যক্তিগত জীবনে নারীর স্বাধীনতা হরণ নারী নির্যাতনের অন্তর্ভুক্ত। নিচে নারী নির্যাতনের দুটি ঘটনা উল্লেখ করা হলো, যাতে আমাদের দেশের নারী নির্যাতনের চিত্র ফুটে উঠেছে।

কন্যাশিশুদের উপেক্ষা

কেইস ১ : জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে পড়ে মীনা। শৈশব থেকেই সে ছিল খুব মেধাবী। তার এক বছরের বড় ভাই তারই সাথে এক ক্লাসে পড়ত। মীনার বড় ভাই বিভিন্ন ক্লাসে শিক্ষকদের কাছে কোচিং করলেও তাকে কখনো এ ধরনের সুযোগ দেওয়া হয়নি। এইচএসসি পাস করার পর মীনা সিলেট মেডিকেল কলেজ ও তার ভাই ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজে ভর্তির সুযোগ পেয়েছিল। মীনার বাবা তার ছেলেকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজে ভর্তি করালেও মীনাকে খরচের অজুহাত দেখিয়ে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে বাধ্য করেছে। পারিবারিক বঞ্চনার কারণে মীনার ডাক্তার হওয়ার আজন্ম লালিত স্বপ্ন অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে গেছে।

যৌতুক

কেইস ২ : নবম শ্রেণির ছাত্রী মর্জিনা গ্রামে বসবাস করে। মর্জিনার বাবা পৈতৃক জমি থেকে যে ফসল পায় তা দিয়ে পরিবারের খরচ মেটায়। চার ভাইবোনের পরিবারে মর্জিনা মেধাবী হওয়া সত্ত্বেও তার বাবা তাকে এক মুদি দোকানদারের সাথে বিয়ে দেয়। কিন্তু তার স্বামী মন দিয়ে দোকানদারি করে না বলে দোকানে লোকসান হতে থাকে। বিয়ের কিছুদিন পর থেকে মর্জিনার স্বামী তাকে তার বাবার কাছ থেকে টাকা নিয়ে আসার জন্য বলতে থাকে। বছর দুই পরে সে বিদেশে যাবে বলে মর্জিনাকে বাবার বাড়ি থেকে জমি বেচে দুই লক্ষ টাকা এনে দেওয়ার জন্য চাপ দেয়। তার শ্বশুরবাড়ির সবাই স্বামীর সঙ্গে তাল মিলিয়ে টাকা নিয়ে আসার জন্য বলতে থাকে। এ নিয়ে প্রায়ই স্বামীর বাড়ির লোকের সঙ্গে মর্জিনার বিরোধ চলতে থাকে। এরপর হঠাৎ একদিন মর্জিনাকে তার শোবার ঘরে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়।

বাংলাদেশে নারী নির্যাতনের প্রধান কারণ

নারীর উপর পুরুষের আধিপত্য যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। এই দৃষ্টিভঙ্গির কারণে পুরুষরা নারীকে মনে করে অবলা অর্থাৎ নিজেকে রক্ষা করতে অক্ষম। নারীর স্থান হচ্ছে সংসারের চৌহদ্দির মধ্যে। একই দৃষ্টিভঙ্গির কারণে পুরুষরা নারীদের মানুষ হিসেবে মর্যাদা দিতে অবহেলা করেছে। নারীর শারীরিক গঠনকে পুঁজি করে তার উপর চালিয়েছে শারীরিক নির্যাতন। বাংলাদেশের শিক্ষিত নারীদের অবস্থা কিছুটা উন্নত হলেও সামগ্রিকভাবে নারীরা এখনও অবহেলিত ও নির্যাতিত।

অর্থনৈতিক স্বাধীনতার অভাব

অর্থনৈতিক আত্মনির্ভরশীলতা নারীর অবস্থানকে সমাজে ও পরিবারে শক্ত করে। কিন্তু আমাদের দেশে অধিকাংশ নারী এখনো স্বামীর আয়ের উপর নির্ভরশীল। ফলে, সংসারের কোনো কেনাকাটা, খরচ করা বা শখ পূরণের জন্য নারীদের অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিবারের বাবা, ভাই ও স্বামীর সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করতে হয়। এখনও অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার অভাবে অনেক নারী নির্যাতনের শিকার হয়।

সচেতনতার অভাব

আমাদের দেশে অধিকাংশ পরিবারই দরিদ্র। দরিদ্র পরিবারে নারীরা শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। ফলে সে তার অধিকার সম্পর্কে থাকে অসচেতন। আর এই সুযোগে স্বামী, আত্মীয়স্বজন এমনকি সমাজ নারীর উপর মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন করে থাকে।

নারী নির্যাতন রোধে করণীয়

সমাজে নারীর উন্নয়নের লক্ষ্যে নারী নির্যাতন রোধ করা অত্যাবশ্যক। নারী নির্যাতনের কারণগুলো প্রতিকারের মাধ্যমে তা সম্ভব। এজন্য নারীকে হতে হবে শিক্ষিত, অর্থনৈতিকভাবে আত্মনির্ভরশীল। নারীর বিভিন্ন অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এছাড়াও নারী নির্যাতন প্রতিরোধে নিচের পদক্ষেপগুলো গুরুত্বপূর্ণ।

১. আইনের কঠোর প্রয়োগ : নারী নির্যাতন রোধে বিদ্যমান আইনের কঠোর বাস্তবায়ন দরকার। আইনের মধ্যে যদি কোনো দুর্বলতা থেকে থাকে তবে তা সংশোধন করে আইনকে আরও শক্তিশালী করা সরকারের গুরুদায়িত্ব। প্রয়োজনে নারী নির্যাতন রোধে বিশেষ আদালত স্থাপন করে নারী নির্যাতনকারীদের শাস্তি দিতে হবে।

২. পাঠ্য পুস্তকের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধিঃ স্কুল কলেজের পাঠ্যপুস্তকে নারী নির্যাতন বিরোধী বক্তব্য গুরুত্ব সহকারে উপস্থাপনের মাধ্যমে এ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। নাটক, কবিতা, আবৃত্তি, গান, আলোচনা সভা ইত্যাদির মাধ্যমে নারী নির্যাতনকারীর শাস্তি ও পরিণতি তুলে ধরতে হবে। এটা যে একটা ঘৃণ্যতম অপরাধ এবং সামাজিক উন্নয়নের পথে অন্তরায় তা বুঝতে হবে। নারী পুরুষ সকলে মিলে নির্যাতনকারীর বিরুদ্ধে সংগঠিত প্রতিবাদ গড়ে তুলতে হবে।

৩. আইনি সহায়তা : অনেক ক্ষেত্রে নারীরা আদালতে নির্যাতনের সঠিক বিচার পায়না। বিশেষ করে দরিদ্র নারীরা অর্থের অভাবে আদালতে যেতে পারে না। তাই এ ধরনের নারীদের জন্য রাষ্ট্র এবং বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক আইনী সহায়তা দিতে এগিয়ে আসতে হবে।

দলগত কাজ : নারী নির্যাতন প্রতিরোধ এবং নারী অধিকার রক্ষায় নাগরিক হিসেবে তোমাদের করণীয় উল্লেখ কর।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। স্থিতিশীল উন্নয়ন ও স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের প্রধান ভিত্তি কোনটি?

ক) প্রশাসনিক কঠোরতা
খ) নিরক্ষরতার হার কমানো
গ) কর্মমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা
ঘ) সুস্থ প্রাকৃতিক পরিবেশ

২। সুবিধাবঞ্চিতদের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে উদ্বুদ্ধকরণের ক্ষেত্রে-

i. সেবাবঞ্চিত এলাকাসমূহে সেবার মান বাড়াতে হবে
ii. নতুন পেশা গ্রহণের মাধ্যমে সন্তান উৎপাদন থেকে বিরত রাখতে হবে
iii. খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক) i ও iii
খ) ii ও iii
গ) i ও ii
ঘ) i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

আরিফাদের আট ভাইবোনের সংসার এবং সিথীরা ২ ভাইবোন। আরিফাদের পরিবারে প্রায়ই খাবারের অভাব দেখা দেয় এবং সংসারে অশান্তি লেগে থাকে। আরিফার ভাইবোনেরা পড়াশুনার ভালো সুযোগ পায় না। পক্ষান্তরে সিথী ও তার ভাই ভালোভাবে পড়ালেখার সুযোগ পাচ্ছে এবং তাদের সংসারে সর্বদা সচ্ছলতা বিরাজ করছে।

৩। আরিফাদের অবস্থা মূলত কোন সমস্যাকে চিহ্নিত করছে?

ক) জনসংখ্যা
খ) নিরক্ষরতা
গ) দরিদ্রতা
ঘ) সচেতনতার অভাব

৪। উক্ত সমস্যা সমাধানকল্পে কোন পদক্ষেপটি সর্বপ্রথম গ্রহণ করা উচিত ?

ক) উচ্চ জন্মহার রোধ
খ) জনসংখ্যার পুনর্বণ্টন
গ) জনশক্তি রপ্তানি
ঘ) আয় পুনর্বণ্টন

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। সুমি বাবা-মায়ের খুব আদরের মেয়ে। দরিদ্রতার কারণে সে লেখাপড়া করতে পারেনি এবং ১৮ বছর বয়সেই তাকে বিয়ে দেওয়া হয়। প্রথমত, বিয়ের সময় স্বামীকে যে টাকা-পয়সা দেওয়ার কথা ছিল তা না দিতে পারায় শ্বশুরবাড়ির লোকজন তার সাথে খারাপ আচরণ করতে থাকে। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে সুমি সেলাই এর কাজ করে একপর্যায়ে পরিবারের সচ্ছলতা ফিরিয়ে আনলে তার স্বামী তার প্রতি ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করেন।

ক. বর্তমানে বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কত ?

খ. খাদ্য নিরাপত্তা কী? ব্যাখ্যা কর।

গ. সুমির জীবনে প্রথম সমস্যাটি কোন সামাজিক সমস্যাকে চিহ্নিত করে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. সুমির মতো নারীদের এ ধরনের সমস্যা থেকে রক্ষা করতে উদ্দীপকে বর্ণিত তার কাজটি যথেষ্ট প্রভাব ফেলতে পারে– বিশ্লেষণ কর।

২। জলিল সাহেব টঙ্গীর তুরাগ নদীর পাশে ১০ বিঘা জমি ক্রয় করে তার কিছু অংশে ১টি ইটের ভাটা প্রস্তুত করেন আর বাকি অংশে ধান চাষ করেন। অধিক ফলনের আশায় তিনি জমিতে প্রচুর পরিমাণে সার ও কীটনাশক ব্যবহার করেন। ইটের ভাটার বর্জ্য পদার্থ এবং বৃষ্টির পানির সাথে সার ও কীটনাশক ধুয়ে তুরাগ নদীতে পড়ছে।

ক. বাংলাদেশের নতুন জনসংখ্যা নীতি গৃহীত হয় কত সালে?

খ. রাজনৈতিক সন্ত্রাস কী? ব্যাখ্যা কর।

গ. জলিল সাহেবের কর্মকাণ্ডের ফলে পরিবেশে কী ধরনের বিপর্যয় সৃষ্টি হচ্ছে-ব্যাখ্যা কর।

ঘ. "উক্ত সমস্যা সমাধানের জন্য সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ যথেষ্ট।" উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও।

দশম অধ্যায়

স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে নাগরিক চেতনা

পূর্বের অধ্যায়গুলোতে আমরা সমাজ, সরকার ও রাষ্ট্র, নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য এবং নাগরিক জীবনের বিভিন্ন সমস্যা ও তার সমাধান সম্পর্কে জেনেছি। এ অধ্যায়ে আমরা স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় এ দেশের নাগরিকদের ভূমিকা ইতিহাস থেকে জানব।

এ অধ্যায় পাঠের মাধ্যমে আমরা–

- বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম, ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শ এবং অসাম্প্রদায়িক মূল্যবোধ জানতে ও ব্যাখ্যা করতে পারব।
- দেশপ্রেমের গুরুত্ব ব্যাখ্যা ও উপলব্ধি করতে পারব।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমি

আজ আমরা স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক। ১৯৭১ সালে স্বাধীন হওয়ার আগে আমরা ছিলাম পাকিস্তানের নাগরিক। জনসংখ্যার দিক থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠ (৫৬ শতাংশ) হওয়া সত্ত্বেও সে সময়ে পূর্ববাংলার (বর্তমান বাংলাদেশ) মানুষ নাগরিক হিসেবে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার ভোগের ক্ষেত্রে সমান সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার কারণে এখন বাঙালিরা স্বাধীনভাবে তাদের নাগরিক অধিকার ভোগ করতে পারছে।

পাকিস্তানি শাসনের (১৯৪৭-১৯৭১) আগে বাংলাদেশের এই অঞ্চল তুর্কি, আফগান, মুঘল এবং পরিশেষে ব্রিটিশ শাসনের (১৭৫৭-১৯৪৭) অধীন ছিল।

ব্রিটিশ শাসন আমলে ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের ফলে এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত একশ্রেণির নেতৃত্ব গড়ে ওঠে। এই নেতৃত্ব রাজনীতি, সংগঠন, সমাজ-সংস্কার, চাকরি, ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি, শিক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিকাশলাভ করে। ব্রিটিশ শাসনের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে ১৮৬১ সাল থেকে শুরু করে গৃহীত বিভিন্ন শাসনতান্ত্রিক সংস্কার। এর পথ ধরে পর্যায়ক্রমে জনগণ ভোটের অধিকার লাভ করে। এসবই ছিল ঐ সময়ে নাগরিক অধিকার ও সচেতনতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি।

১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব

ব্রিটিশ শাসন আমলে অবিভক্ত ভারতে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের পাশাপাশি মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যেও স্বশাসনের চেতনা জাগ্রত হয়। আর এ ক্ষেত্রে মুসলিম স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে ১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় মুসলিম লীগ। মুসলিম লীগ নেতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতের মুসলমানদেরকে একটি স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে ঘোষণা করেন। যার ফলে পরবর্তীকালে মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে আলাদা আবাসভূমির চিন্তা জাগ্রত হয়।

এই চিন্তাধারার আলোকেই ১৯৪০ সালের ২৩শে মার্চ পাঞ্জাবের লাহোরে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশনে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী এ. কে. ফজলুল হক উপমহাদেশের মুসলমানদের স্বার্থ-সম্বলিত

একটি প্রস্তাব পেশ করেন। জিন্নাহর সভাপতিত্বে সভায় প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবই ঐতিহাসিক 'লাহোর প্রস্তাব' বা 'পাকিস্তান প্রস্তাব' নামে পরিচিত।

লাহোর প্রস্তাবের মূল বক্তব্য বা বৈশিষ্ট্য ছিল নিম্নরূপ–

১. ভৌগোলিক দিক থেকে সংলগ্ন এলাকাগুলোকে পৃথক অঞ্চল বলে গণ্য করতে হবে।

২. এসব অঞ্চলের ভৌগোলিক সীমানা প্রয়োজনমত পরিবর্তন করে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের যে সকল স্থানে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেখানে 'স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ' প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৩. এ সমস্ত স্বাধীন রাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য হবে সার্বভৌম ও স্বায়ত্তশাসিত।

৪. ভারতের ও নবগঠিত মুসলিম রাষ্ট্রের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক, শাসনতান্ত্রিক ও অন্যান্য অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণের কার্যকর ব্যবস্থা করা হবে।

৫. দেশের যেকোনো ভবিষ্যৎ শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনায় উক্ত বিষয়গুলোকে মৌলিক নীতি হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

লাহোর প্রস্তাবের কোথাও 'পাকিস্তান' কথাটি ছিল না, যদিও এ প্রস্তাব 'পাকিস্তান প্রস্তাব' নামে পরিচিতি লাভ করে। লাহোর প্রস্তাবে কার্যত ভারতের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দু'টি অঞ্চলে দু'টি পৃথক রাষ্ট্র গঠনের চিন্তা করা হয়। ভৌগোলিক অবস্থান বিবেচনায়ও তা-ই হওয়ার কথা।

১৯৪৬ সালে জিন্নাহর নেতৃত্বে 'দিল্লি মুসলীম লেজিসলেটরস কনভেনশন'-এ মুসলমানদের একাধিক রাষ্ট্র-পরিকল্পনাকে বাদ দিয়ে এক পাকিস্তান পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। সে অনুযায়ী ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট ভারত বিভক্ত হয়ে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হয়। ভারত উপমহাদেশের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ও পূর্বাঞ্চল নিয়ে সৃষ্টি হয় পাকিস্তান ও বাকি অংশ নিয়ে ভারত ইউনিয়ন।

১৯৪০ সালের 'লাহোর প্রস্তাব' ও জিন্নাহর 'দ্বিজাতি তত্ত্ব' পাকিস্তান সৃষ্টির মূলভিত্তি ছিল। এর উপর ভিত্তি করে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের উদ্ভব হলেও এর কাঠামোগত চরিত্রে মিল ছিল না। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান নিয়ে গঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের দুই অংশ এক হাজারের অধিক মাইল ভারতীয় ভূখণ্ড দ্বারা বিভক্ত ছিল। রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালিদের ভাষা-সংস্কৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্য, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যাভ্যাস ছিল পশ্চিম পাকিস্তানিদের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। পশ্চিম পাকিস্তানি বিশেষ করে পাঞ্জাবিরা মনে করত, তাদের পূর্ব পুরুষেরা ভারতবর্ষের বাইরে থেকে আগত এবং তাদের ধমনিতে রয়েছে অভিজাতের রক্ত। এই ধরনের মানসিকতার কারণে পশ্চিম পাকিস্তানিরা বাঙালি মুসলমানদের নিচু জাতের মানুষ হিসেবে দেখত।

বস্তুত পাকিস্তান রাষ্ট্রের শুরু থেকেই পূর্ব বাংলায় পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী এক ধরনের অভ্যন্তরীণ বৈষম্যমূলক শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিল। এই শাসনকালে বাঙালিদের অবস্থা ছিল অনেকটা নিজ দেশে পরবাসীর

মতো। পূর্ব বাংলার বাঙালিদের উপর পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বৈষম্যমূলক আচরণের প্রথম বহিঃপ্রকাশ ঘটে রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে। সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালিদের ভাষা বাংলার পরিবর্তে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী তাদের ভাষা উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাঙালিদের উপর চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল।

ভাষা আন্দোলন (১৯৪৮-১৯৫২)

মাতৃভাষার অধিকার গুরুত্বপূর্ণ নাগরিক অধিকার। পাকিস্তানের শতকরা ৫৬ জনের মাতৃভাষা ছিল বাংলা; উর্দু কোনো অঞ্চলেরই মাতৃভাষা ছিল না। অথচ উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা চালানো হয়। অগণতান্ত্রিকভাবে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে বাঙালিদের যে আন্দোলন শুরু হয়, তা-ই ভাষা আন্দোলন নামে পরিচিত। ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে করাচিতে অনুষ্ঠিত শিক্ষা সম্মেলনে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব গ্রহণ করা হলে পূর্ব বাংলায় রাজনৈতিক নেতৃত্ব, বুদ্ধিজীবী ও ছাত্র নেতৃত্বের সমন্বয়ে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। তাদের দাবি ছিল বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা। যে কারণে আমরা দেখি, ১৯৪৮ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদে কুমিল্লার ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত উর্দু ও ইংরেজির পাশাপাশি বাংলাকে পরিষদের ব্যবহারিক ভাষা হিসেবে গ্রহণের দাবি প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে উত্থাপন করেন। কিন্তু শুরু থেকেই পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করতে সম্মত ছিল না।

কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার

ভাষা আন্দোলনের প্রথম পর্বে ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ ছাত্ররা বাংলা ভাষা দাবি দিবস পালন করে। ঐ দিন সাধারণ ধর্মঘট পালনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছিল। প্রধানত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত পূর্ব পাকিস্তান মুসলীম ছাত্রলীগের (প্রতিষ্ঠা ৪ঠা জানুয়ারি ১৯৪৮) নেতৃবৃন্দ এ আন্দোলনের অগ্রভাগে ছিলেন। ১১ই মার্চ সকালে সেক্রেটারিয়েটের সম্মুখে পিকেটিংরত অবস্থায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, শামসুল হক, অলি আহাদসহ অনেকে গ্রেপ্তার হন।

ভাষা আন্দোলনের এ পর্বে ১৯৪৮ সালের ২১শে মার্চ ঢাকায় প্রথম সফরে এসে রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা জিন্নাহ ঘোষণা করেন, 'উর্দু এবং একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।' ঐ ঘোষণার তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ হয়। প্রতিবাদকারীদের মধ্যে বঙ্গবন্ধু ছিলেন অন্যতম। আন্দোলনের সূচনা ও তা সংগঠিত করতে তিনি কার্যত নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করেন। যে কারণে তাঁকে একাধিকবার গ্রেপ্তার বরণ করতে হয়। জিন্নাহর ঢাকা সফরে আসার পূর্বে পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনের সঙ্গে ছাত্র নেতৃবৃন্দের একটি ৮-দফা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তিতে বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মর্যাদা দেওয়ার বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণের সিদ্ধান্ত হয়। ২৪শে মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে জিন্নাহ ভাষাসংক্রান্ত তার পূর্ব ঘোষণার পুনরাবৃত্তি করেন। সেখানেও প্রতিবাদ উচ্চারিত হয়। বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার ব্যাপারে ছাত্রসমাজের সঙ্গে স্বাক্ষরিত চুক্তি সম্পূর্ণ ভঙ্গ করে ১৯৫২ সালের ২৬শে জানুয়ারি ঢাকার পল্টন ময়দানে খাজা নাজিমুদ্দীন উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার নতুন ঘোষণা দেন। তার এ ঘোষণাকে কেন্দ্র করে শুরু হয় ভাষা আন্দোলনের দ্বিতীয় বা চূড়ান্ত পর্ব। কাজী গোলাম মাহবুবকে আহ্বায়ক করে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। এর পূর্বে আব্দুল মতিনকে আহবায়ক করে গঠিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি। খাজা নাজিমুদ্দীন কর্তৃক উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার নতুন ঘোষণা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব বাংলার ছাত্রসমাজ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মহিউদ্দিন আহমদ 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা' এবং রাজবন্দীদের মুক্তির দাবিতে বন্দী অবস্থায় ১৬ই ফেব্রুয়ারি থেকে আমরণ অনশন শুরু করেন, যা আন্দোলনে নতুন মাত্রা যুক্ত করে। ২১শে ফেব্রুয়ারি ছাত্রসমাজের পক্ষ থেকে সমগ্র পূর্ব বাংলায় সাধারণ ধর্মঘট ও বিক্ষোভ সমাবেশ পালনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।

সরকার কর্তৃক ২১শে ফেব্রুয়ারির আগের দিন ঢাকা শহরে ১৪৪ ধারা জারি করে সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ করা হয়। পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী ছাত্ররা একুশে ফেব্রুয়ারির দিন ১৪৪ ধারা উপেক্ষা করে সমাবেশ অনুষ্ঠান ও মিছিল বের করে। মিছিলে পুলিশ গুলি চালায়। গুলিতে শহীদ হন সালাম, বরকত, জব্বারসহ আরও অনেকে। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মেনে নিতে বাধ্য হয়। ১৯৫৬ সালের সংবিধানে তা স্বীকৃত হয়। বাঙালিরাই পৃথিবীতে একমাত্র জাতি, যারা ভাষার দাবিতে জীবন দিয়েছে। ইউনেস্কোর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জাতিসংঘ (১৭ই নভেম্বর, ১৯৯৯) ২১শে ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। বর্তমানে আমাদের শহীদ দিবস 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে বিশ্বের সর্বত্র উদ্‌যাপিত হচ্ছে।

১৯৫৪ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ঢাকায় বঙ্গবন্ধু ও মওলানা ভাসানীর প্রভাতফেরি

ধর্মভিত্তিক জাতীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে পাকিস্তান সৃষ্টির পর ভাষা আন্দোলনে আত্মদানের মধ্য দিয়ে ধর্মীয় পরিচয়ের বাইরে ভাষার ভিত্তিতে বাঙালিরা এক জাতিসত্তার পরিচয়ে পরিচিত হয়। অতএব, ভাষা আন্দোলন বাংলার মানুষের নিজেদের অধিকারের চেতনার জায়গাটি তৈরি করে। এতে জাতীয় মুক্তির আকাঙ্ক্ষা আরও বেগবান হয়।

১৯৫৪ সালের নির্বাচন

১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। প্রাদেশিক পরিষদের মোট আসন সংখ্যা ছিল ৩০৯। ১৯৫৩ সালের নভেম্বর মাসে আওয়ামী লীগসহ সমমনা কতিপয় দল নিয়ে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকারের বিরুদ্ধে 'যুক্তফ্রন্ট' নামে একটি নির্বাচনি জোট গঠিত হয়। ভাষা আন্দোলনের পর ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয় পূর্ব বাংলার নাগরিকদের রাজনৈতিক চেতনাকে আরো বৃদ্ধি করে।

নির্বাচনের প্রাক্কালে যুক্তফ্রন্ট সর্বস্তরের ভোটারদের আকৃষ্ট করতে ২১ দফাবিশিষ্ট একটি কর্মসূচি গ্রহণ করে, যেখানে বাঙালি নাগরিকদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের দিকগুলো তুলে ধরা হয়। বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দান, ভাষাশহীদদের স্মরণে শহীদ মিনার নির্মাণ, ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে উদ্বৃত্ত জমি বিতরণ, পাট ব্যবসা জাতীয়করণ, লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী পূর্ব বাংলার জন্য পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন ২১ দফা কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত ছিল। এসব দাবি ছিল পূর্ব বাংলার জনগণের নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সাথে সরাসরি সম্পর্কিত। এই নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট ২৩৭টি মুসলিম আসনের মধ্যে ২২৩টি আসনে জয়লাভ করে। অন্যদিকে, পাকিস্তান আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী দল মুসলিম লীগ মাত্র ৯টি আসন পায়।

১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভের পর শেরে বাংলা একে ফজলুল হককে মুখ্যমন্ত্রী করে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠন করা হয়। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী যুক্তফ্রন্টের হাতে মুসলিম লীগের শোচনীয় পরাজয় মনেপ্রাণে মেনে নিতে পারেনি। মাত্র ৫৬ দিনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বরখাস্ত করা হয় এবং পূর্ব বাংলায় গভর্নরের শাসন কায়েম করা হয়।

স্বাধীনতার দীর্ঘ ৯ বছর পর ১৯৫৬ সালে সর্বপ্রথম পাকিস্তানের জন্য একটি সংবিধান প্রণয়ন সম্ভব হয়। এতে বাঙালিদের কতিপয় দাবি বিশেষ করে বাংলাকে রাষ্ট্রের অন্যতম ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। তবে বেশি দিন ঐ সংবিধান কার্যকর হয়নি। ১৯৫৮ সালের ৭ই অক্টোবর জেনারেল ইস্কান্দর মীর্জা কর্তৃক তা বাতিল ঘোষিত হয়। তিনি সারা দেশে সামরিক আইন জারি করেন। এর তিন সপ্তাহের মধ্যে ইস্কান্দর মীর্জাকে সরিয়ে জেনারেল আইয়ুব খান ক্ষমতা দখল করেন। তিনি সর্বজনীন ভোটাধিকার ভিত্তিক পশ্চিমা গণতন্ত্রের ধারণা প্রত্যাখ্যান করে 'মৌলিক গণতন্ত্রের' ধারণা প্রবর্তন করেন।

১৯৫৯ সালের ২৬শে অক্টোবর জেনারেল আইয়ুব খান তার 'মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ' ঘোষণা করেন। মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থাধীনে পাকিস্তানের উভয় অংশ থেকে ৪০,০০০ (চল্লিশ হাজার) করে মোট ৮০,০০০ (আশি হাজার) ইউনিয়ন কাউন্সিল সদস্য নিয়ে দেশের নির্বাচকমণ্ডলী গঠিত হয়। এদের দ্বারা রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট, জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যবৃন্দ নির্বাচনের বিধান করা হয়। এই পদ্ধতিতে পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি সৃষ্টি করে নাগরিকদেরকে প্রত্যক্ষ ভোটের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়।

মৌলিক গণতন্ত্রের মাধ্যমে পরোক্ষ নির্বাচনপদ্ধতির কারণে পূর্ববাংলা জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতৃত্ব নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ হারায়। উপরন্তু, আইয়ুব সরকার কালো আইন জারি করে জনপ্রিয় রাজনীতিকদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত রাখেন। আইয়ুব শাসন আমলেই বাঙালিদের মধ্যে বেশি করে আলাদা জাতিগত পরিচয়ের প্রকাশ ঘটে।

১৯৬২ সালে জেনারেল আইয়ুব খান নিজস্ব ধ্যান-ধারণানির্ভর একটি নতুন শাসনতন্ত্র দেন। তাতে সংসদীয় সরকার এবং প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের ধারা বাদ দিয়ে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার প্রতিষ্ঠা করা হয়। রাষ্ট্রপতিকে এই ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দুতে রেখে অসীম ক্ষমতাধর এক ব্যক্তির শাসন প্রতিষ্ঠা করা হয়।

১৯৫৮ সালে পাকিস্তানের ক্ষমতা দখল করার পর থেকে ১৯৬২ সালের জুন পর্যন্ত জেনারেল আইয়ুব খানের নেতৃত্বে সামরিক শাসন বহাল থাকে। তিনি একটানা ৪৪ মাস সামরিক আইন দ্বারা দেশ পরিচালনা করেন। রাজনৈতিক দল ও এর তৎপরতা, সকল সভা-সমাবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। পাকিস্তানের জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীসহ মোট ৭৮ জন রাজনীতিককে কালো আইনের আওতায় একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত কোনোরূপ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত রাখেন।

১৯৬২ সালে 'শরীফ শিক্ষা কমিশন' রিপোর্টে ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে ডিগ্রি পর্যন্ত ইংরেজি পাঠ বাধ্যতামূলক, উর্দুকে জনগণের ভাষায় পরিণত করা এবং একই সাথে জাতীয় ভাষার জন্য একটি সাধারণ বর্ণমালা প্রবর্তনের চেষ্টা এবং সেক্ষেত্রে আরবির গ্রহণযোগ্যতা বিবেচনা, রোমান বর্ণমালার সাহায্যে পাকিস্তানি ভাষাসমূহকে লেখা, শিক্ষা খরচ শিক্ষার্থীদের বহন করা, ডিগ্রি কোর্সকে তিন বছর মেয়াদি করা ইত্যাদি

সুপারিশ করা হয়। ছাত্ররা এই রিপোর্ট প্রত্যাখ্যান করে আন্দোলনে নামে।

আইয়ুবের সামরিক শাসন চলাকালীন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ থাকে। তখন কোনো কোনো সংবাদপত্র বিশেষ করে দৈনিক ইত্তেফাক সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রশংসনীয় ও বলিষ্ঠ ভূমিকা পালনে অবতীর্ণ হয়। সঙ্গে সঙ্গে এসব পত্রিকার কণ্ঠরোধ করতে পদক্ষেপ গৃহীত হয়। ১৯৫৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পূর্ব বাংলার সবচেয়ে জনপ্রিয় দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার সম্পাদক ও মালিক তফাজ্জল হোসেন ওরফে মানিক মিয়াকে গ্রেপ্তার করা হয়। এরপর ১৯৬২ ও ১৯৬৬ সালেও দুইবার তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

পাকিস্তানের শুরুতে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দুই অংশের মধ্যে পূর্ব বাংলার অবস্থা ছিল অপেক্ষাকৃত ভালো। কিন্তু এই অবস্থা বেশি দিন টিকে থাকেনি। ক্রমান্বয়ে দুই অংশের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি এবং ব্যবধানের মাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

পাকিস্তানের দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে জেনারেল আইয়ুব বিভিন্ন নীতি গ্রহণ করেন। এই নীতি আঞ্চলিক বৈষম্যের পরিমাণ না কমিয়ে বরং তা আরো বাড়িয়ে দেয়। ১৯৬৮ সালের এপ্রিল মাসে পাকিস্তান প্লানিং কমিশনের প্রধান অর্থনীতিবিদ মাহবুবুল হক তথ্য প্রকাশ করেন যে দেশের শতকরা ৬৬ ভাগ শিল্প, ৭৯ ভাগ বীমা এবং ৮০ ভাগ ব্যাংক সম্পদ মাত্র ২২টি পরিবারের হাতে (যার মধ্যে ১টি বাদে বাকি সব পশ্চিম পাকিস্তানি) কেন্দ্রীভূত। জেনারেল আইয়ুব খানের এক দশকের শাসন আমলে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া যায়। এর সিংহভাগ পশ্চিম পাকিস্তানে খরচ হয়। পাকিস্তানের পূর্ব অংশের পুঁজি পশ্চিম অংশে পাচার হয়ে যায়।

৬ দফা কর্মসূচি

১৯৬৬ সালের ৫-৬ই ফেব্রুয়ারি পশ্চিম পাকিস্তানের লাহোরে বিরোধী দলের এক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ কনভেনশনে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ঐতিহাসিক ৬ দফা কর্মসূচি উত্থাপন করেন। ৬ দফা কর্মসূচি ছিল সংক্ষেপে নিম্নরূপ–

দফা-১ : লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তান হবে একটি ফেডারেশন বা যুক্তরাষ্ট্র। সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত আইন পরিষদের প্রাধান্যসহ সংসদীয় পদ্ধতির সরকার গঠনের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

দফা-২ : বৈদেশিক সম্পর্ক ও প্রতিরক্ষা ছাড়া সকল বিষয় স্টেট বা প্রদেশের হাতে ন্যস্ত থাকবে। উল্লিখিত দু'টি বিষয় ন্যস্ত থাকবে কেন্দ্রীয় বা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের হাতে।

দফা-৩ : পাকিস্তানের দু'টি অঞ্চলের জন্য পৃথক অথচ অবাধে বিনিময়যোগ্য মুদ্রাব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হবে। অথবা সমগ্র দেশে একটি মুদ্রাব্যবস্থা থাকবে, তবে সে ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে মূলধন পাচার রোধের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এজন্য একটি ফেডারেল ব্যাংকের অধীনে কার্যকরী ব্যবস্থা থাকতে হবে।

দফা-৪ : অঙ্গরাষ্ট্র বা প্রদেশগুলোর কর বা শুল্ক ধার্য করার ক্ষমতা থাকবে। তবে ব্যয় নির্বাহের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এর একটি অংশ পাবে।

দফা-৫ : পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পৃথক হিসাব রাখা হবে। অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা স্ব স্ব অঞ্চলের বা অঙ্গরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে থাকবে। এছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের বৈদেশিক নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিদেশে বাণিজ্য প্রতিনিধি প্রেরণ এবং যেকোনো চুক্তি সম্পাদন করতে পারবে।

দফা-৬ : নিজস্ব নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য অঙ্গরাষ্ট্রসমূহ প্যারামিলিশিয়া বা আধাসামরিক বাহিনী গড়ে তুলতে পারবে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক উপস্থাপিত ৬ দফা কর্মসূচি ছিল বাঙালির জাতীয় মুক্তির সনদ বা 'ম্যাগনাকার্টা'। কার্যত এই ৬ দফার মধ্য দিয়ে পাকিস্তানি ধাঁচের বৈষম্যমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থাকে ভেঙে বাঙালির জাতীয়-মুক্তি বা স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্য স্থির হয়। জেনারেল আইয়ুব খান ৬ দফাকে 'বিচ্ছিন্নতাবাদী,' 'বৃহত্তর বাংলা প্রতিষ্ঠার' কর্মসূচি হিসেবে আখ্যায়িত করেন এবং তা নস্যাৎ করতে যেকোনো ধরনের শক্তি প্রয়োগের হুমকি দেন।

৬ দফার সংগ্রামকে ব্যর্থ করে দেওয়ার লক্ষ্যে ১৯৬৮ সালের জানুয়ারি মাসে আইয়ুব সরকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে এক নম্বর আসামী করে ৩৫ জন বাঙালি সামরিক-বেসামরিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক একটি মামলা দায়ের করে, যা ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা নামে পরিচিত। এর আনুষ্ঠানিক নাম ছিল 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য'। এই মামলার আওতায় বঙ্গবন্ধু ও ৬ দফাপন্থী অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দকে দীর্ঘ সময় বন্দী অবস্থায় কারা অভ্যন্তরে কাটাতে হয়। ফলে বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের নেতৃত্বভার সচেতন ছাত্রসমাজের উপর গিয়ে বর্তায়। ১৯৬৯ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিকে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন ও মতিয়া উভয় গ্রুপ), সরকারি ছাত্র সংগঠন জাতীয় ছাত্র ফেডারেশনের দোলন গ্রুপ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ঐক্যবদ্ধ হয়ে আইয়ুববিরোধী মঞ্চ, কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে। ডাকসুর তৎকালীন সহ- সভাপতি অনলবর্ষী ছাত্রনেতা তোফায়েল আহমদ এর সভাপতি নির্বাচিত হন। বঙ্গবন্ধু ঘোষিত ৬ দফা কর্মসূচির প্রতি সর্বাত্মক সমর্থনসহ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ তাদের ১১ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে।

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ জাতীয় রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করে ১১ দফা ভিত্তিক একটি কর্মসূচি গ্রহণ করে। এই কর্মসূচি পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের জাতীয় মুক্তির বা স্বাধীনতার লক্ষ্যকে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ আগরতলা মামলা প্রত্যাহার এবং বঙ্গবন্ধুসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তির দাবিতে দেশব্যাপী ছাত্র আন্দোলন শুরু করে। বস্তুত ১৯৬৮ সালের নভেম্বর মাস থেকে ১৯৬৯ সালের মার্চ পর্যন্ত পাঁচ মাস সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে গণবিদ্রোহ দেখা দেয়। একই সময় পশ্চিম পাকিস্তানেও আইয়ুব-বিরোধী ছাত্র আন্দোলন গড়ে উঠে।

৬ দফা ও ১১ দফার ভিত্তিতে পূর্ব বাংলার সকল শ্রেণির মানুষের মধ্যে একটি সুদৃঢ় নাগরিক ঐক্য গড়ে উঠার ভিত্তি তৈরি হয়। আগরতলা মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে ছাত্র আন্দোলন আরও তীব্র আকার ধারণ করে। সংঘটিত হয় ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান। গণ-অভ্যুত্থানের চূড়ান্ত পর্যায়ে ১৯৬৯ সালের ২৫শে মার্চ জেনারেল আইয়ুব খান ক্ষমতা থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হন। আগরতলা মামলাবিরোধী গণ-অভ্যুত্থান স্বাধীন বাংলাদেশের উদ্ভবে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে।

উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান

মৌলিক গণতন্ত্র, আগরতলা মামলা ও আইয়ুব শাহীর নির্যাতনের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের উভয় অংশে ১৯৬৯ সালে এক দুর্বার গণ-আন্দোলন শুরু হয়। ছাত্রসমাজের ১১ দফা কর্মসূচিতে শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার, বাক-স্বাধীনতা, বৃহৎ শিল্প জাতীয়করণ, কৃষক-শ্রমিকের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি, নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি, জরুরি নিরাপত্তা আইন প্রত্যাহার, রাজবন্দীদের মুক্তি প্রভৃতি দাবি অন্তর্ভুক্ত ছিল। পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট বাতিল এবং পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সকল বিরোধী দল ঐক্যবদ্ধ হয়। এ সময় পশ্চিম পাকিস্তানে পুলিশের গুলিতে কয়েকজন ছাত্র নিহত হয়। এ হত্যার প্রতিবাদে সারা দেশে শুরু হয় গণ-আন্দোলন। বিরোধী দলগুলো গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ (DAC) গঠন করে। শুরু হয় দেশব্যাপী তীব্র ছাত্র গণ-আন্দোলন।

আইয়ুব খানের পদত্যাগ, ১৯৬২ সালের সংবিধান বাতিল, 'এক ব্যক্তি এক ভোটের' ভিত্তিতে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, আগরতলা মামলা প্রত্যাহার প্রভৃতি দাবিতে দেশব্যাপী গড়ে ওঠা আন্দোলন গণ-অভ্যুত্থানে রূপ নেয়। আন্দোলনের ভয়ে ভীত হয়ে আইয়ুব খান আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করেন। বন্দী অবস্থা থেকে মুক্তিলাভের পর ২৩শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ সালে ঢাকায় রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) এক বিশাল ছাত্র-জনতার সভায় বাঙালিদের অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ১৯৬৯ সালের ২৫শে মার্চ আইয়ুব খান সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খানের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে রাজনীতি থেকে বিদায় গ্রহণ করেন।

ক্ষমতাসীন হয়ে সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খান উদ্ভূত রাজনৈতিক সংকট সমাধানে কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। রাজনৈতিক দলের কার্যকলাপের উপর বিধিনিষেধ তুলে নেওয়ার ঘোষণা দেন। পাকিস্তানে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে তিনি কতিপয় শাসনতান্ত্রিক পদক্ষেপ ঘোষণা করেন। এর মধ্যে 'এক ব্যক্তি, এক ভোট', প্রত্যেক প্রদেশের জন্য জাতীয় পরিষদে জনসংখ্যার ভিত্তিতে আসনসংখ্যা বণ্টননীতি ছিল অন্যতম। জাতীয় পরিষদের আসনসংখ্যা হবে ৩১৩, যার মধ্যে ১৩টি হবে সংরক্ষিত মহিলা আসন। প্রত্যেক প্রদেশের জন্য সর্বাধিক স্বায়ত্তশাসনের বিধান রাখা হয়। নির্বাচিত প্রতিনিধি কর্তৃক সংবিধান প্রণয়নের জন্য সর্বোচ্চ ১২০ দিন ধার্য করা হয়। প্রণীত সংবিধান রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া আবশ্যকীয় করা হয়।

১৯৭০-এর নির্বাচন ও ফলাফল

১৯৭০ সালের নির্বাচনই ছিল পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রথম সাধারণ নির্বাচন। প্রাপ্তবয়স্ক এবং জাতি, ধর্ম, বর্ণ

নির্বিশেষে সকলের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচন দু'দফায় যথাক্রমে ৭ই ডিসেম্বর ১৯৭০ এবং ১৭ই জানুয়ারি ১৯৭১ সালে অনুষ্ঠিত হয়।

নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক দলগুলো হচ্ছে- আওয়ামী লীগ, পাকিস্তান পিপলস পার্টি (পিপিপি), ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি-ন্যাপ (ওয়ালী খান), মুসলিম লীগের বিভিন্ন গ্রুপ, জামায়াত-ই-ইসলামী, জমিয়তে উলামা-ই-ইসলাম, জমিয়তে উলামা-ই-পাকিস্তান, নিজাম-ই-ইসলাম, পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি (পিডিপি) ইত্যাদি। এর মধ্যে প্রধান দু'টি দল হচ্ছে, পূর্ব বাংলায় বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ এবং পশ্চিম পাকিস্তানে জুলফিকার আলী ভুট্টোর নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান পিপলস পার্টি।

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নির্বাচনি ইস্যু ছিল বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ ৬ দফা। অপরদিকে, জুলফিকার আলী ভুট্টোর পাকিস্তান পিপলস পার্টির নির্বাচনি স্লোগান ছিল- 'ইসলাম আমাদের বিশ্বাস, গণতন্ত্র আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং সমাজতন্ত্র আমাদের অর্থনীতি।' পিপলস পার্টির প্রচারণার মূল বিষয়বস্তু ছিল-'শক্তিশালী কেন্দ্র', 'ইসলামী সমাজতন্ত্র' এবং অব্যাহত ভারত বিরোধিতা।

অন্যদিকে মুসলিম লীগ ও অন্যান্য ইসলামপন্থী দল বা গ্রুপ তাদের নির্বাচনি প্রচারে পাকিস্তান পিপলস পার্টির মতো ইসলামি সংবিধান, শক্তিশালী কেন্দ্র এবং ভারত বিরোধিতার উপর গুরুত্ব আরোপ করে।

নির্বাচনি ফলাফল

পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে ১৯৭০ সালের নির্বাচনের ফলাফল নিচের সারণিতে উপস্থাপিত হলো।

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের (জাতীয় পরিষদ) দলভিত্তিক ফলাফল

রাজনৈতিক দলের নাম	সাধারণ আসন		সংরক্ষিত মহিলা আসন	উপজাতীয় এলাকার আসন	প্রাপ্ত মোট আসন সংখ্যা
	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান			
আওয়ামী লীগ	১৬০	-	৭	-	১৬৭
পিপলস্ পার্টি	-	৮৩	৫	-	৮৮
মুসলীম লীগ (কাইয়ুম)	-	৯	-	-	৯
মুসলীমস লীগ (কাউন্সিল)	-	৭	-	-	৭
ন্যাপ (ওয়ালী)	-	৬	১	-	৭
মুসলীম লীগ (কনভেনশন)	-	২	-	-	২
জামায়াতে -ইসলামী	-	৪	-	-	৪
জমিয়তে উলামা-ই-পাকিস্তান	-	৭	-	-	৭
জমিয়তে উলামা-ই-ইসলাম	-	৭	-	-	৭
পি.ডি.পি.	১	-	-	-	১
স্বতন্ত্র নির্দলীয়	১	৬	-	৭	১৪
সর্বমোট	১৬২	১৩১	১৩	৭	৩১৩

পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক আইন সভার নির্বাচনি ফলাফল

রাজনৈতিক দলের নাম	সাধারণ আসন	মহিলা আসন	মোট আসন
আওয়ামী লীগ	২৮৮	১০	২৯৮
পি.ডি.পি	২	-	২
ন্যাপ (ওয়ালী)	১	-	১
জামায়াতে ইসলামী	১	-	১
নেজামে ইসলাম	১	-	১
স্বতন্ত্র নির্দলীয়	৭	-	৭
সর্বমোট	৩০০	১০	৩১০

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনি ফলাফলে দেখা যায়, আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের ১৬২টি এলাকাভিত্তিক আসনের মধ্যে ১৬০টি আসন লাভ করে। জাতীয় পরিষদে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য সংরক্ষিত ৭টি মহিলা আসনসহ সর্বমোট ৩১৩ সদস্যবিশিষ্ট জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগের আসন সংখ্যা দাঁড়ায় ১৬৭টি। পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের মোট ৩০০টি এলাকাভিত্তিক আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ২৮৮টি লাভ করে। অন্য ১২টি আসনের ৯টিতে স্বতন্ত্র প্রার্থী, ২টিতে পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি এবং একটিতে জামায়াতে-ইসলামী জয়লাভ করে। প্রাদেশিক পরিষদে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ১০টি আসনসহ আওয়ামী লীগের দলীয় আসন সংখ্যা দাঁড়ায় ২৯৮টি।

অপরদিকে, জাতীয় পরিষদে পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দকৃত ১৩৮টি এলাকাভিত্তিক আসনের মধ্যে ৮৩ টি আসনে জুলফিকার আলী ভুট্টোর পাকিস্তান পিপলস্ পার্টি জয়লাভ করে। বাকি ৫৫টি আসনের ৯টিতে মুসলিম লীগ (কাইয়ুম খান), ৭টিতে মুসলিম লীগ (কাউন্সিল), ৭টিতে জমিয়তে উলামায়-ই-ইসলাম, ৬টিতে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি-ন্যাপ (ওয়ালী খান), ৭টিতে জমিয়তে উলামায়-ই-পাকিস্তান, ৪টিতে জামায়াতে ইসলামী, ২টিতে মুসলিম লীগ (কনভেনশন) এবং ১৩টিতে নির্দলীয় প্রার্থীগণ জয়লাভ করেন।

পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য সংরক্ষিত ৬টি মহিলা আসনের ৫টিতে পাকিস্তান পিপলস পার্টি এবং ১টিতে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি-ন্যাপ (ওয়ালী খান) জয়লাভ করে। মহিলা আসনসহ পাকিস্তান পিপলস পার্টির মোট আসনসংখ্যা দাঁড়ায় ৮৮টি।

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আবির্ভূত হলে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে ক্ষমতা হারানোর ভীতি ছড়িয়ে পড়ে। আওয়ামী লীগের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের মধ্য দিয়ে বাঙালিদের রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব অর্জন এবং ৬ দফা ভিত্তিক সংবিধান প্রণয়নের বিষয়টি নিশ্চিত হয়, যার কোনোটিই পাকিস্তানি সামরিক-বেসামরিক আমলা শাসকগোষ্ঠীর কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। ফলে নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের অব্যবহিত পরে শুরু হয় নতুন প্রাসাদ ষড়যন্ত্র। সামরিক-বেসামরিক আমলা শাসকগোষ্ঠীর এ প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো সক্রিয়ভাবে যুক্ত হন।

পাকিস্তানি সামরিক জান্তা একদিকে সংকট নিরসনের নামে ঢাকায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিল, অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সৈন্য ও অস্ত্র আনা হচ্ছিল। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বাঙালির বিজয়কে তারা মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পারেনি। ৬ দফা প্রশ্নে বঙ্গবন্ধুর অনড়-অনমনীয় অবস্থান তাদের বিচলিত করে। তাই তারা উদ্ভূত সংকটের সামরিক সমাধানে মনস্থির করে প্রস্তুতির জন্য ২৫শে মার্চ পর্যন্ত সময় নেয়।

১৯৭১ সালের ৩রা মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করেছিলেন। নির্বাচনের পর সংখ্যাগরিষ্ঠ দল আওয়ামী লীগের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে তিনি পাকিস্তানের 'ভাবী প্রধানমন্ত্রী' হিসেবেও আখ্যায়িত করেছিলেন। কিন্তু এসবই ছিল লোক দেখানো। ভেতরে ভেতরে চলছিল নির্বাচনের রায় বানচাল করার ষড়যন্ত্র।

অসহযোগ আন্দোলন

১লা মার্চ ১৯৭১ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান কর্তৃক পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করা হয়। এর প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২রা মার্চ ঢাকায় এবং ৩রা মার্চ সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে হরতালের ডাক দেন। কার্যত ১লা মার্চ থেকেই পাকিস্তানি শাসনের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। ২রা মার্চ রাতে কার্ফু জারি করা হয়। ছাত্রজনতা কার্ফু ভঙ্গ করে। সেনাবাহিনী গুলি চালায়। প্রতিদিন শতশত লোক হতাহত হয়। প্রতিবাদে-প্রতিরোধে জেগে উঠে বাংলাদেশ। উত্থান ঘটে বাঙালি জাতির। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ জাতির জনক। 'জয় বাংলা' এ জাতির মুক্তির ধ্বনি। চারিদিকে বিদ্রোহ আর গগনবিদারী স্লোগান : 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর'।

১৯৭১ সালের ২রা মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় ছাত্র-জনতার সমাবেশে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন, ৩রা মার্চ পল্টনের জনসভায় বঙ্গবন্ধুর উপস্থিতিতে ছাত্রসমাজের 'স্বাধীন বাংলাদেশের ইশতেহার পাঠ', 'স্বাধীন বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন', ২৩শে মার্চ পাকিস্তান প্রজাতন্ত্র দিবসে পূর্ব বাংলার সর্বত্র পাকিস্তানি পতাকার পরিবর্তে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন বাঙালির জাতীয় উত্থানের স্বাক্ষর বহন করে।

১৯৭১ সালের ২রা মার্চ থেকে ২৫শে মার্চ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সারা বাংলায় সর্বাত্মক অসহযোগ পালিত হয়। পূর্ব বাংলার সকল সরকারি-বেসরকারি অফিস, সেক্রেটারিয়েট, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, হাইকোর্ট, পুলিশ প্রশাসন, ব্যাংক-বীমা, ব্যবসা-বাণিজ্য, পরিবহন ইত্যাদি পাকিস্তান সরকারের নির্দেশ সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে পরিচালিত হয়।

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বাঙালির জাতীয় জীবনে এক অবিস্মরণীয় দিন।এদিন ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) লক্ষ জনতার স্বতঃস্ফূর্ত সমাবেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতির উদ্দেশ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন। এই ভাষণে তিনি ঘোষণা দেন–

২০১৯

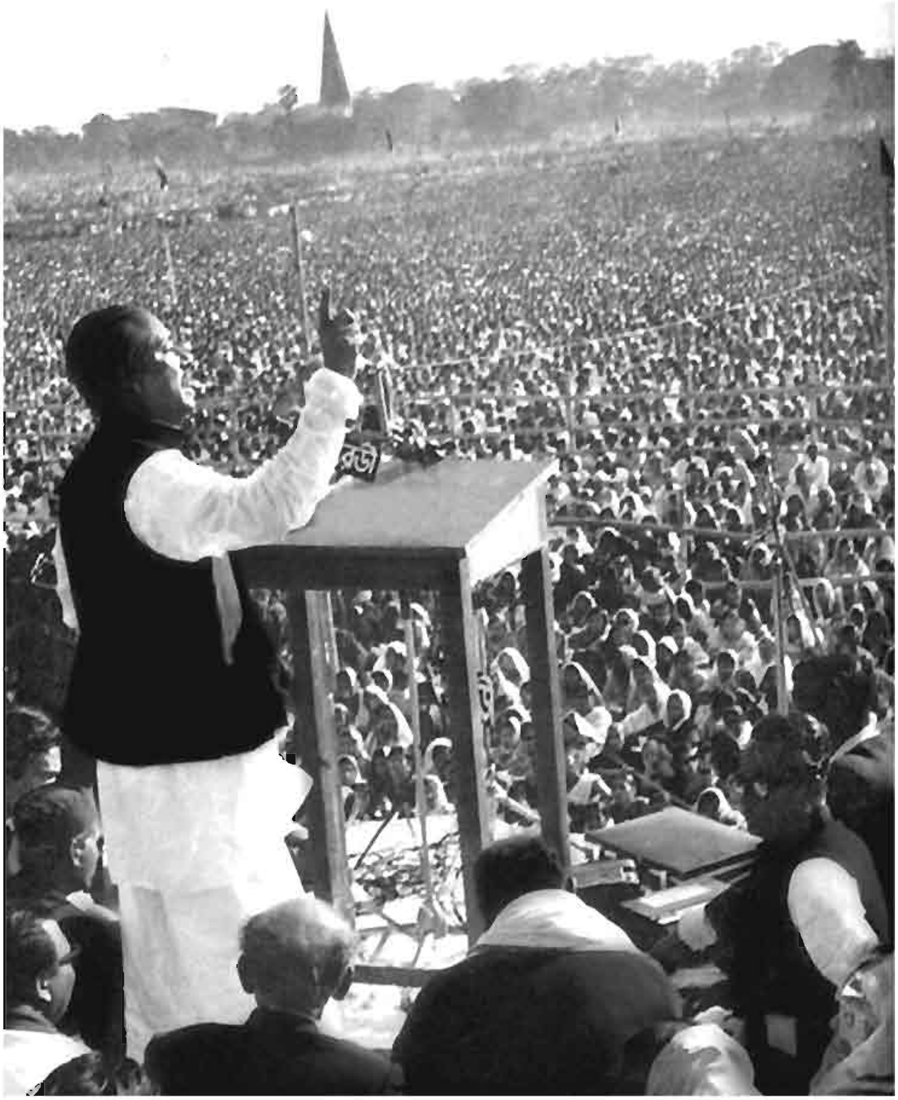

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ, রেসকোর্স ময়দান, ঢাকা

'ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে। রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেব। এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব, ইনশাআল্লাহ। ... এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।'

১৯৭১ সালের ১৫ই মার্চ ইয়াহিয়া খান ঢাকায় আসেন। তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আলোচনায় বসার অনুরোধ জানান। ১৬ই মার্চ থেকে আলোচনা শুরু হয়। পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টোসহ পশ্চিম পাকিস্তানের কয়েকজন নেতা আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকচক্রের মূল

রায়ের বাজার বধ্যভূমি (যেখানে বুদ্ধিজীবিদের হত্যা করা হয়)

উদ্দেশ্য ছিল আলোচনার নামে সময়ক্ষেপণ করা এবং পাকিস্তান থেকে সৈন্য ও রসদ আমদানি করে বাঙালি জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামকে চিরতরে স্তব্ধ করে দেওয়া। ২৩শে মার্চ 'পাকিস্তান প্রজাতন্ত্র দিবসে' বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে বাংলাদেশের ঘরে ঘরে পাকিস্তানের পতাকার স্থলে স্বাধীন বাংলার জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। ২৪শে মার্চ আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ সংকট সমাধানের লক্ষ্যে শেষ চেষ্টা করেন। কিন্তু ২৫শে মার্চ ইয়াহিয়া খান কোনো রকম ঘোষণা না দিয়েই সদলবলে ঢাকা ত্যাগ করেন এবং ঐ রাতেই পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে নিরস্ত্র বাঙালিদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দেন। তারা ঢাকাসহ অন্যান্য শহরেও হাজার হাজার নিরীহ, নিরস্ত্র বাঙালিকে নির্মমভাবে হত্যা করে। এই রাতকে ইতিহাসে কালরাত্রি হিসেবে অভিহিত করা হয়।

২৫শে মার্চের এই কালরাত্রিতেই অর্থাৎ ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং ওয়্যারলেসযোগে তা পাঠিয়ে দেন। বঙ্গবন্ধুর ঘোষণাবাণী শোনামাত্রই চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয়। শুরু হয় পাকিস্তানি সেনাদের সঙ্গে বাঙালি আনসার ও সাধারণ মানুষের এক অসম লড়াই যা বাংলাদেশের ইতিহাসে মহান মুক্তিযুদ্ধ নামে পরিচিত। আনুমানিক রাত ১টা ৩০ মিনিটে (মধ্যরাতে) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করে গোপনে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যায়।

স্বাধীনতার ঘোষণা

রাত ১টা ৩০ মিনিটে গ্রেফতার হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে অর্থাৎ ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। ঘোষণাটি ছিল ইংরেজিতে, যাতে বিশ্ববাসী ঘোষণাটি বুঝতে পারেন। স্বাধীনতা ঘোষণার বাংলা অনুবাদ : 'ইহাই হয়ত আমার শেষ বার্তা, আজ হইতে বাংলাদেশ স্বাধীন। আমি বাংলাদেশের জনগণকে আহ্বান জানাইতেছি যে, যে যেখানে আছে, যাহার যা কিছু আছে, তাই নিয়ে রুখে দাঁড়াও, সর্বশক্তি দিয়ে হানাদার বাহিনীকে প্রতিরোধ করো। পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর শেষ সৈন্যটিকে বাংলার মাটি হইতে বিতাড়িত না করা পর্যন্ত এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জন না করা পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাও" (বাংলাদেশ গেজেট, সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী, ৩রা জুলাই ২০১১)। স্বাধীনতার এ ঘোষণা বাংলাদেশের সকল স্থানে তদানিন্তন ইপিআর এর ট্রান্সমিটার, টেলিগ্রাম ও টেলিপ্রিন্টারের মাধ্যমে প্রচার

করা হয়। বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা ২৬শে মার্চ দুপুরে চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা এম. এ. হান্নান চট্টগ্রামের বেতার কেন্দ্র থেকে একবার এবং সন্ধ্যায় কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে দ্বিতীয়বার প্রচার করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণা এবং এর প্রতি বাঙালি সামরিক, আধা সামরিক ও বেসামরিক বাহিনীর সমর্থন ও অংশগ্রহণের খবরে স্বাধীনতাকামী জনগণ উজ্জীবিত হয়।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা লাভ

১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল মুজিবনগরে (মেহেরপুর জেলার বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে) আওয়ামী লীগের নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিরা স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের আদেশনামা জারি করেন এবং একটি সরকার গঠন করেন যা মুজিবনগর সরকার নামে পরিচিত হয়। ১৭ই এপ্রিল নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত বাংলাদেশের সরকার শপথ গ্রহণ করে। মুজিবনগর সরকার গঠিত হবার পর দেশের জনগণ দলে দলে মুক্তিবাহিনীতে যোগদান করে এবং মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে থাকে।

অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ ও গেরিলা আক্রমণ

২৫শে মার্চ মধ্যরাতে পাকিস্তানি বাহিনী অগ্নিসংযোগ ও অবিরাম গোলাবর্ষণ করে ঢাকা শহরে আক্রমণ শুরু করে। রাতের অন্ধকারে ঘুমন্ত নাগরিকদের হত্যা করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল হল (বর্তমানে জহুরুল হক হল), সলিমুল্লাহ মুসলিম হল, জগন্নাথ হল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বাসগৃহে হামলা করে অনেককে হত্যা করা হয়। ইয়াহিয়ার বর্বর বাহিনী বাংলাদেশে নির্বিচারে গণহত্যা, নারী নির্যাতন, অগ্নিসংযোগ, লুণ্ঠন প্রভৃতি জঘন্যতম অপরাধে লিপ্ত হয়। তাদের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য লক্ষ লক্ষ নর-নারী প্রতিবেশী দেশ ভারতে আশ্রয় নেয়। কিন্তু বাঙালি ছাত্র, যুবক ও তরুণরা গোপনে সংঘবদ্ধ হয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে দেশের ভিতরে থেকে গেরিলা পদ্ধতিতে এবং সম্মুখযুদ্ধে পাকবাহিনীকে পর্যুদস্ত করতে শুরু করে। দেশের মানুষ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয় দিয়ে সহযোগিতা করে। ফলে পাকবাহিনী ক্রমে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে।

মুক্তিযুদ্ধ সংগঠন ও পরিচালনা

মুক্তিযুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়ে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন চলছিল অপরিকল্পিত ও অবিন্যস্তভাবে। মুজিবনগর সরকার গঠিত হওয়ার পর থেকে মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিতভাবে পরিচালিত হতে থাকে।

তৎকালীন ইপিআরের বাঙালি সদস্য এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বাঙালি সৈনিক ও অফিসারদের সমন্বয়ে নিয়মিত সেনা ব্যাটালিয়ন গঠন করা হয়। নিয়মিত সেনা ব্যাটালিয়ন নিয়ে পরে কে-ফোর্স, এস-ফোর্স ও জেড-ফোর্স নামে তিনটি ব্রিগেড গঠিত হয়। সেনাসদস্য ও অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধারা মুক্তিবাহিনী বা মুক্তিফৌজ নামে পরিচিতি লাভ করে। কখনো এরা গেরিলা নামেও পরিচয় লাভ করে। এই বাহিনীর সদস্যরা মুক্তিযুদ্ধে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তারা দেশের অভ্যন্তরে পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে এবং তাদের গোয়েন্দা শাখা পাকিস্তানি বাহিনীর গতিবিধি ও নানা কর্মকাণ্ডের সংবাদ মুক্তিবাহিনীকে সরবরাহ করত। গেরিলাদের মধ্যে ছাত্র ও কৃষকদের সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশি।

মুজিবনগর সরকার সমগ্র বাংলাদেশকে এগারটি সেক্টরে বিভক্ত করে এবং প্রতিটি সেক্টরের দায়িত্ব একেকজন কমান্ডারের হাতে ন্যস্ত করে। সেক্টর কমান্ডারদের অধীনে নিয়মিত বাহিনীর পাশাপাশি অনিয়মিত গেরিলা যোদ্ধারা নিয়োজিত ছিল। উল্লেখ্য, দশ নম্বর সেক্টরের কোনো আঞ্চলিক সীমানা ছিল না। এটি গঠিত হয়েছিল নৌ-কমান্ডারদের নিয়ে। প্রচলিত কায়দায় যুদ্ধের পাশাপাশি গেরিলাযুদ্ধের রণকৌশল গ্রহণ করে মুক্তিবাহিনী হানাদার বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে ফেলে। ক্রমাগত যুদ্ধে জনবিচ্ছিন্ন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ক্রমশ হীনবল ও হতাশ হয়ে পড়ে।

পাকিস্তানের সামরিক শাসক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকে পাক-ভারত যুদ্ধ হিসেবে দেখানোর জন্য ভারতের ওপর বিমান আক্রমণ চালায়। ৩রা ডিসেম্বর পাকিস্তান সরকার ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। কিন্তু তাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। ৪ঠা ডিসেম্বর ভারতের লোকসভা বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। উক্ত সিদ্ধান্ত মোতাবেক ভারত সরকার ৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান করে। এসময়ে বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী ও ভারতের নিয়মিত সেনাবাহিনীর সমন্বয়ে একটি যৌথ কমান্ড গঠন করা হয়। এই যৌথ কমান্ড জলে, স্থলে ও আকাশপথে প্রবল আক্রমণ চালায়। ফলে মাত্র কয়েক দিনের যুদ্ধে পাকবাহিনী সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত ও পরাজিত হয়।

অবশেষে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর হানাদার পাকবাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল নিয়াজী ৯৩,০০০ (তিরানব্বই হাজার) পাকিস্তানি সৈন্য, বিপুল পরিমাণ রসদ ও আগ্নেয়াস্ত্রসহ রেসকোর্স ময়দানে আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণ করে। বিশ্বের মানচিত্রে রক্তের অক্ষরে লিখিত হয় স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের নাম।

বিজয় অর্জনের পর মুক্তিসেনা ও সাধারণ মানুষের আনন্দ-উল্লাস

নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধে নারী-পুরুষ, হিন্দু-মুসলিম, শিশু-বৃদ্ধ নির্বিশেষে ৩০ লক্ষ বাঙালি প্রাণ হারায় এবং ২ লক্ষ ৭৬ হাজার মা-বোনের সম্ভ্রমহানি ঘটে। গ্রামের পর গ্রাম পুড়িয়ে ছারখার করে দেওয়া হয়। ১ কোটি মানুষ দেশ ত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। এই মুক্তি সংগ্রামে বিজয় অর্জনের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভূত হয়। মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনের পূর্ব মুহূর্তে পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর এ দেশীয় দোসররা দেশের শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবীদের অনেককে রায়ের বাজার ও মিরপুর বধ্যভূমিতে নিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করে। অবিভক্ত পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ার পরও দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হিসেবে বিবেচিত পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা এবার স্বাধীন বাংলাদেশে স্বাধীন নাগরিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শ

বাংলাদেশ সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত তৃতীয় বিশ্বের প্রথম দেশ। সে যুদ্ধ স্থায়ী হয় নয় মাস। অনেক রক্ত আর ত্যাগের বিনিময়ে আমরা আমাদের স্বাধীনতা লাভ করি। স্বাধীনতার পর পর প্রণীত আমাদের দেশের সংবিধানের চারটি মূলনীতির মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শ অত্যন্ত সঠিকভাবে পরিব্যক্ত। নীতিগুলো হচ্ছে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদ। গণতন্ত্রের জন্য বাঙালিরা দীর্ঘ সংগ্রাম করেছে। বাংলাদেশকে সত্যিকার একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করা ছিল তাদের স্বপ্ন। সর্বপ্রকার শোষণ ও বৈষম্য থেকে মুক্তিলাভ ছিল তাদের অপর একটি লক্ষ্য ও আদর্শ। পাকিস্তান রাষ্ট্রের শুরু থেকেই বাঙালিরা শাসকগোষ্ঠীর রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার, অন্য কথায় সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে। 'ধর্ম যার যার, রাষ্ট্র হবে সবার' –এ চেতনা-আদর্শ নিয়ে তারা মুক্তিযুদ্ধ করেছে। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের মূলে ছিল স্বতন্ত্র জাতিসত্তার চেতনা, যাকে আমরা বলি বাঙালি জাতীয়তাবাদ। একটি স্বতন্ত্র জাতির জন্য স্বাধীন রাষ্ট্রের আবশ্যক হয়। আর বাঙালি জাতিসত্তার মধ্যে আমাদের নিজস্ব ভূখণ্ড, ভাষা-সাহিত্য, অসাম্প্রদায়িক বা সহিষ্ণু সংস্কৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্যগত চেতনা নিহিত রয়েছে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বা মালিকানার মধ্যেও আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা-আদর্শ ব্যক্ত। পাকিস্তান আমলে রাষ্ট্র ছিল পশ্চিম পাকিস্তানভিত্তিক সামরিক-বেসামরিক আমলা ও সুবিধাভোগী গোষ্ঠীর একটি প্রতিষ্ঠান। আমাদের দেশের সর্বস্তরের জনগণ মুক্তিযুদ্ধ করেছে। রাষ্ট্রের মালিকও তারা সকলে। তাই আমাদের সংবিধানে ঘোষণা করা হয়েছে 'প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ' (অনুচ্ছেদ ৭(১))। একটি সুখী-সমৃদ্ধ উন্নত রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে গড়ে তোলাই আজ আমাদের দায়িত্ব।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। 'দ্বিজাতি তত্ত্ব' কে ঘোষণা করেন?

ক) এ. কে. ফজলুল হক খ) মহাত্মা গান্ধী

গ) মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঘ) হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী

২। যুক্তফ্রন্ট নিচের কোন দাবি উত্থাপন করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বাঙালিদের আকৃষ্ট করেছিল?

ক) পাকিস্তানকে একটি ফেডারেশন করা

খ) প্রদেশগুলোর শুল্ক ধার্য করার ক্ষমতা দেয়া

গ) পূর্ব বাংলায় পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা করা

ঘ) সকল রাজবন্দীর মুক্তি দেওয়া

৩। যুক্তফ্রন্ট গঠিত হবার পেছনের কারণ হলো, মুসলীম লীগ-

i. বাঙালিদের আস্থাভাজন হতে পারেনি

ii. এদেশবাসীর সর্ব অধিকার কেড়ে নেয়

iii. উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার কথা বলে

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক) i ও ii খ) ii ও iii

গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

'ক' ব্যক্তি দীর্ঘ ২০ বছর ইউরোপের একটি দেশে থাকার পর নিজ গ্রাম রূপপুরে ফিরে আসেন। একদিন গ্রামের একটি সামাজিক অনুষ্ঠানে তিনি মাঝে মাঝে উক্ত দেশের ভাষা বলতে থাকলে গ্রামের মানুষ তাকে দেশের ভাষা বলার জন্য অনুরোধ করেন।

৪। রূপপুর গ্রামের মানুষের জীবনে ইতিহাসের কোন আন্দোলনের প্রভাব লক্ষণীয়?

ক) ভাষা খ) অসহযোগ

গ) ছয় দফা ঘ) এগার দফা

৫। উক্ত আন্দোলনের ফলে বাঙালির জীবনে প্রধানত–

ক) জাতীয় চেতনার সৃষ্টি হয়
খ) ধর্মীয় চিন্তা বৃদ্ধি পায়
গ) রাজনৈতিক চেতনার সৃষ্টি হয়
ঘ) প্রত্যক্ষ ভোটের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়

সৃজনশীল প্রশ্ন

১।

ক. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস কখন পালিত হয়?

খ. দ্বিজাতি তত্ত্ব কী? ব্যাখ্যা কর।

গ. উপরের ছবিটি আমাদের কোন আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত– ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ছবির লোকগুলোর চেতনাই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের জন্ম দিতে সক্ষম হয়– উক্তিটির পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন কর।

২। শিশির একটি কারখানায় চাকরি করত। মুক্তিযুদ্ধের সময় তার কারখানার অনেকেই যুদ্ধে যোগদান করে। তাদের দেখাদেখি একদিন সে বাড়ি থেকে পালিয়ে একটি বাহিনীর অধীনে প্রশিক্ষণ নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় পাকিস্তানি সেনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণকালে গুলির আঘাতে তার একটি পা হারায়। যুদ্ধ শেষে ফিরে এসে সে তার চাকরি এবং পরিবার কিছুই ফিরে পায়নি।

ক. ছয় দফা কর্মসূচি কে উত্থাপন করেন?

খ. গেরিলা যুদ্ধ কী? ব্যাখ্যা কর।

গ. শিশির মুক্তিযুদ্ধে কোন বাহিনীর সদস্য ছিল? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. শিশির ও তার সঙ্গীরা এদেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান–মূল্যায়ন কর।

২০১৬

একাদশ অধ্যায়

বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক সংগঠন

আমাদের পৃথিবী নামের এ গ্রহটিতে অনেকগুলো দেশ আছে। দেশগুলো বিশ্বের সাতটি মহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে। স্বাধীন ও সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হলেও দেশগুলোর পক্ষে একা চলা সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন পারস্পরিক সহযোগিতা, সম্প্রীতি ও বন্ধুত্ব, যা বিশ্ব শান্তি ও এসব দেশের উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। বিভিন্ন দেশের মধ্যে সহযোগিতার প্রয়োজন থেকে বিশ্বে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন সহযোগিতামূলক সংগঠন। যেমন : সার্ক, ইসলামি সহযোগিতা সংস্থা, কমনওয়েলথ ও জাতিসংঘ ইত্যাদি। এ অধ্যায়ে এসব গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংগঠন এবং বাংলাদেশের সাথে এদের সম্পর্ক বিষয়ে আমরা জানব।

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশন

এ অধ্যায় পড়া শেষে আমরা-

- সার্কের গঠন, উদ্দেশ্য এবং বাংলাদেশের সাথে এর সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে পারব।
- জাতিসংঘের গঠন ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারব।
- জাতিসংঘ ও বাংলাদেশের সম্পর্ক বর্ণনা করতে পারব।
- জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- কমনওয়েলথের গঠন, উদ্দেশ্য এবং বাংলাদেশের সাথে এর সম্পর্ক বর্ণনা করতে পারব।
- ওআইসির গঠন, উদ্দেশ্য এবং বাংলাদেশের সাথে এর সম্পর্ক বর্ণনা করতে পারব।

সার্ক (SAARC)

সার্কের পুরো নাম দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা (South Asian Association for Regional Cooperation)। শুরুতে এটি দক্ষিণ এশিয়ার সাতটি উন্নয়নশীল রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত হয়। পরবর্তীকালে আফগানিস্তান এর সদস্যভুক্ত হয়। সদস্য রাষ্ট্রগুলোর পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অগ্রগতি সাধনের লক্ষ্যে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সার্ক একটি আঞ্চলিক উন্নয়ন সংস্থা।

গঠন

১৯৮৫ সালের ৮ই ডিসেম্বরে ঢাকায় সার্কের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে এর সদস্য রাষ্ট্রের সংখ্যা আটটি। রাষ্ট্রগুলো হলো- বাংলাদেশ, ভুটান, মালদ্বীপ, নেপাল, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা ও আফগানিস্তান।

সার্কের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতে পাঁচটি স্তর আছে। এগুলো হলো- ১) রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানদের শীর্ষ সম্মেলন ২) পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলন, ৩) স্ট্যান্ডিং কমিটি, ৪) টেকনিক্যাল কমিটি এবং ৫) সার্ক সচিবালয়। এগুলোর মাধ্যমে সার্কের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড সম্পাদন করা হয়ে থাকে।

সার্ক সচিবালয় নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুতে অবস্থিত। এর প্রধানকে বলা হয় সেক্রেটারি জেনারেল। প্রতিবছর সার্কভুক্ত দেশগুলোর প্রধানদের নিয়ে সার্ক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সার্ক দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর প্রায় ১৫০ কোটি জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক।

SAARC

সার্কের প্রতীক

সার্ক সচিবালয়, কাঠমান্ডু, নেপাল

সার্ক গঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

দক্ষিণ এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশগুলো বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত। দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, অপুষ্টি, জনসংখ্যার আধিক্য, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি এসব দেশের দীর্ঘদিনের সমস্যা। পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে এসব সমস্যা দূরীকরণ ও পারস্পরিক উন্নয়নের লক্ষ্যকে এগিয়ে নিতে সার্ক গঠিত হয়। এছাড়াও সার্ক গঠনের আরও কতগুলো সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য আছে। এগুলো আলোচনা করা হলো।

১। সার্কভুক্ত দেশগুলোর জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করা;

২। এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন এবং সংস্কৃতির বিকাশ নিশ্চিত করা;

৩। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোকে জাতীয়ভাবে আত্মনির্ভরশীল করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

৪। এ অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলোর সাধারণ স্বার্থে সহানুভূতি ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করা;

৫। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপন;

৬। অন্যান্য আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থার সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন করে সার্কের লক্ষ্য বাস্তবায়নে উদ্যোগী হওয়া;

৭। সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে বিরাজমান বিরোধ ও সমস্যা দূর করে পারস্পরিক সমঝোতা সৃষ্টি করা;

৮। দেশগুলোর সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক অখণ্ডতার নীতি মেনে চলা এবং

৯। অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা।

দলীয় কাজ : সার্ক গঠনের উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ কর।

সার্কের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক

সার্কের সাথে বাংলাদেশের রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক। বাংলাদেশের প্রয়াত প্রেসিডেন্ট জেনারেল জিয়াউর রহমান প্রথম সার্ক গঠনের উদ্যোগ নেন। কিন্তু তাঁর জীবদ্দশায় তা বাস্তবায়িত হয়নি। পরবর্তীতে ১৯৮৫ সালে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের উদ্যোগে ঢাকায় আনুষ্ঠানিকভাবে সার্কের কাজ শুরু হয়।

সার্কের উদ্যোক্তা হিসেবে বাংলাদেশ সার্কের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে বলিষ্ঠ ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সার্কের সদস্য হিসেবে সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ও ভারসাম্য রক্ষা, আঞ্চলিক বিরোধ নিষ্পত্তি এবং প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে বিদ্যমান সংকট সমাধানে বাংলাদেশ অব্যাহত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এছাড়া সদস্য দেশগুলোতে মানবপাচার রোধ, সন্ত্রাস দমন, পরিবেশ সংরক্ষণ, যোগাযোগ ও প্রযুক্তির উন্নয়ন, রোগ-ব্যাধি ও দারিদ্র্য দূরীকরণ ইত্যাদি কর্মসূচি বাস্তবায়নে বাংলাদেশ অঙ্গীকারাবদ্ধ। এসব ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার জন্য নানা ধরনের যৌথ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এগুলো বাস্তবায়নের মাধ্যমে সার্কের অগ্রযাত্রাকে ত্বরান্বিত করার জন্য বাংলাদেশ সব ধরনের সহযোগিতা করে যাচ্ছে।

দলীয় কাজ : নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে সার্ক সম্পর্কিত ২/১টি উল্লেখযোগ্য ঘটনা দলের সদস্যদের সাথে আলোচনা করে শ্রেণিতে উপস্থাপন কর।

জাতিসংঘ

আমরা জানি, মাত্র ২৫ বছরের ব্যবধানে পৃথিবীতে দুটি বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। প্রথমটি ছিল ১৯১৪-১৯১৮ সাল পর্যন্ত এবং দ্বিতীয়টি ১৯৩৯-১৯৪৫ সাল পর্যন্ত। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এসব যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল। বিশ্বযুদ্ধ দুটি ছিল মানবসভ্যতার অগ্রযাত্রায় বিরাট বাধা। সেজন্য যুদ্ধের পাশাপাশি বিশ্বব্যাপী চলেছে শান্তি স্থাপনের প্রচেষ্টা। তাই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯২০ সালে গঠিত হয়েছিল জাতিপুঞ্জ বা লিগ অব নেশনস। কিন্তু বিভিন্ন দেশের স্বার্থের সংঘাতের কারণে এ সংস্থাটি স্থায়িত্ব লাভ করেনি। ফলে ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পৃথিবীকে গ্রাস করে। এ যুদ্ধে বিভিন্ন দেশের ব্যাপক ক্ষতি হয়। আণবিক বোমার আঘাতে জাপানের দুটি শহর (হিরোশিমা ও নাগাসাকি) সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়। মারা যায় কয়েক কোটি মানুষ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলা দেখে বিশ্ববাসী শংকিত ও হতবাক হয়ে যায়। তাদের মনে বিভিন্ন দেশের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা দানা বাঁধে। এছাড়া তারা অনুভব করে, মানবকল্যাণের জন্য যুদ্ধকে পরিহার করতে হবে। দেশগুলোর পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে বিশ্বে শান্তি ও সমৃদ্ধি নিয়ে আসতে হবে। ফলে ১৯৪১ সাল থেকে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা হাতে নেয়। তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট থিওডর রুজভেল্টের উদ্যোগে এবং বিভিন্ন দেশের নেতৃবৃন্দের সাথে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার ফলশ্রুতিতে ১৯৪৫ সালের ২৪শে অক্টোবর যুক্তরাষ্ট্রের সানফ্রান্সিসকো শহরে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলা-পরবর্তী বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশায় জাতিসংঘের জন্ম।

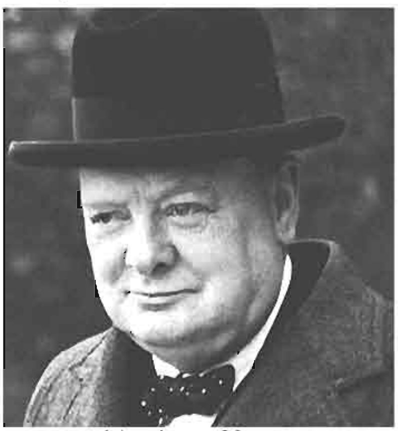

উইনস্টন চার্চিল

থিওডর রুজভেল্ট

শুরুতে জাতিসংঘের সদস্যসংখ্যা ছিল ৫০। বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা ১৯৩। যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে এর সদর দপ্তর অবস্থিত। জাতিসংঘের মহাসচিব হচ্ছেন এর প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা। নরওয়ের অধিবাসী ট্রিগভেলি ছিলেন জাতিসংঘের প্রথম মহাসচিব। বর্তমান মহাসচিবের নাম আন্তনিও গুতেরেস (Antonio Guterres)। তিনি দক্ষিণ পর্তুগালের অধিবাসী। জাতিসংঘের পতাকাটি হালকা নীল রঙের। মাঝখানে সাদা জমিনের মধ্যে বিশ্বের বৃত্তাকার মানচিত্র রয়েছে। এর দুপাশ দুটি জলপাই পাতার ঝাড় দিয়ে বেষ্টিত।

জাতিসংঘের সদর দপ্তর

জাতিসংঘের প্রতীক

জাতিসংঘের রয়েছে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক সংস্থা। জাতিসংঘের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক সংস্থার মধ্যে ইউনিসেফ, ইউনেস্কো, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, বিশ্ব খাদ্য সংস্থা, বিশ্ব মানবাধিকার কমিশন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

দলীয় কাজ : জাতিসংঘ গঠনের পটভূমি আলোচনা করে সংক্ষেপে এর প্রয়োজনীয়তা লিখ।

জাতিসংঘের উদ্দেশ্য

বিশ্বশান্তি ও সহযোগিতার মহান লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত জাতিসংঘের উদ্দেশ্যগুলো হলো-

১. শান্তির প্রতি হুমকি ও আক্রমণাত্মক কার্যকলাপ প্রতিরোধ করে বিশ্ব শান্তি, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;

২. সকল মানুষের সমান অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের মধ্যে সম্প্রীতি ও বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করা;

৩. অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মানবসেবামূলক সমস্যার সমাধানে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা গড়ে তোলা;

৪. জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকারের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ গড়ে তোলা; এবং

৫. আন্তর্জাতিক আইনের সাহায্যে আন্তর্জাতিক বিবাদের মীমাংসা করা।

জাতিসংঘের গঠন

এখন আমরা জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা বা শাখার গঠন ও কার্যাবলি সম্পর্কে জানব।

জাতিসংঘের মোট ছয়টি সংস্থা বা শাখা আছে। এগুলো হলো :

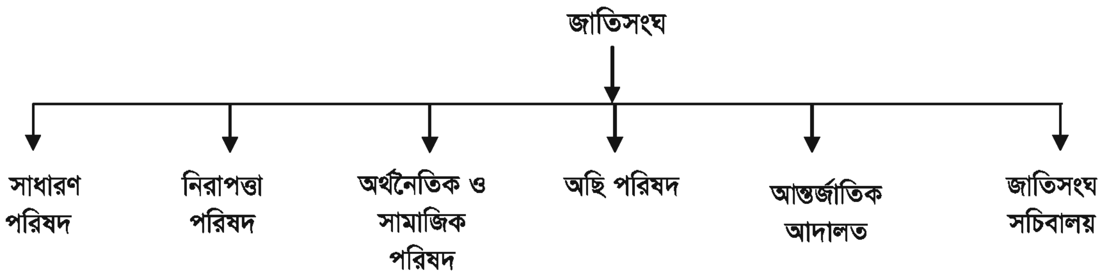

১. সাধারণ পরিষদ

সাধারণ পরিষদ জাতিসংঘের আইনসভার মতো। বিশ্বশান্তি ও সহযোগিতা রক্ষায় এর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

গঠন

জাতিসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্র সাধারণ পরিষদের সদস্য। সাধারণত বছরে একবার এ পরিষদের অধিবেশন বসে। তবে নিরাপত্তা পরিষদের অনুরোধে বিশেষ অধিবেশন বসতে পারে। প্রত্যেক অধিবেশনের শুরুতে সদস্যদের ভোটে পরিষদের একজন সভাপতি নির্বাচিত হন। সাধারণ পরিষদে প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্রের একটিমাত্র ভোট দানের অধিকার আছে।

কার্যাবলি

সাধারণ পরিষদ আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তাসহ মানবাধিকারসংক্রান্ত বিষয় আলোচনা করে। এছাড়া জাতিসংঘের মহাসচিব নিয়োগ, নতুন সদস্য গ্রহণ, বাজেট পাস, সদস্য রাষ্ট্রের চাঁদার পরিমাণ নির্ধারণ, বিভিন্ন সংস্থার সদস্য নির্বাচন, নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য নির্বাচন ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কাজ এ পরিষদ সম্পাদন করে থাকে।

২. নিরাপত্তা পরিষদ

জাতিসংঘের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী শাখা হচ্ছে নিরাপত্তা পরিষদ। এটি জাতিসংঘের শাসন বিভাগ স্বরূপ।

গঠন

নিরাপত্তা পরিষদ মোট ১৫টি সদস্য রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত। এর মধ্যে পাঁচটি স্থায়ী সদস্য। বাকি ১০টি অস্থায়ী সদস্য। স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্র হলো- যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ফ্রান্স ও চীন। এরা বৃহৎ পঞ্চশক্তি নামে পরিচিত। অস্থায়ী সদস্যরা প্রতি দুবছরের জন্য নির্বাচিত হয়।

কার্যাবলি

বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার মূল দায়িত্ব নিরাপত্তা পরিষদের। এ পরিষদ আলাপ আলোচনার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বিরোধ মীমাংসার চেষ্টা করে। আগ্রাসী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক অবরোধ আরোপ করতে পারে। এ চেষ্টা ব্যর্থ হলে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করার ক্ষমতা রাখে। তাছাড়া নিরাপত্তা

পরিষদ শান্তি প্রতিষ্ঠা ও যুদ্ধ বন্ধের জন্য কোথাও জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বাহিনী মোতায়েন করতে পারে। মোটকথা, আন্তর্জাতিক শান্তি ও সম্প্রীতি রক্ষার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সকল কাজ এ সংস্থাটি করে থাকে।

৩. অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ

বিশ্বকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এ পরিষদ গঠিত হয়েছে। বিশ্বের উন্নয়নে এর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

গঠন

এটি মোট ৫৪জন সদস্য নিয়ে গঠিত। বছরে কমপক্ষে তিনবার এর অধিবেশন হয়। প্রত্যেক সদস্যের একটি করে ভোট দানের অধিকার আছে। সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে যেকোনো সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

কার্যাবলি

এ পরিষদ সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, বেকার সমস্যার সমাধান, খাদ্য, কৃষি ও শিক্ষার প্রসার, চিকিৎসা ও পুনর্বাসন, মৌলিক মানবাধিকার কার্যকর করা ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের কল্যাণমূলক কাজ করে। এছাড়া বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক বিষয়ে সাধারণ পরিষদে সুপারিশ প্রেরণ করা এ পরিষদের অন্যতম দায়িত্ব।

৪. অছি পরিষদ

বিশ্বের যেসব জনপদের পৃথক সত্তা আছে কিন্তু স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব নেই এবং অন্য রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়, তাকে অছি এলাকা বলে। এসব এলাকার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব জাতিসংঘের অছি পরিষদের।

গঠন

অছি এলাকার উপর শাসন ক্ষমতার অধিকারী জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র, নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য ও নির্বাচিত অন্যান্য সদস্যদের নিয়ে অছি পরিষদ গঠিত। এর কোনো সুনির্দিষ্ট সংখ্যা নেই। অছি এলাকার সংখ্যার উপর ভিত্তি করে এর সদস্য সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়।

কার্যাবলি

অছি পরিষদের মাধ্যমে জাতিসংঘ বিশ্বের অনুন্নত অঞ্চলের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব নেয়। অছিভুক্ত অঞ্চলের উন্নতি এবং এলাকার অধিবাসীদের শিক্ষা প্রদান ও সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধীনতার জন্য উপযুক্ত করে গড়ে তোলাই হচ্ছে অছি পরিষদের দায়িত্ব। এছাড়া অছি এলাকায় শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, অছি এলাকার জনগণের আবেদন ও অভিযোগ পর্যালোচনা করে ব্যবস্থা নেওয়া এবং অছি এলাকা পরিদর্শনের মাধ্যমে বাস্তব অবস্থা দেখা ও প্রতিবেদন পেশ করা অছি পরিষদের কাজ।

৫. আন্তর্জাতিক আদালত

বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন দেশের মধ্যে বিবাদ মীমাংসার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক আদালত গঠন করা হয়েছে। এর সদর দপ্তর নেদারল্যান্ডের দি হেগ শহরে অবস্থিত।

গঠন

এটি জাতিসংঘের বিচারালয়। পনেরজন (১৫) বিচারক নিয়ে এ আদালত গঠিত। বিচারকদের কার্যকাল নয় বছর। সাধারণ ও নিরাপত্তা পরিষদ মিলে আন্তর্জাতিক আদালতের বিচারকদের নিয়োগ করে।

কার্যাবলি

জাতিসংঘের যেকোনো সদস্য রাষ্ট্র অন্য কোনো রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে বিরোধ মীমাংসার জন্য আন্তর্জাতিক আদালতে বিচার প্রার্থনা করতে পারে। আদালত তার বিচারকার্য দ্বারা বিশ্বশান্তি রক্ষা করে। জাতিসংঘ সনদের অন্তর্ভুক্ত কোনো বিষয় নিয়ে মামলা হলে এবং জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সম্পাদিত কোনো চুক্তি নিয়ে বিরোধ দেখা দিলেও আন্তর্জাতিক আদালত তা মীমাংসা করে। এছাড়া সাধারণ ও নিরাপত্তা পরিষদ কোনো আইনের ব্যাখ্যা চাইলে তা দিয়ে থাকে।

৬. জাতিসংঘ সচিবালয়

সচিবালয় জাতিসংঘের প্রশাসনিক বিভাগ। বিশ্বশান্তি, সহযোগিতা ও যোগাযোগসংক্রান্ত যাবতীয় কাজ এ শাখার মাধ্যমে সম্পাদিত হয়।

গঠন

জাতিসংঘ মহাসচিব, কয়েকজন উপসচিব, অধস্তন সচিব এবং অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়ে এ বিভাগ গঠিত। এর প্রধান কর্মকর্তা হলেন মহাসচিব। সাধারণ পরিষদ কর্তৃক তিনি পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হন।

কার্যাবলি

সচিবালয় জাতিসংঘের প্রশাসনিক কাজ পরিচালনা করে। সচিবালয়ের মহাসচিবকে কেন্দ্র করে এর যাবতীয় কাজ আবর্তিত হয়ে থাকে। তিনি সাধারণ পরিষদ, নিরাপত্তা পরিষদ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ এবং অছি পরিষদের মহাসচিব হিসেবে কাজ করেন। আন্তর্জাতিক আদালত ছাড়া সকল শাখায় লোক নিয়োগের দায়িত্বও তাঁর। সকল শাখার অধিবেশন অনুষ্ঠানের দায়িত্ব তাঁর। এছাড়া জাতিসংঘের বাজেট তৈরি, সদস্য রাষ্ট্রের কাছ থেকে চাঁদা আদায়, বিভিন্ন শাখার সভা আহ্বান, বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পর্যালোচনা ও প্রতিবেদন তৈরি, অছি এলাকার রিপোর্ট তৈরি ইত্যাদি কাজ তাঁর নির্দেশনায় সম্পাদিত হয়ে থাকে। সাধারণ ও নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্ত কার্যকর করার দায়িত্ব তাঁর। জাতিসংঘের নির্দেশ অমান্যকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তিনি যেকোনো ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করতে পারেন। মহাসচিব আসলে জাতিসংঘের

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। সচিবালয়ের অন্যান্যদের সহযোগিতায় তিনি এ ব্যাপক কর্মকাণ্ড সম্পাদন করে থাকেন।

দলীয় কাজ : জাতিসংঘের বিভিন্ন শাখার কাজের চার্ট তৈরি করে শ্রেণিতে উপস্থাপন কর।

জাতিসংঘের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক

বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে। জন্মলগ্ন থেকেই বাংলাদেশ জাতিসংঘের নীতি ও আদর্শের প্রতি আস্থাশীল রয়েছে। বাংলাদেশ বিভিন্ন সময়ে তার নানা সমস্যা মোকাবেলায় জাতিসংঘের সহযোগিতা পেয়েছে। আবার জাতিসংঘের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। কার্যত আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকেই জাতিসংঘের সাথে বাংলাদেশের গভীর ও হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। নিচে এর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরা হলো।

- ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতে আশ্রয়গ্রহণকারী প্রায় এক কোটি বাংলাদেশি শরণার্থীকে জাতিসংঘ খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ইত্যাদি মানবিক সাহায্য দিয়ে বেঁচে থাকার সুযোগ করে দিয়েছিল। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠনেও জাতিসংঘ সাহায্য-সহযোগিতা করেছিল।
- জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভের পর জাতিসংঘের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে বাংলাদেশের ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয়। ফলে বাংলাদেশ অতি অল্প দিনের মধ্যে জাতিসংঘের অধিকাংশ সদস্যের আস্থাভাজন হয়ে উঠে। বাংলাদেশ এ পর্যন্ত দুবার নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যপদ লাভ করে, যা দেশের জন্য এক বিরল সম্মান। এছাড়া বাংলাদেশ জাতিসংঘের অন্যান্য পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছে।
- জাতিসংঘের বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থাগুলো বাংলাদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে অকৃত্রিম বন্ধুর মতো কাজ করে যাচ্ছে। এসব সংস্থা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য ও পুষ্টি, যোগাযোগ, শিশু মৃত্যু হ্রাস, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন, বিজ্ঞান, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির উন্নয়ন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও এর ক্ষয়ক্ষতি মোকাবেলা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে অগ্রগতি অর্জনে যথেষ্ট সাহায্য করছে। জাতিসংঘ আমাদের 'ভাষা ও শহীদ দিবস' ২১শে ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে ঘোষণা দিয়ে বাংলা ভাষাকে সর্বোচ্চ মর্যাদার আসনে উন্নীত করেছে। জাতিসংঘের এসব কর্মকাণ্ড বাংলাদেশের সাথে জাতিসংঘের সম্পর্ককে আরও ঘনিষ্ঠ করেছে।
- ১৯৯১ সালে মিয়ানমার হতে লাখ লাখ রোহিঙ্গা শরণার্থী বাংলাদেশে প্রবেশ করায় এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। জাতিসংঘ ও এর বিভিন্ন সংস্থা বাংলাদেশকে বিপুলভাবে সাহায্য করায় বাংলাদেশ সে সমস্যা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়। এছাড়া দীর্ঘদিন ধরে মিয়ানমারের সাথে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা নিয়ে বিরোধ ছিল, যা নিয়ে বাংলাদেশ জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক আদালতে মামলা করে। ২০১২ সালে আন্তর্জাতিক আদালতের এক রায়ে এ বিরোধের নিষ্পত্তি হয় এবং এক বিশাল সমুদ্রসীমার উপর বাংলাদেশের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

- এভাবে জাতিসংঘ বাংলাদেশের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবে আমাদের দেশকে সাহায্য করে যাচ্ছে। বাংলাদেশও জাতিসংঘ সনদের প্রতি সম্পূর্ণ আস্থাশীল থেকে এর বিভিন্ন অধিবেশনে যোগদান করে এবং গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। জাতিসংঘের সিদ্ধান্তের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে বাংলাদেশ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জাতিসংঘ সেনাবাহিনীতে সেনাসদস্য পাঠিয়ে বিশ্ব শান্তি রক্ষায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে।

দলীয় কাজ : জাতিসংঘের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অর্জন ও অবদানের পৃথক চার্ট তৈরি কর।

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বাহিনীতে বাংলাদেশের ভূমিকা

বাংলাদেশ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বাহিনীর অন্যতম সদস্য দেশ। শুরু থেকেই বাংলাদেশ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বাহিনীর কর্মকাণ্ডে সমর্থন জানাচ্ছে ও সক্রিয় ভূমিকা পালন করে আসছে। সর্বপ্রথম ১৯৮৮ সালে বাংলাদেশ শান্তিরক্ষা বাহিনীতে সেনাসদস্য প্রেরণ করে। নামিবিয়াতে দুটি শান্তিরক্ষার অপারেশনে অংশগ্রহণের জন্য তাদেরকে পাঠানো হয়। ইরান-ইরাক যুদ্ধের সময় বাংলাদেশের সেনাসদস্যরা কুয়েত ও সউদি আরবে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বাহিনীর কাজে অংশ নেয়। তখন থেকে এ পর্যন্ত বাংলাদেশ ২৫টি দেশে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষাকারী মিশনে অংশগ্রহণ করেছে।

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বাহিনীতে সেনাসদস্য প্রেরণকারী দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ শীর্ষস্থান দখল করে আছে। বাংলাদেশ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বাহিনীতে প্রায় ১১,০০০ সেনাসদস্য পাঠিয়েছে। বর্তমানে বিশ্বের ১২টি দেশে শান্তিরক্ষা বাহিনীতে বাংলাদেশি সেনা সদস্যরা কর্মরত আছে।

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বাহিনীতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অবস্থান খুবই গৌরবের। এ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অনেক উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে শান্তিরক্ষা বাহিনীতে কমান্ডার হিসেবেও উর্ধ্বতন পদে নিয়োগ

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বাহিনীতে বাংলাদেশের সেনা সদস্যদের বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি

শান্তিরক্ষা বাহিনীতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্যবৃন্দ

দেওয়া হয়েছে। এটি বাংলাদেশের ভূমিকার আরেকটি স্বীকৃতি, যা দেশের মর্যাদা অনেক বৃদ্ধি করেছে। বাংলাদেশের এ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে বিবিসি বাংলাদেশি শান্তিরক্ষাকারীদের 'The cream of UN peacekeepers' বলে আখ্যায়িত করেছে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বাহিনীতে বাংলাদেশিদের অংশগ্রহণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সহায়তা করছে। ফলে দেশ অর্থনৈতিকভাবেও সমৃদ্ধ হচ্ছে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বাহিনীতে বাংলাদেশের এ অবদান আমাদের জন্য অত্যন্ত গর্বের বিষয়।

দলীয় কাজ : বিশ্বশান্তি রক্ষায় বাংলাদেশের অবদান ও আত্মত্যাগের উপর একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন তৈরি কর।

কমনওয়েলথ

গঠন

আমরা জানি, একসময় প্রায় সারা বিশ্বে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশও সে সময় ব্রিটিশ শাসনের অধীন ছিল। ব্রিটিশরা সে সময় দোর্দণ্ড প্রতাপে প্রায় সমগ্র পৃথিবীতে রাজত্ব করেছে। কিন্তু পরবর্তীকালে শাসিত অঞ্চলগুলোতে জাতীয়তাবাদী চেতনার সৃষ্টি হয় এবং সেসব অঞ্চল বা দেশ একের পর এক স্বাধীন হতে থাকে। তখন ব্রিটেন ও এর শাসন থেকে মুক্ত রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সম্পর্কের বন্ধন ধরে রাখার উদ্দেশ্যে গড়ে উঠে কমনওয়েলথ। ব্রিটেন এটি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়। ব্রিটেন ও এর পূর্বতন অধীনস্ত দেশসমূহ এর সদস্য। তবে কোনো রাষ্ট্র ইচ্ছে করলে কমনওয়েলথের সদস্য নাও হতে পারে। এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৫৩।

কমনওয়েলথ একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা। ১৯৪৯ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। পূর্বে এর নাম ছিল 'ব্রিটিশ কমনওয়েলথ অব নেশনস'। পরবর্তীকালে 'ব্রিটিশ' কথাটি বাদ দেওয়া হয়। ব্রিটেনের রাজা বা রানী কমনওয়েলথের প্রধান। এর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নিজস্ব সচিবালয় আছে। সচিবালয়ের প্রধানকে বলা হয় 'মহাসচিব'। এর সদর দপ্তর লন্ডনে অবস্থিত। প্রতি দুই বছর পর পর সদস্যভুক্ত দেশগুলোর সরকারপ্রধানদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

ব্রিটেনের রানী ও কমনওয়েলথ প্রধান

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

কমনওয়েলথের প্রধান লক্ষ্য হলো ব্রিটেন ও এর স্বাধীন উপনিবেশগুলোর মধ্যে ন্যূনতম সম্পর্ক রক্ষা। এই সম্পর্ক ধরে রাখার মাধ্যমে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক উন্নয়ন এবং দেশগুলোর পরস্পরের মধ্যে শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আদান-প্রদানে সহায়তা করার মাধ্যমে দেশগুলোর অগ্রগতি সাধন করাই হচ্ছে এর উদ্দেশ্য।

বাংলাদেশ ও কমনওয়েলথ

স্বাধীনতা লাভের পরপরই ১৯৭২ সালের ২৮শে এপ্রিল বাংলাদেশ কমনওয়েলথের সদস্যপদ লাভ করে। বাংলাদেশ সৃষ্টির শুরু থেকেই কমনওয়েলথের সাথে বাংলাদেশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি হয়। বিশেষ করে, কমনওয়েলথের মূল উদ্যোক্তা যুক্তরাজ্যের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় ব্রিটেনের প্রচারমাধ্যমগুলো বিভিন্নভাবে বাংলাদেশের পক্ষে জনমত সৃষ্টি করেছিল। ব্রিটেন ছিল বহির্বিশ্বে মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে প্রচারকার্য পরিচালনা করার প্রধান কেন্দ্র। সেখানে গঠন করা হয়েছিল বাংলাদেশের জন্য সাহায্য তহবিল। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় কমনওয়েলথভুক্ত অন্যান্য দেশও বিভিন্নভাবে বাংলাদেশকে সাহায্য-সহযোগিতা করেছিল। কমনওয়েলথভুক্ত আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারত বাংলাদেশের প্রায় এক কোটি লোককে আশ্রয় ও খাদ্য দিয়েছে। অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্র ঔষধ, খাদ্য, বস্ত্র ইত্যাদি দিয়ে বাংলাদেশকে সাহায্য করেছে।

বাংলাদেশের প্রতি উদার মনোভাব ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কারণে স্বাধীনতার পর পর বাংলাদেশ কমনওয়েলথের সদস্যপদ পায়। এর প্রতিবাদে পাকিস্তান কমনওয়েলথ থেকে সদস্যপদ প্রত্যাহার করে নেয়। কমনওয়েলথ ও এর সদস্য দেশগুলোর সহায়তায় বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি দ্রুত কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়।

বাংলাদেশ কমনওয়েলথের একনিষ্ঠ সদস্য হিসেবে এর প্রতিটি সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে। কমনওয়েলথের নীতি ও কার্যক্রম বাস্তবায়নে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করে। কমনওয়েলথের সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ কলম্বো পরিকল্পনার সদস্য। এর ফলে বাংলাদেশের অনেক শিক্ষার্থী কমনওয়েলথ বৃত্তি নিয়ে কমনওয়েলথভুক্ত বিভিন্ন দেশে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পায়।

কমনওয়েলথ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম আন্তর্জাতিক সংগঠন। একটি অরাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে এটি বিশ্বে শান্তি ও সমৃদ্ধি রক্ষায় প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলোর কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও প্রযুক্তির উন্নয়ন এবং বিশ্ব থেকে বর্ণবৈষম্য ও ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য দূরীকরণে কাজ করছে।

জোড়ায় কাজ : বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে কমনওয়েলথের অবদান আলোচনা কর।

ইসলামি সহযোগিতা সংস্থা (ওআইসি)

গঠন

বিশ্বের মুসলিম প্রধান দেশগুলোর একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন হচ্ছে ওআইসি। এর পুরো নাম Organization of Islamic Co-operation (OIC)। বাংলায় একে বলা হয় 'ইসলামি সহযোগিতা সংস্থা'। আমরা জানি, দীর্ঘদিন ধরে মধ্যপ্রাচ্যে ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা নিয়ে ইসরাইল ও এর পশ্চিমা বিশ্বের মিত্রদের সাথে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলোর বিরোধ চলে আসছে। এ বিরোধের একপর্যায়ে ১৯৬৯ সালের ২১শে আগস্ট ইসরাইল অতর্কিতে মুসলমানদের পবিত্র মসজিদ আল আকসায় অগ্নিসংযোগ করে।

সমগ্র মুসলিম বিশ্ব এর তীব্র নিন্দা জানায় ও ক্ষোভ প্রকাশ করে। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে মিসরে ১৪টি মুসলিম রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সম্মেলনে মুসলিম রাষ্ট্রের প্রধানদের নিয়ে একটি শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে অনুযায়ী ১৯৬৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ২২ থেকে ২৫ তারিখ পর্যন্ত ২৪টি মুসলিম রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানদের নিয়ে মরোক্কোর রাজধানী রাবাতে এক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সম্মেলনে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর স্বার্থরক্ষায় একটি সংস্থা গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা হয় এবং ২৫শে সেপ্টেম্বর তারিখে ওআইসি গঠিত হয়। মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী টেংকু আব্দুর রহমানকে ওআইসির প্রথম সেক্রেটারি জেনারেল বা মহাসচিব নিযুক্ত করা হয়। এভাবেই শুরু হয় ওআইসির যাত্রা। শুরুতে এর সদস্য সংখ্যা ছিল ২৩। বর্তমান ওআইসির সদস্যসংখ্যা ৫৭। বিশ্বের সব মুসলিম রাষ্ট্রই এর সদস্য। ওআইসির সদর দপ্তর সৌদি আরবের জেদ্দায়।

ওআইসির প্রতীক

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে ঐক্য ও সংহতি বজায় রেখে শত্রুর কবল থেকে ইসলামি স্থানগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও বহিঃশত্রুর ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সম্মিলিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা ওআইসির প্রাথমিক লক্ষ্য। এছাড়া ওআইসির আরও কিছু উদ্দেশ্য আছে।

১. ইসলামি ভ্রাতৃত্ব ও সংহতি জোরদার করা;

২. সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ড ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি করা;

৩. বর্ণবৈষম্যবাদ ও উপনিবেশবাদ বিলোপ করা;

৪. ইসলামি পবিত্র স্থানগুলোর নিরাপত্তা বিধান করা, পবিত্র ভূমিকে মুক্ত করা এবং ফিলিস্তিনি জনগণের সংগ্রামকে সমর্থন করা;

৫. মুসলমানদের মর্যাদা রক্ষা এবং মুসলিম জাতির সংগ্রামকে জোরদার করার জন্য সাহায্য করা;

৬. আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ব্যাপারে সমর্থন করা;

৭. সংস্থাভুক্ত সকল দেশ ও অন্যান্য দেশের সাথে সৌহার্দ্য ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করা;

৮. দেশসমূহের স্বাধীনতা ও ভৌগোলিক অখণ্ডতার প্রতি শ্রদ্ধা দেখানো; এবং

৯. কোনো সংঘর্ষ দেখা দিলে আলাপ-আলোচনা, মধ্যস্থতা, আপোস প্রভৃতির মাধ্যমে এর শান্তিপূর্ণ সমাধান।

বাংলাদেশ ও ইসলামি সহযোগিতা সংস্থা

বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় শীর্ষ সম্মেলনে ওআইসির সদস্যপদ পায়। এই সদস্যপদ লাভের মধ্য দিয়ে মুসলিম বিশ্বের সাথে বাংলাদেশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠে। শুরু থেকে বাংলাদেশ ওআইসির বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে আসছে। ওআইসিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য বাংলাদেশকে এর প্রতিটি প্রতিষ্ঠান, অঙ্গসংগঠন এবং গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন কমিটির সদস্য করা হয়েছে। ওআইসির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতি সংহতি প্রদর্শনের মাধ্যমে বাংলাদেশ মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহে যথাসম্ভব সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। যেমন-ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা সংগ্রামকে অব্যাহত সমর্থন জানিয়ে আসছে। ইরান-ইরাক যুদ্ধ বন্ধে প্রচেষ্টা চালিয়েছে। আফগানিস্তানে রাশিয়ার আগ্রাসনকে নিন্দা জানিয়েছে। বসনিয়ায় যুদ্ধ বন্ধের জন্য সৈন্য পাঠিয়েছে।

বাংলাদেশ ওআইসিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার পাশাপাশি এর সদস্য দেশগুলোর কাছ থেকে বিভিন্ন সহযোগিতা লাভেও সমর্থ হয়েছে। ওআইসির সদস্যপদ বাংলাদেশকে বিভিন্ন মুসলিম দেশের স্বীকৃতি অর্জন এবং জাতিসংঘের সদস্যপদসহ বিভিন্ন সংস্থার সদস্যপদ লাভে সাহায্য করেছে। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠনে তেলসমৃদ্ধ মুসলিম দেশগুলোর সহযোগিতা পেয়েছে। তবে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, তেলসমৃদ্ধ মুসলিম দেশগুলোতে বাংলাদেশের বিশাল জনশক্তি রপ্তানি যা কর্মসংস্থানসহ প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

অর্থনৈতিক সহযোগিতা ছাড়াও শিক্ষা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ওআইসির সদস্য দেশগুলোর সহযোগিতা লাভ করে আসছে। প্রতিবছর বাংলাদেশের বহুসংখ্যক লোক হজ্জ করার জন্য সৌদি আরব যায়। তাছাড়া বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এবং পুরাতন মসজিদ সংরক্ষণের জন্য বাংলাদেশ ওআইসির কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা পায়। গাজীপুরে অবস্থিত 'ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি' ওআইসির আর্থিক সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হচ্ছে।

বস্তুত বাংলাদেশ ওআইসির সদস্য হওয়ার পর থেকে এর নীতি ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

দলীয় কাজ : বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ওআইসির অবদান মূল্যায়ন কর।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। OIC গঠিত হয় কত সালে?

ক) ১৯৩৯ খ) ১৯৪৯

গ) ১৯৬৯ ঘ) ১৯৭২

২। জাতিসংঘের কোন পরিষদটি সামরিক শক্তি প্রয়োগ করতে পারে?

ক) সাধারণ পরিষদ খ) নিরাপত্তা পরিষদ

গ) অছি পরিষদ ঘ) আন্তর্জাতিক আদালত

৩। আন্তর্জাতিক বিরোধ মীমাংসায় কাজ করে–

i. নিরাপত্তা পরিষদ

ii. অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ

iii. আন্তর্জাতিক আদালত

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক) i

খ) ii

গ) i ও ii

ঘ) i ও iii

ডায়াগ্রামটির আলোকে ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

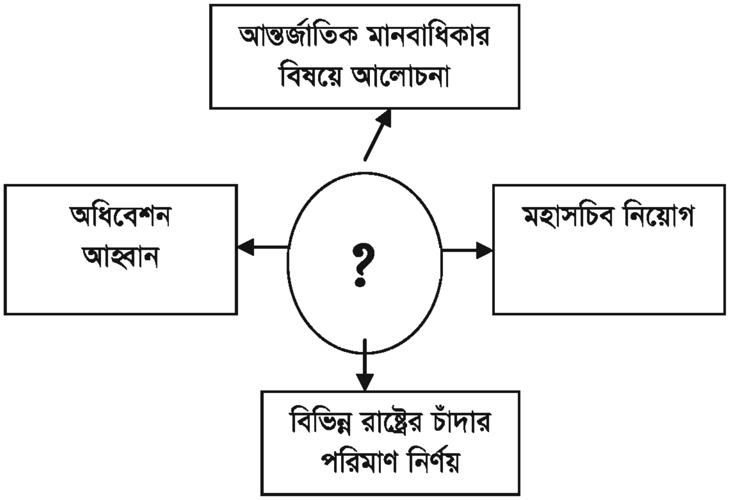

৪। '?' চিহ্নের সাথে সম্পৃক্ত সংস্থা কোনটি?

ক) সাধারণ পরিষদ
খ) নিরাপত্তা পরিষদ
গ) কমনওয়েলথ
ঘ) সার্ক

৫। উক্ত সংস্থাটি–

i. প্রত্যেক বছর একজন সভাপতি নির্বাচিত করে
ii. ২ বছর পর পর একজন সভাপতি নির্বাচন করে
iii. নতুন সদস্য রাষ্ট্র গ্রহণের অধিকার রাখে

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক) i
খ) ii
গ) i ও ii
ঘ) i ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। হাসান সাহেব ও হাকিম সাহেব তাদের গ্রাম সূর্যনগরে দুইটি ভিন্ন সংস্থা গঠন করেন।

হাসান সাহেবের সংস্থাটির নাম 'শান্তি সংস্থা'। এর গঠন, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	হাকিম সাহেবের সংস্থাটির নাম 'সূর্যনগর সমবায় সমিতি'। এর গঠন, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
(১) হাসান সাহেব সংস্থার মহাসচিব। তাঁর সংস্থার প্রাথমিক সদস্য ২৩।	(১) হাকিম সাহেব সমিতির মহাসচিব। তাঁর সংস্থার প্রাথমিক সদস্য ৫০।
(২) এলাকার মসজিদ, মাদ্রাসার উন্নয়ন করা এবং সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাথে সৎভাব বজায় রাখা।	(২) গ্রামের বিভিন্ন জাতি, ধর্ম, বর্ণের লোক সমিতির সদস্য।
	(৩) অর্থনৈতিক মুক্তির মাধ্যমে গ্রামের শান্তি শৃঙ্খলার উন্নয়নসহ পাঠাগার, খেলাধুলার ক্লাব গড়ে তোলা।

ক. SAARC এর পূর্ণরূপ কী?

খ. 'অছি এলাকা' কী? ব্যাখ্যা কর।

গ. হাসান সাহেবের 'শান্তি সংস্থার' সাথে কোন আন্তর্জাতিক সংস্থার উদ্দেশ্যের মিল রয়েছে– ব্যাখ্যা কর।

ঘ. হাকিম সাহেবের সংস্থার সাথে জাতিসংঘের উদ্দেশ্যের অনেক প্রতিফলন লক্ষ করা যায়– এর সত্যতা নিরূপণ কর।

২।

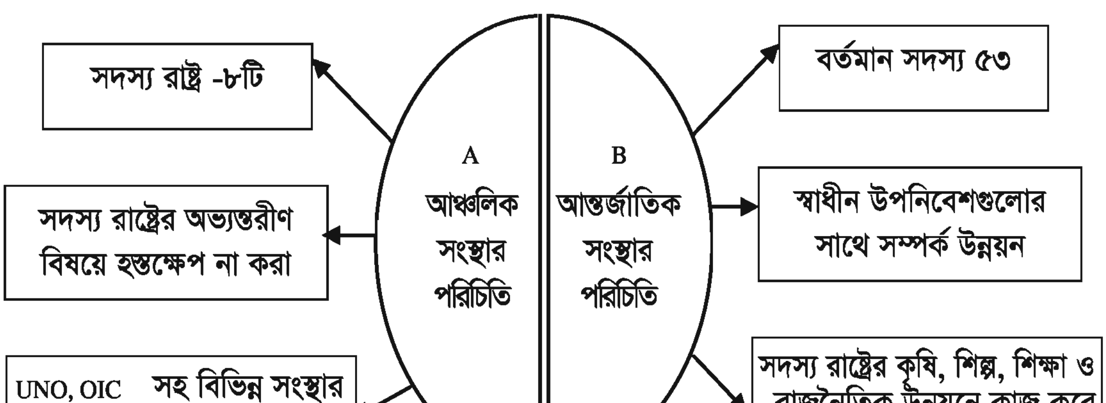

২০১৬

ক. জাতিসংঘের অঙ্গ সংগঠন কয়টি?

খ. বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার মূল দায়িত্ব জাতিসংঘের কোন শাখার–ব্যাখ্যা কর।

গ. ডায়াগ্রামটিতে '**A**' কোন আঞ্চলিক সংস্থার প্রতিচ্ছবি–ব্যাখ্যা কর।

ঘ. '**B**' আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ–উক্তিটির সপক্ষে যুক্তি দেখাও।

সমাপ্ত

২০১৯

শিক্ষাবর্ষ

৯ম-১০ম পৌরনীতি

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন– দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতামুক্ত সোনার বাংলাদেশ গড়তে
নিজেদের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোল

– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

যে সৎপথে চলে, সে পথ ভোলে না

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে
১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য